নোনা জল মিঠে মাটি

প্রফুল্ল রায়

মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫।ব টেমার লেন কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ   ২রা বৈশাখ ১৩৭১

মুদ্রক ঃ   মদন মোহন কুমার
মদন প্রেস
১/১ এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ   নিতাই ঘোষ

নোনা জল মিঠে মাটি

কথামুখ

শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এক শো মাইল দূরে এই দ্বীপ, যার নাম উত্তর আন্দামান। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, জাপানী শিল্পী হকুসাইর আঁকা একটি অপূর্ব নিসর্গচিত্র।

এই দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান চমকপ্রদ। সামনের দিকে ঘোড়ার খুরের আকারে উপসাগর, নাম এরিয়াল বে। এরিয়াল বে'র নীল জলে উড়ুক্কু মাছেরা রুপোলী ডানায় ঝিলিক হেনে ছুটে বেড়ায়। পাড়ের কাছে অক্টোপাস আর হাঙরেরা শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘোরে।

উপসাগরের ওপারে সমুদ্র—আন্দামান সী। সমুদ্র—নিঃসীম, গম্ভীর, অশেষ। সেখান থেকে পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ ছুটে আসে; এরিয়াল বে'কে মাতিয়ে, পাড়ের ক্ষয়িত শিলায় আর ম্যানগ্রোভ বনে বিপুল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দ্বীপটা চড়াই-উতরাইএ তরঙ্গিত। এখানে গভীর অরণ্য। চুগলুম-দিদু-প্যাডক-পেমা; এমনি নানা গাছের জটিল জটলা। এক কোণে মাঝারি একটা পাহাড়; নাম স্যাডল পীক।

উত্তর আন্দামানের ভৌগোলিক অস্তিত্বের মধ্যে যত বিস্ময় তার কণামাত্র নেই তার ইতিহাসে। চেঙ্গিস খানের মত কোন দুঃসাহসী নৃশংস এখানে অভিযান চালায় নি। অষ্টম হেনরী কি শাজাহানের মত কোন নৃপতি এখানে রাজত্ব করেন নি। ফরাসী বিপ্লব কি হলদিঘাটের যুদ্ধের মত কোন বিচিত্র ঘটনাই এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমুদ্র-বেষ্টিত এই দ্বীপ নির্জনে নিঃশব্দে হাজার হাজার বছর মূক হয়ে পড়ে ছিল।

অবশ্য খ্রীষ্টজন্মের অনেক আগেই চীনা এবং জাপানীরা এই দ্বীপের কথা শুনেছিল। আরব বণিক এবং ভারতীয় শ্রমণ-শ্রমণীরা মধ্যযুগে পূর্ব সমুদ্রে পাড়ি জমাতেন। অনুমান হয়, সাময়িক বিশ্রাম এবং স্বাদু জলের সন্ধানে তাঁদের বহর উত্তর আন্দামানে ভিড়ত।

নিকোলা কণ্টি, মাস্টার ফ্রেডরিক, মার্কো পোলো কিংবা টলেমি বঙ্গোপসাগর দিয়ে যেতে যেতে সম্ভবত এই দ্বীপে এসে থাকবেন। নজীর আছে, মালয়ী জলদস্যুরা এখানকার আদিম বাসিন্দাদের ধরে শ্যাম এবং কম্বোডিয়ার রাজ-দরবারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দিত।

উত্তর আন্দামানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের শুরু সতের শো বিরানব্বুইর ডিসেম্বর মাসে। কিড সাহেব নামে জনৈক প্রবল-প্রতাপ ইংরেজ ক্যাপটেন দুশো দুর্দান্ত কয়েদী নিয়ে দক্ষিণ আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এখানে এসেছিলেন। তখন এই দ্বীপটার নাম দেওয়া হল পোর্ট কর্নওয়ালিশ।

কিড সাহেব কয়েদীদের জঙ্গল সাফ করতে লাগিয়ে দিলেন। জঙ্গল সাফ হল, জমি সার্ভে হল, জরিপ হল। বেত পাতার চাল মাথায় নিয়ে ঝুপড়ি উঠল। নতুন যে উপনিবেশ গড়ে উঠল, সরকারী পরিভাষায় তার নাম 'পেনাল কলোনি।'

দ্রুত এই কলোনি জমে উঠল। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে নানা মানুষ আসতে লাগল আশ্রয় আর জীবিকার খোঁজে।

কিড সাহেব আসার আগেও এখানে মানুষ বাস করত। তারা বর্বর, হিংস্র। তারাই এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা। তাদের বিভিন্ন জাত—ওঙ্গে, জারোয়া, গ্রেট আন্দামানীজ, সেণ্টিনালীজ। দ্বীপবাসী আদিম উলঙ্গ নিগ্রো, জাতীয় মানুষগুলির সঙ্গে আস্তে আস্তে সভ্য মানুষের বন্ধুত্ব হল।

এত সত্ত্বেও কিড সাহেবের কলোনির পরমায়ু মাত্র চার বছর। সতেরশো বিরানব্বুইতে যার শুরু, ছিয়ানব্বুইতে শেষ।

উত্তর আন্দামান দ্বীপটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং স্যাঁতসেঁতে। মৃত্যুহার এখানে অস্বাভাবিক বেশি। ফলে কলোনি উঠে যায়। উঠে যাওয়ার সময় এখানকার জনসংখ্যা ছিল আট শো কুড়ি। তাদের মধ্যে কয়েদী মাত্র দু-শো সত্তর জন।

কলোনি উঠে যাবার পর কয়েদীদের পেনাঙের পেনাল সেটেলমেণ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাকি সবাই বাঙলাদেশে ফিরে আসে।

সেটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল। কলোনি উঠে গেলেও কোম্পানি আন্দামানের ওপর কর্তৃত্ব ছাড়ে নি। প্রতি বছর পোর্ট কর্নওয়ালিশে জাহাজ পাঠিয়ে তদারকি করত।

কয়েক বছর পর জাহাজ পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে জঙ্গল আবার তার দাবি নিয়ে এগিয়ে এল। গভীর অরণ্যের নিচে উপনিবেশ হারিয়ে গেল।

পোর্ট কর্নওয়ালিশের রঙ্গমঞ্চে একটি অঙ্কের শেষ যবনিকা-পাত ঘটল।

তারপর কতকাল চলে গেছে।

উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালে আবার যবনিকা উঠল। এবার আরেক অঙ্ক, আরেক দৃশ্য। এবার আর কয়েদী নয়, জাহাজ বোঝাই হয়ে পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তুরা এসেছে। উত্তর আন্দামানের নতুন ইতিহাস গড়ার দায়িত্ব তাদেরই হাতে।

কাহিনী

সেই দুপুরে উপসাগর জ্বলছিল।

শহর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে শ খানেক মাইল দূরে উত্তর আন্দামানে এই উপসাগর, যার নাম এরিয়াল বে।

এরিয়াল বে'র নীল জল জ্বলছিল। পাড়ের ম্যানগ্রোভ বন জ্বলছিল। আকাশে আটকে-থাকা সিন্ধুশকুনগুলো ঝলসে যাচ্ছিল।

উপসাগর আজ বড় শান্ত। তার নীল জলে ঢেউ ওঠে কি ওঠে না। জলের তলায় বাদামী বালির বিছানা। সেখানে অতি সন্তর্পণে বুকে হাঁটছে নানা আকারের কড়ি—যাদের নাম টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, ফ্রগ শেল। বালির উপর তাদের চলার দাগ আঁকা হয়ে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে এক ঝাঁক রুপোলী তীরের মত উড়ুক্কু মাছেরা খানিকটা ছুটেই উপসাগরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের ফিনফিনে ডানায় দুপুরের রোদ ঝিলিক মারে।

সমুদ্র ফুঁড়ে যে অন্ধ উন্মাদ বাতাস পাড়ের ম্যানগ্রোভ বনটাকে ইচ্ছামত নাস্তানাবুদ করে যায়, সেই বাতাসও আজ নেই।

এরিয়াল উপসাগরে আজ কোন শব্দ নেই। নীল জল একেবারেই নিস্তরঙ্গ। আকাশের সিন্ধুশকুনগুলো ডানা নাড়ে কি নাড়ে না; ম্যানগ্রোভ বনের মাথা নড়ে কি নড়ে না।

ঘোড়ার খুরের আকারে উপসাগরটা যেখানে বেঁকে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সী-গাল পাখি। পাঁশুটে রঙের পাখিটা অনড় দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। সার্ডিন মাছ চোখে পড়লেই তার চোখা ধারাল ঠোঁটদুটো বিদ্যুৎ-গতিতে জলের ভেতর ঢুকে যাবে!

উপসাগরটা নিঝুম, নিস্তব্ধ। হঠাৎ চারদিক চমকে দিয়ে শব্দ উঠল। বিকট, গম্ভীর, শির-ছিঁড়ে-দেওয়া আওয়াজ দূরের সমুদ্রে প্রলয় তুলে শাসাতে শাসাতে উপসাগরের দিকে এসে পড়ল।

চোখের পলকে শান্ত স্তব্ধ উপসাগরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পাঁশুটে রঙের সী-গাল পাখিটা ডানায় ঝটপট শব্দ তুলে কোন দিকে উড়ে পালাল। জলের নিচে কড়িগুলো বুকে হাঁটতে হাঁটতে থমকে গেল।

সমুদ্র থেকে এখন ঢেউ ছুটে আসছে। একের পর এক বিপুল বিরাট সব ঢেউ।

একসময় উপসাগরটা যেখানে ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে সমুদ্রে

মিশেছে সেখানে একটা মাস্তুল দেখা দিল। মাস্তুলটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা জাহাজ হয়ে গেল।

সতেরশো বিরানব্বইতে উপনিবেশ পত্তনের আশায় কিড সাহেবের জাহাজ এসেছিল। দীর্ঘ একশো চৌষট্টি বছর পর স্থায়ী বসতি গড়তে আবার জাহাজ এল।

এটা উনিশ শ ছাপান্ন সালের এক মধ্য দুপুর।

জাহাজ আসার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা ভোজবাজি ঘটে গেল যেন।

উপসাগরের পাড়টা বালির। এখানে সেখানে ম্যানগ্রোভ গাছগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ বালির ওপর লাল রঙের ছোট ছোট অগুনতি কাঁকড়া ছোটাছুটি করছিল। সামুদ্রিক শামুকগুলি নিঃশব্দে গুটিগুটি বুকে হাঁটছিল। এখন তারা শক্ত খোলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে পড়ে রইল। কাঁকড়াগুলো গর্তে ঢুকে পড়ল।

জাহাজ আসার শব্দে জঙ্গল ফুঁড়ে কোথা থেকে একদল মানুষ বেরিয়ে পড়েছিল। উপসাগরের পাড়ে এসে তারা দাঁড়াল।

উপসাগরের বাঁ দিকে সমুদ্র। ডান দিকে একটা খাড়ি। খাড়ির পর জটিল অরণ্য। উপসাগরটা খাড়ির কাছে সরু হয়ে হয়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেছে কে জানে।

খাড়ির মুখে এবার গুটিকতক কাঠের ডিঙি দেখা দিল। উথল-পাথল ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে ডিঙিগুলো জাহাজের দিকে এগুতে লাগল।

পাড়ের কাছটা অগভীর। বড় জাহাজ সেখানে ভিড়তে পারে না। কাজেই উপসাগরের মাঝখানে জাহাজটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কড় কড় শব্দে মোটা শিকল আর নোঙর নামল জলে।

দুপুরটা জ্বলছে। পাড়ের ম্যানগ্রোভ বন জ্বলছে, চুগলুম দিদু আর প্যাডক গাছগুলো জ্বলছে, দূরে স্যাডল পীকের মাথা জ্বলছে। আকাশের গায়ে যে সিন্ধুশকুনগুলো ঝলসে যাচ্ছিল, তারা এসে জাহাজের চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করল।

জাহাজ আসতে সবচেয়ে খুশি হয়েছে উড়ুক্কু মাছেরা। ফিনফিনে ডানায় রুপোলী রোদ মেখে, সেই রোদে ঝিলিক হেনে হাজার হাজার উড়ুক্কু মাছ জাহাজের চারপাশে ওড়াউড়ি করছে। উপসাগরের এই ডানাওলা জলজ প্রাণীরা জাহাজটাকে বুঝিবা সমুদ্র থেকে আসা একটা বিরাট মাছ ভেবে নিয়েছে।

এতক্ষণে ডিঙিগুলো জল সাঁতরে জাহাজের গায়ে গিয়ে লেগেছে।

এদিকে ধীরে ধীরে সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলতে শুরু করেছে। রোদের তেজ মরে আসছে।

একসময় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজ থেকে একে একে অনেকগুলো মানুষ ডিঙিতে নেমে এল। ডিঙিগুলো উপসাগরের পাড়ে মানুষগুলোকে নামিয়ে আবার জাহাজটার দিকে ছুটল। কতবার যে মানুষ নিয়ে ডিঙিগুলো পাড়ে এল সে হিসাব কে রাখে।

এই নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ দ্বীপে অনেক অনেকদিন পর মানুষ এল। অসংখ্য অগণিত মানুষ।

উপসাগরের পাড়ে ম্যানগ্রোভ বনের নিচে ডেলা পাকিয়ে বসল তারা। ভীত চোখে একবার বন, একবার সমুদ্র আর একবার দ্বীপ দেখতে লাগল।

এই মানুষগুলোর আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই যেন। তাদের সকলের চোখের ভাষাই এক, মুখের চেহারা অভিন্ন। ভিড়ের মধ্য থেকে তাদের কাউকেই আলাদা করে নেওয়া যায় না।

অনেক, অনেকদিন পর উত্তর আন্দামানে মানুষ এসেছে। নিঃস্ব, ভীরু, মৃতমুখ একদল মানুষ।

২

বিকেলের দিকে উপসাগরে ঢেউ উঠল। আর উপসাগরে যত ঢেউ উঠল, তার চেয়ে অনেক বেশি উঠল কাপাসীর সর্বাঙ্গে। হাসির ঢেউ। হাসির দমকে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল কাপাসী। বুক-পিঠ-কোমর-পেট—সমস্ত দেহ তার তরঙ্গিত হতে লাগল।

দুপুরে এই উপসাগর জ্বলছিল। তার নিস্তরঙ্গ নীল জলে ঢেউ উঠছিল কি উঠছিল না। কিন্তু এখন সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছে; নীল জল এখন আর জ্বলছে না। এখন উঁচু উঁচু বিশাল ঢেউগুলি পাড়ের ম্যানগ্রোভ বন আর ক্ষয়িত শিলায় আছাড় খাচ্ছে।

উপসাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাপাসী হাসে। পাড়ের বালিতে পায়ের ছাপ গেঁথে গেঁথে সে ছোটে। ছোটে আর হাসে। সর্বাঙ্গ দিয়ে হাসে কাপাসী।

জোড়া ভুরু, মাজা শ্যামলা রঙ, ঘন পালকে ছাওয়া টানা চোখে কালো মণি দুটো টলটল করে। শ্যামল দেহ এখন ভাদ্রের নদী। নদী কেন, অথৈ অকূল সমুদ্রের উপমা দেওয়াই বুঝি ঠিক। এক কথায় সে রূপসী। তার সুঠাম শরীরে যত রূপ তত যৌবন। সেই রূপ সেই যৌবন যেন দেহের কানা ছাপিয়ে উপচে পড়ে।

কাপাসী হাসে। ধারাল তীব্র বিচিত্র হাসি। হাসির শব্দে সাগরপাখি-গুলো ম্যানগ্রোভ বনের মাথা থেকে উড়ে উড়ে যায়। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপ চমকে ওঠে।

বালির উপর মানুষগুলো ডেলা পাকিয়ে বসে ছিল। ভীত জর্জরিত নিঃস্ব একদল মানুষ। এক সঙ্গে গায়ে গা ঠেকিয়ে ডেলা পাকিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে ভীরু চোখে এদিক সেদিক দেখছিল। ভেবেই পাচ্ছিল না, দিনের পর দিন কূলকিনারাহীন অথৈ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এ তারা কোথায় এল! যে জীবন তারা পেছনে অনেক দূরে ফেলে এসেছে সেই বড় সাধের জীবনটাকে বঙ্গোপসাগরের এই বর্বর অরণ্যময় দ্বীপে কেমন করে কোথা থেকে নতুনভাবে শুরু করবে, ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় উপসাগরের পাড়ে কাপাসীর হাসি হঠাৎ মেতে উঠেছে। মানুষের ডেলাটা চমকে চমকে উঠতে লাগল।

কথায় বলে, মন বুঝে ক্ষণ। কাপাসীর হাসি মনও বোঝে না ক্ষণও বোঝে না। বড় অবুঝ তার হাসি মাততেই থাকে।

মানুষের ডেলাটার একধারে বসে ছিল বুড়োবুড়িরা, একধারে বয়স্কা বৌ ঝিরা, একধারে যুবতী মেয়েরা। জলের কিনারা ঘেঁষে বসে ছিল জোয়ান ছেলেরা। বাচ্চাগুলো মা-বাপের গায়ে গায়ে লেপটে ছিল।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'হাসে কে?'

বুড়ি বাসিনী বলে, 'কার পরানে এমুন ফুর্তি জাগল? হাসনের আর সময় গময় নাই?'

একটি বয়স্কা বউ ঘোমটার তলায় মুখ বাঁকাল। বলল, 'পোড়ার মুখে হাসও আসে! এতটুকু সরম ভরম নাই! পোড়ার মুখে পোড়ার হাসি!'

যুবতীরা কিছুই বলে না। চুপচাপ মুখ বুজে বসেই থাকে।

জোয়ান ছেলেরাও কিছু বলে না। অবাক হয়ে দেখে, উপসাগরের পাড়ে পায়ের দাগ এঁকে এঁকে কেমন করে সুঠাম শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে কাপাসী ছুটছে। অবাক হয়ে কাপাসীর হাসির তীব্র অবুঝ বিচিত্র শব্দ শোনে তারা।

বাচ্চাগুলোও কিছু বলে না। মা-বাপকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে থাকে।

বুড়ো রসিক শীল আবার বলে, 'হাসে কে?'

বুড়ি বাসিনী আবার বলে, 'পোড়ার মুখে ঈশ্বর হাসও দেয়! আমরা চিন্তায় মরি। আলিসান সমুন্দর পাড়ি দিয়া কোনখানে আইলাম! আর মাগী হাসে; অঙ্গ ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া হাসে। মাগীটা কে?'

বয়স্কা বউটি ঘোমটার তলা থেকে বলে, 'কাপাসী। নিত্য ঢালীর মাইয়া।'

রসিক শীল এবার ডাকে, 'অ নিত্য—'

ডেলার ভেতর থেকে একটা মানুষ উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত মুখে চোখা চোখা কাঁচাপাকা দাড়ি, মজবুত বুক, শক্ত কব্জি, কিন্তু চোখ দুটি ঘোলাটে, বিবর্ণ।

ধরা ধরা ভাঙা স্বরে সে বলল, 'আমারে ডাকলা রসিক খুড়া ?'

'হ।'

'ক্যান ?'

'মাইয়া অমুন হাসে ক্যান ?'

'মাইয়ার মনে কী আছে, আমি ক্যামনে জানুম ?'

রসিক শীল এবার ক্ষেপে উঠল, 'এতটুকু লাজ সরম নাই, নিলাজ ডাকাবুকা মাগী।' একটু থেমে আবার বলে, 'মাইয়ার হাস সামাল দে নিত্য।'

'মাইয়ার হাস কি আমার বশে ! তুমি তো হগলই (সকলই) জান খুড়া।' মুখখানা কাঁচুমাচু করে তাকিয়ে থাকে নিত্য ঢালী।

একটু সময় কি যেন ভাবে রসিক শীল। হঠাৎ স্বরটাকে নরম করে বলে, 'হগলই বুঝি নিত্য ; কিন্তুক এ অইল আন্ধারমান (আন্দামান) দ্বীপ ! বিদ্যাশ অচিন জায়গা। ডরে বুক শুকাইয়া যায়। মাইয়ার পরানেই খালি ডর নাই।'

বিষণ্ণ গলায় নিত্য ঢালী বলে, 'অর জনমটাই ব্রেথা (বৃথা) হইয়া গেছে খুড়া। ডর, সরমভরম কিছুই কি অর আছে ! কুন সময় হাসব, কুন সময় কানুব (কাঁদবে) কে কইতে পারে !'

রসিক শীল আর কিছু বলে না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। তার ঘোলা ঘোলা চোখ দুটিতে কেমন যেন সহানুভূতির ছায়া পড়ে। একটুক্ষণ পর সে বলে, 'হগলই তো বুঝি নিত্য, কিন্তুক মানুষের মন তো বুঝ মানব না। এত বড় মাইয়া, যেখানে হেখানে হাসন কি মানায় ! দেখায় ক্যামন ?'

নিত্য ঢালী উত্তর দেয় না।

কেমন মানায় কেমন দেখায়, তা বুঝে কি আর কাপাসী হাসে। উপসাগরের পাড়ে বালিতে পা গেঁথে গেঁথে সে শুধু ছোটে। ছোটে আর হাসে। কোন-দিকে তার লক্ষ নেই। তার অবুঝ হাসি ম্যানগ্রোভ বনের মধ্য দিয়ে হাওয়ায় ভর করে সরসরিয়ে ছুটে যায়।

কত বছর পর উপনিবেশ গড়ার আশায় মানুষ এসেছে এই দ্বীপে। মানুষের হাসি এসেছে। নির্জন নিঃসঙ্গ বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ কত বছর পর মানুষের হাসি শুনছে !

ঘোমটার তলায় বউরা বলে, ঘোমটা খসিয়ে বয়স্কা মেয়েমানুষগুলো বলে, 'হাসন ! হাসন না তো মরণ ! মাগীর অঙ্গে এত হাসও আছে ! হগল খুয়াইয়া মাইনষে এ্যামুন হাসতেও পারে !'

কেন জানি বুড়ো রসিক শীল বলে, 'আহা হাসুক হাসুক। হগলই তো অর গেছে, জনমটাই ব্রেথা হইয়া গেছে। হাসলে এট্টু যদি শান্তি পায় তো হাসুক।'

জাহাজ আসার শব্দে জনকতক মানুষ জঙ্গল ফুঁড়ে এরিয়াল উপসাগরের

পাড়ে চলে এসেছিল। এখন তারা একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে জনচারেক আদিবাসী রাঁচী কুলী। তাদের নাম ধানোয়ার, কচ্ছপ, ভুগুভুগু আর টিরকি। একজন পাটোয়ারী—আতমন সিং। একজন চেইন ম্যান—নিবারণ সাপুই। আর একজন কলোনাইজেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট—সংক্ষেপে সি এ। সি. এ. নামের নিচে তার আদত নামটা হারিয়ে গেছে। অনেকে অবশ্য তাকে পালসাহাব বলেও ডাকে।

দলটা এক ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

সি. এ. পালসাহাব সামনে এগিয়ে এল। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, বোতামহীন হাফ শার্টের ফাঁকে রোমশ মাংসল বুক, ভাঙা ভাঙা ক্ষয়ে যাওয়া নখ, মাথায় ফেল্টের হ্যাট। হ্যাটটার আদি বর্ণ কী ছিল পালসাহাবও হয়ত বলতে পারবে না। লোমওলা বুক, মুখময় আগাছার মতো অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়িগোঁফ, নোংরা দাঁত আর জংলী অমার্জিত চেহারা থেকে তার সঠিক বয়স বার করা দুরূহ ব্যাপার।

উপসাগরটাকে চমকে দিয়ে পালসাহাব চিৎকার করে উঠল, 'শালে লোগ, আমি সি. এ. পালসাহাব। কথাটা মনে রাখবি। এখন আমার সাথ সাথ চল।'

মানুষের ডেলাটা নড়ে উঠল। কাপাসীর হাসি আচমকা থেমে গেল।

অনেক অনেক দূরে বড় সাধের একটা জীবনকে ফেলে এসেছে মানুষগুলো। স্মৃতি ছাড়া সেই জীবন থেকে তারা কিছুই আনতে পারে নি। নিঃশব্দে খালি হাতে তারা উঠে দাঁড়াল।

এদিকে এরিয়াল উপসাগরের মাঝখানে ঘড় ঘড় শব্দ উঠল। বিকট আওয়াজে জাহাজীরা নোঙর তুলছে। পাড়ের মানুষগুলো চকিত হয়ে ফিরে তাকাল।

একটু পরেই জাহাজটা দূরের সমুদ্রে রওনা হল।

এরিয়াল উপসাগরটা ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে একদিকে সমুদ্রে মিশেছে। আর একদিকে সরু হয়ে হয়ে একটা খাড়ির সৃষ্টি করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে কে জানে।

অগভীর খাড়ির দুপাশে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। নোনা জলে পাথর ক্ষয়ে গেছে। দু'পাশ থেকে ম্যানগ্রোভ গাছগুলো খাড়ির উপর ঝুঁকে পড়েছে।

এতক্ষণ খাড়ির মুখে নোনা কালো জল ফুলে ফুলে উঠছিল, গেঁজে গেঁজে ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। এবার সেখানে একটা ছোট মোটর বোট দেখা দিল। বোটটার ভট্ ভট্ শব্দ কানে আসছে। দেখেই বোঝা যায়, এটা শেল কালেক্টারদের বোট, নাম 'নটিলাস'।

'শেল' অর্থাৎ সামুদ্রিক শঙ্খ কড়ি বা শামুক। এদের রূপের বাহার যত, নামের বাহার তত। কোনটার নাম টার্বো, কোনটার ট্রোকাস, কোনটার বা সান ডায়াল। আরো আছে—যেমন নটিলাস, ফ্রগশেল, ক্লাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

শঙ্খ, কড়ি, শামুক—'শেল' কালেক্টাররা এগুলোকে বলে 'সিপি'।

অগভীর উপসাগরে ডুব মেরে মেরে ডুবুরিরা 'সিপি' তোলে। আন্দামানের 'সিপি' জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশের বন্দরে চালান যায়। আন্দামানের শঙ্খকড়ি শৌখিন বিদেশীর চোখ ধাঁধায়। বিলাসিনী বিদেশিনীর শখ মেটায়।

'নটিলাস' বোট এবার ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে খাড়ির মুখ থেকে উপসাগরের কিনার ঘেঁসে এগুতে থাকে। শব্দ ওঠে কি ওঠে না। আপনা থেকে উপসাগরে যে ঢেউ উঠছে, তার উপর বাড়তি ঢেউ জাগে কি জাগে না।

জলের নিচে বাদামী বালির বিছানা। মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে ছোট ছোট ক্ষয়িত পাথর। পাথরের গায়ে কত কালের শ্যাওলা জমে পিছল হয়ে আছে। সবুজ রঙের জলজ লতার গোছা পাথরগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে।

কাচের মত স্বচ্ছ নীলচে জলের তলায় সবই পরিষ্কার দেখা যায়। শেষ বেলার রোদে বালির কণাগুলি চিকমিক করে। শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী আঁশে ঝলক দিয়ে ছোট ছোট মায়া মাছগুলি উলসে ওঠে।

'নটিলাস' বোট আস্তে আস্তে এগুতে থাকে।

বোটটার মাঝখানে ছোট একটা শেড। শেডের একদিকে দুটো মানুষ চুপচাপ বসে রয়েছে। তাদের একজন বর্মী, নাম লা তে। লা তে 'নটিলাস' বোটের ডাইভার। আন্দামানের উপকূল আর উপসাগরের জলে ডুব দিয়ে দিয়ে সে 'সিপি' তোলে। জলের নিচে দৃষ্টিটাকে নামিয়ে দিয়ে অনেকখানি ঝুঁকে রয়েছে সে।

লা তে'র পাশে খিলাফৎ খান। খিলাফৎ পাঠান। সে ভুবনুরি নয়, ফরেস্ট গার্ড। কি শখ হয়েছে খিলাফতের, সে-ই জানে। আজ লা তে'দের সঙ্গে 'নটিলাস' বোটে বেরিয়ে পড়েছে।

শেডের ওপাশে বসে রয়েছে পানিকর। 'নটিলাস' বোটের মালিক। উত্তর আন্দামানের এই এলাকাটা 'শেল' তোলার জন্য সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে সে।

লা তে'র পাশ থেকে খিলাফৎ খান ডাকে, 'এই—'

লা তে জবাব দেয় না।

ভোঁতা কর্কশ স্বরে খিলাফৎ আবার ডাকে, 'লা তে, এ শালে লা তে।'

লা তে এবার চমকে উঠল, 'হাঁ হাঁ খান সাহাব, কী বলছ ?'

আস্তে করে একটা খিস্তি দিল খিলাফৎ, 'নালায়েক কাঁহিকা, কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছে না—'

এক মুহূর্ত খিলাফৎ খানের দিকে চেয়ে রইল লা তে। পরক্ষণেই তার দৃষ্টিটা উপসাগর ফুঁড়ে নিচে নেমে গেল।

ইতিমধ্যে উপসাগরের ঢেউ মরে আসতে শুরু করেছে। নীল জল এখন স্থির, শান্ত।

'নটিলাস' বোট উপসাগরে এতটুকু আলোড়ন না তুলে এগিয়ে যায়। বালির বিছানার বুকে হাঁটছে টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস। কোনরকম শব্দ হলেই উপসাগর থেকে তারা অথৈ সমুদ্রে পালিয়ে যাবে।

বালির উপর আঁকাবাঁকা আড়াআড়ি অসংখ্য দাগ ; ওগুলো 'সিপি' চলার দাগ।

একটা টার্বো গুটি গুটি এগুচ্ছিল। তীক্ষ্ন নজরে সেটাকে লক্ষ করছিল লা তে। হঠাৎ পাশ থেকে পিঠের ওপর কনুইর গুঁতো পড়ল। লা তে লাফিয়ে উঠল, 'হাঁ হাঁ, খানসাহেব—কুছু বলছ ?'

'শালে উল্লু, দরিয়ায় এলে পাগলা বনে যায়। আমাকে বসিয়ে রেখে 'সিপি' তুলবি, আর আমি মুখ বুজে বসে থাকব। অ্যায়সা হবে না।' খিলাফৎ খান খেঁকিয়ে উঠল।

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে, কুতকুতে চোখ দুটো পিট পিট করে লা তে বলল, 'হাঁ হাঁ, জরুর—'

একটুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ খিলাফৎ খান হুস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'লা তে, সরকার এই ডিগলিপুরের জঙ্গল সাফ করে ফেলছে।'

'হাঁ—'

'বড় বড় পেমা বরগদ্ভ দিদু গাছগুলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে লোপাট করে দিচ্ছে। ডিগলিপুরে জঙ্গল আর থাকবে না '

'হাঁ—'

'এখানে ক্ষেতিবাড়ি হবে, গাঁও বসবে, কলোনি হবে।'

অন্যমনস্ক উদাসীন ভঙ্গিতে লা তে সায় দেয়, 'হাঁ—' কথার পিঠে কথা বলছে বটে কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই লা তে'র। খিলাফতের কথাগুলো তার কানে যায় কি যায় না। তীক্ষ্ন চোখে উপসাগরের তলায় তাকিয়েই রয়েছে সে।

অনেক নিচে বিরাট একটা ক্লাম দুটো সাদা ডালা খুলে আয়েশ করে শুয়ে আছে। দুই ডালার মধ্যে সবুজ রঙের আলোকপিণ্ড ঝিকমিক করে। ক্লামটার চারপাশে দুটো বাচ্চা হাঙর দারুণ খুশিতে ডিগবাজি খায়। মাঝে মাঝে সারি সারি ধারাল দাঁতে ক্লামটাকে ঠুকরে ঠুকরে সোহাগ জানায়।

চাপা মঙ্গোলিয়ান চোখ দুটো তীব্র হয়ে উঠেছে লা তে'র। থ্যাবড়া নাকের ডগাটা উত্তেজনায় তির তির করে কাঁপছে। কোমরে একটা ছোরার বাঁট দেখা যায় তার। নিজের অজান্তেই লা তে'র হাত বাঁটটার ওপর এসে পড়ল। আস্তে আস্তে বোটের শেষ মাথায় এসে দুই পা জোড়া করে ওত পেতে বসল সে।

পাশ থেকে খিলাফৎ খান আবার বলতে লাগল, 'কিড সাহাবের কলোনি উঠে গিয়েছিল, ভালই হয়েছিল।'

লা তে জবাব দিল না।

খিলাফৎ নিজের খেয়ালেই বকে যায়, 'লেকিন এত বছর বাদে আবার মানুষ এল। দুশমনেরা এখানেও আমাকে টিকতে দেবে না।'

লা তে এবারও নিরুত্তর। একদৃষ্টে ক্লাম আর বাচ্চা হাঙর দুটোকে দেখতে লাগল।

'বুঝলি লা তে—' বলে একটু থামল খিলাফৎ। লা তে'র দিক থেকে সায় না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ হারামী, এ লা তে—'

কিন্তু আধাআধি কথা খিলাফতের মুখেই রয়ে গেল। পুরো হবার আগেই উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লা তে।

সঙ্গে সঙ্গে হাঙরের বাচ্চাদুটো পাথরের খাঁজে পালিয়ে গেল। ক্লামের ডালা বন্ধ হয়ে সবুজ আলোর ডেলাটাকে লুকিয়ে ফেলল।

কয়েক মিনিটের ভেতর ডুব দিয়ে ক্লামটাকে বোটের উপর তুলে আনল লা তে। সে পাকা ডুবুরি, ওস্তাদ ডাইভার। ডুব দিলে সমুদ্র থেকে কিছু কর আদায় না করে সে ফেরে না। আন্দামান সমুদ্রের সঙ্গে তার সারা জীবনের সম্পর্ক। কোন উপসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো আসে, কোথায় সান ডায়ালের আস্তানা, কোথায় মুক্তা-ঝিনুক মেলে, সব—সব লা তে'র জানা। অক্টোপাসের সঙ্গে যুঝে যুঝে, হাঙরের মুখ থেকে কিংবা হিংস্র রেমোরা মাছের সঙ্গে লড়াই

করে 'সিপি' তোলে লা তে। অন্য ডাইভাররা যখন দশটা 'সিপি' তোলে, সে তোলে বিশটা।

'সিপি' তোলার মরসুমের অনেক আগেই শেল কালেক্টররা তাকে বায়না করে। দিন কয়েক আগে এবার 'সিপি'র মরসুম শুরু হয়েছে। এই মরসুমে তাকে কাজে নিয়েছে পানিকর।

শেডের ওপাশে একটা খুশীর গলা শোনা গেল। পানিকর বলছে, 'কী 'সিপি' তুললি রে লা তে ?'

'ক্লাম।'

'বহুত আচ্ছা—'

ক্লামটাকে বোটের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে জুত করে বসল লা তে। পানিকরই বোট চালাচ্ছিল ; আস্তে আস্তে জলে এতটুকু ঢেউ না তুলে উপসাগরের কিনার থেকে বোটটাকে একটু দূরে সমুদ্রের দিকে নিয়ে এল।

রোদ এখন নিভু নিভু। বিষণ্ন মলিন আলো উপসাগরের জলে অল্প অল্প দোল খায়।

খিলাফৎ খান নিজের ঘোরে বলতে লাগল, 'আজকালের মধ্যে এখানে মানুষ আসবে, বহোত বহোত আদমী। তাদের জন্যে জঙ্গল সাফ করা হচ্ছে। তারা এখানে কলোনি বানাবে।'

'হাঁ—'অভ্যাসবশে একটি মাত্র শব্দ করে সায় দিল লা তে। তার অন্য কোনদিকে নজর নেই। উপসাগরের দিকে ঝুঁকে সে আরো 'সিপি' খুঁজছে।

'মানুষ হল বেইমান, দুশমন—'

'হাঁ—'

'শালে এখান থেকে চলে যাব।'

'হাঁ—'

হঠাৎ শেডের ওপাশ থেকে পানিকর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই লা তে, এ খিলাফৎ—'

'হাঁ—হাঁ—'লা তে আর খিলাফৎ চমকে উঠল।

পানিকর বলল, 'ঐ দ্যাখ জাহাজ—'

'জাহাজ !' খিলাফৎ খান আঁতকে উঠল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল উপসাগর থেকে একটা বিরাট জাহাজ ভাসতে ভাসতে দূর সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা ঘুরে দূরে উপসাগরের পাড়ে গিয়ে পড়ল। যেখানে একদল মানুষ কাতার দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলেছে।

বুকে একটা চাপড় মারল খিলাফৎ। গলায় আক্ষেপের স্বর ফুটল তার, 'আঃ, আদমীগুলো এসে পড়ল ! জঙ্গলের জান এবার বিলকুল খতম !'

খিলাফৎ খান দেখল, কিড সাহেবের কলোনি উঠে যাবার একশো যাট বছর বাদে আবার মানুষ এসেছে উত্তর আন্দামানে।

আগে আগে চলেছে সি এ পালসাহাব, মাঝখানে মানুষের দলটা, একেবারে পেছনে পেছনে আসছে ফরেস্টের কুলী, সরকারী চেইনম্যান, পাটোয়ারী আর জবাবদাররা।

উপসাগরের পর খানিকটা সমতল। সেখানে ম্যানগ্রোভ বন। সমতল জায়গাটা ক্রমশঃ চড়াই হয়ে ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে। পাহাড়ের গায়ে প্যাডক, পাপিতা, চুগলুম গাছের বন। বেতের লতা গাছগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে অরণ্যকে জটিল করে তুলেছে।

আন্দামানের অরণ্য!

কতকাল ধরে এই বনভূমি বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপের দখল নিয়েছে। কিড সাহেবের কলোনি উঠে যাবার পর এই নির্জন নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন দ্বীপে অধিকার কায়েম করতে কোন দিন দ্বিতীয় কোন দাবীদার জোটে নি। বছরের পর বছর এই দ্বীপে কত বনস্পতি, কত ক্ষুদ্র নগণ্য উদ্ভিদই না জন্মেছে। গাছে ফুল ধরেছে, ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ; বীজের মধ্যে অরণ্য আবার নতুন করে জন্ম নিয়েছে। শিকড়ে বাকড়ে সন্তান সন্ততিতে এই অরণ্য কতকাল ধরে এই দ্বীপের মাটি ঢেকে রেখেছে।

সবার আগে আগে চলেছে পালসাহাব। হাতে একটা ধারাল বর্মী দা। দা দিয়ে লতাপাতা ডালপালা কেটে ছেঁটে পথ করে এগুচ্ছে সে। শুধু সে-ই না, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আজ যারা নতুন এই দ্বীপে এল তাদের মধ্যে যে সব শক্তসমর্থ পুরুষ রয়েছে তারাও জঙ্গল কেটে কেটে এগুচ্ছে।

অরণ্য কি সহজে পথ দিতে চায়! ডালপালার হাজার বাহু বাড়িয়ে এই দ্বীপের নতুন শরিকদের ক্রমাগত বাধা দিচ্ছে। কোথাও রয়েছে হাওয়াই বুটির ঝোপ, কোথাও বেত কাঁটার ঝাড়, কোথাও নাম না-জানা বুনো গাছের চাপ-বাঁধা দেওয়াল।

কতকাল এই অরণ্যে সূর্যালোক ঢোকে নি। নিঝুম নিস্তব্ধ ছায়াশীতল এই বনভূমি।

শ্যাওলা-ধরা পিছল মাটির ওপর দিয়ে দুলে দুলে, কখনও গুঁড়ি মেরে, কখনও উবু হয়ে এগুচ্ছে পালসাহাব। আর সমানে উৎসাহ দিচ্ছে, 'আ যা, কেমন আচ্ছা সড়ক বানিয়ে দিচ্ছি। মাথা সামাল রেখে আমার পিছু পিছু আ যা। কোই ডর নেহী।'

ডালপালা ছাঁটতে ছাঁটতে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকায় পালসাহাব। হলদে নোংরা দাঁতগুলো মেলে খ্যা খ্যা করে হাসে। বলে, 'শালে লোগ, ঘাবড়াও মাত্ ; তোদের সাথ আমি আছি।' বলেই বুকে চাপড় বসায়।

পায়ে পায়ে ঠোক্কর, মাথায় গুঁতো আর চারপাশ থেকে ডালপালা এবং কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে মানুষের পিণ্ডটা এগিয়ে চলেছে।

প্যাডক, চুগলুম কি দিদু গাছের মাথা থেকে থোকায় থোকায় জোঁক পড়ছে। কতকালের ক্ষুধার্ত সব রক্তচোষা জীব! এই প্রথম তারা মানুষের রক্তের স্বাদ পাচ্ছে।

বুড়ো রসিক শীল ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কাঁপা-কাঁপা ফিস-ফিস স্বরে সে বলে, 'এই আমরা আইলাম কুনখানে!'

মানুষের ডেলাটার মধ্য থেকে কে যেন বলে, 'নিঘ্ঘাত মইরা যামু। এট্টা দিনও বাঁচুম না।'

চলতে চলতে কান্নার শব্দ উঠল। সেই মৃতমুখ নিঃস্ব মানুষগুলো গলা মিলিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। অসহায় ভীত মানুষের কান্না উত্তর আন্দামানের এই স্তব্ধ অরণ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কতকাল পর এখানে মানুষ কাঁদছে! কান্নার শব্দ নিবিড় বনভূমি ভেদ করে বাইরে যায় না, বৃদ্ধ বয়স্ক গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে জমাট বেঁধে যেতে লাগল যেন।

গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকছিল পালসাহাব। হঠাৎ উঠে ঘুরে দাঁড়াল। ফেল্ট হ্যাটের নিচে যে মুখটা দেখা যায় সেটা বিরক্ত এবং ভয়ানক হয়ে উঠেছে। কপালটা কুঁচকে অনেকগুলো আঁকিবুকি ফুটেছে। নাকটা ফুলে ফুলে মোটা হচ্ছে।

পালসাহাব গর্জে উঠল, 'কৌন কোন—কে কাঁদছে? কাঁদো মাত। এ জঙ্গল আমার এলাকা, এখানে চিল্লানি চলবে না। উল্লু লোগ —' বলেই আবার ঘুরে ঝোপটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকে গেল।

মুহূর্তে কান্নার আওয়াজ ঝিমিয়ে এল।

অন্ধকার হিমাক্ত নিঝুম এই বনভূমির মাথায় আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় কিন্তু দেখা যায় না। বোঝা যায়, অরণ্যের বাইরে এখনও অল্প-স্বল্প রোদ রয়েছে। কিন্তু সে রোদের রঙ কী, তেজ কতটা, বুঝবার উপায় নেই।

নিশির ডাকের মতো বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে মানুষগুলো পালসাহাবের পিছু পিছু চলেছে। কোথায় কেন তারা চলেছে, নিজেরাই তা ভুলে গেছে। সে সম্পর্কে তাদের যেন আগ্রহ পর্যন্ত নেই। কী এক দুর্বোধ্য নিষ্ঠুর নিয়তি মানুষের ডেলাটাকে ক্রমাগত ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে চলেছে।

মাথার ওপর থেকে থোকায় থোকায় যে জোঁক ঝরছে মানুষের রক্ত শুষে

শুষে কাঁচ পটলের মতো ফুলে উঠে আপনা থেকেই এক সময় সেগুলো গা থেকে খসে পড়তে লাগল।

এদিকে কান্নার শব্দটা ঝিমিয়ে এসেছে ঠিকই কিন্তু একেবারে থামে নি। অনুচ্চ করুণ স্বরে মানুষগুলো বিনিয়ে বিনিয়ে এখন কাঁদছে।

বুড়ো রসিক শীল বলে, 'হা ঈশ্বর, কপালে এত লেখছিলা! এই কুন দ্যাশে মারতে আনলা? হা ঈশ্বর—' বলতে বলতে তার গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর মানুষের চাপা কান্না আর এই নিথর বনভূমিকে হঠাৎ চমকে দিয়ে তীব্র তীক্ষ্ন প্রখর হাসির শব্দ উঠল। কাপাসী হাসছে। ক্রমশ উথল-পাথল হয়ে উঠতে লাগল হাসিটা।

একটা কাঁটাঝোপ কেটে কেটে পথ বানাচ্ছিল পালসাহাব। হাসির শব্দে সে ঘুরে দাঁড়াল। দাড়িভর্তি জংলী মুখটা খিঁচিয়ে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'কোন, কোন হাসতা?'

কাঁপা ভীরু স্বরে কে যেন জবাব দিল, 'নিত্য ঢালীর মাইয়া কাপাসী। কাপাসী হাসে সাহেব বাবা।'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'এ হল ডিগলিপুর, নর্থ আন্দামান। এখানে হাসি চলবে না।'

হাসি চলবে না! কিন্তু চলল।

এক ধমকে এক দল মানুষের কান্না থামিয়ে দিয়েছিল পালসাহাব। কিন্তু কাপাসীর হাসি থামানো গেল না। উত্তর আন্দামানের স্তব্ধ অরণ্যে চমক দিয়ে দিয়ে কাপাসীর হাসি মাততেই লাগল।

পালসাহাবের ভুরু দুটো কুঁকড়ে রইল কিছুক্ষণ। বিড় বিড় করে সে বলল, 'বহোত তাজ্জবের লেড়কী।' বলেই আবার সামনের দিকে চলতে শুরু করল।

পালসাহাবের পিছু পিছু মানুষের পিণ্ডটা কতক্ষণ যে চলল, হিসাব নেই। টিলা-পাহাড়-চড়াই-উতরাই পেরিয়ে জঙ্গল ফুঁড়ে ফুঁড়ে কোথায় কতদূরে চলেছে, ওরা জানে না। চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে, কাঁটার খোঁচায় সমস্ত শরীর রক্তাক্ত! জোঁকের পেটে তাজা রক্তের কর দিয়ে তারা চলেছে তো চলেছেই।

একসময় বোঝা গেল অরণ্যের মাথায় আকাশটা ঝাপসা হয়ে গেছে। রোদ আর নেই।

ডানা ঝাপটিয়ে সিন্ধুসারসগুলো বনের আশ্রয়ে ফিরে যাচ্ছে। ক্রঁক ক্রঁক শব্দে কোয়াক পাখিরা ডেকে উঠল। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে সন্ধ্যা নামল।

পালসাহাব নামে এক অনিবার্য নিয়তির পিছু পিছু চলতে চলতে মানুষগুলো একসময় একটা টিলার মাথায় এসে পড়ল।

এ জায়গাটা পরিষ্কার। এলোমেলো কিছু ঝোপঝাড় থাকলেও বড় বড় গাছ এখানে চোখে পড়ে না। ফলে অন্ধকার এখানে তত গাঢ় নয়।

পালসাহাব থমকে দাঁড়াল। পেছনা দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল, 'আ গিয়া, ট্রানজিট ক্যাম্প আ গিয়া—'

৫

ট্রানজিট ক্যাম্প।

উঁচু টিলাটার মাথায় কতকগুলো বাঁশের টুকরো এখানে ওখানে পুঁতে রাখা হয়েছে। সেগুলোর গায়ে গোটাকতক লণ্ঠন বাঁধা।

বঙ্গোপসাগরের এই বর্বর দ্বীপের রাত্রিগুলো কেমন যেন সৃষ্টিছাড়া। এখন যত না অন্ধকার তার চেয়ে ঢের বেশি কুয়াশা।

সেই বিকেল থেকেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল। প্রথমে ফিনফিনে একটা পর্দার মতো অরণ্যকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর ধীরে ধীরে সেই কুয়াশা জমাট বেঁধে, গাঢ় এবং স্তূপাকার হয়ে দিগন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। চারপাশ থেকে নিরেট অন্ধকারের খাড়া খাড়া দেওয়াল আকাশের দিকে উঠে গেছে।

অরণ্য বা আকাশ—কিছুই এখন দেখা যায় না। কোন কিছুর নির্দিষ্ট আকার ঠিকমত বোঝা যায় না। সব এখন অবলুপ্ত। গাঢ় ঘন সাদা কুয়াশা আন্দামানের এই টিলাটাকে গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে যেন।

বাঁশের ডগায় মিট মিট করে লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। মৃদু আলোতে কুয়াশা এবং অন্ধকার সামান্য ফিকে হয়েছে মাত্র।

টিলার মাথাটা অনেকখানি জুড়ে সমতল। জঙ্গল সাফ করে এখানে অনেকখানি মাটি বার করা হয়েছে। এখানে ওখানে মাটি ফুঁড়ে সারি সারি কতকগুলি ঝুপড়ি উঠেছে।

অরণ্যকে দলে পিষে এবং মুচড়ে দিয়ে বাতাস ছুটে আসছে। দমকা বাতাসের ঘা খেয়ে খেয়ে লণ্ঠনগুলো নিবে যাবার উপক্রম হয়, নির্জীব হয়ে পড়ে। নিজেদের ক্ষীণ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা পাল্লা দিয়ে বাতাস কুয়াশা এবং অন্ধকারের সঙ্গে যুঝে চলেছে।

আবছা আলোতে বোঝা যায়, এধারে ওধারে অনেকগুলো ঝুপড়ি। সেগুলোর মাথায় বেতপাতার চাল, বাঁশের বেড়া, বাঁশের পাটাতন।

সি. এ. পালসাহাব টেনে টেনে চিল্লাল, 'দেখে নে শালে লোগ—এই হল ট্রানজিট ক্যাম্প, তোদের আস্তানা।'

পালসাহাবের পেছনে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কেউ জবাব দেয় না। শূন্য দৃষ্টিতে ঝুপড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করে।

পালসাহাব বলল, 'যতদিন না নিজের নিজের কোঠি বানিয়ে নিতে পারবি ততদিন এখানেই থাকতে হবে।'

এর মধ্যে পাটোয়ারী চেনম্যান এবং রাঁচীর কুলীরা অনেকগুলো মশাল ধরিয়ে ফেলেছে। এবার অন্ধকার এবং কুয়াশা অনেকটা পিছু হটল।

পালসাহাব মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা, সবাই ঝোপড়ির ভেতর যা। এবার খানা মিলবে।'

মানুষগুলো নড়ল না। আগের মতই শূন্য চোখে ঝুপড়ি ক'টার দিকে তাকিয়ে রইল।

পালসাহাব আবার বলল, 'ঝোপড়ির ভেতর যা, খানা মিলবে।'

পুরো পাঁচটা দিন বঙ্গোপসাগরের অগাধ কালো জল পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে এসে পেঁছেছে মানুষগুলো। এই পাঁচ দিন তাদের ঠিকমত খাদ্য জোটে নি। জাহাজ থেকে চারপাশে পারাপারহীন সমুদ্র দেখতে দেখতে অদ্ভুত এক ভয়ে তারা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। বুঝে উঠতে পারছিল না, এই বিপুল কালাপানি পেরিয়ে তারা কোথায় চলেছে।

যতদূর তাকানো যেত, কালো কুটিল দুর্জ্ঞেয় বঙ্গোপসাগর। তাদের মনে হয়েছিল, এই সমুদ্রের শেষ নেই। সমুদ্র কোনদিন ফুরোবে না।

কিন্তু সমুদ্র একদিন ফুরোল। কূলও মিলল ; শক্ত নির্ভরযোগ্য মাটির দেখা পাওয়া গেল। এরিয়াল উপসাগরে এসে জাহাজ নোঙর ফেলল।

ভয়েও বুঝি এক ধরনের নেশা আছে। ভয়ংকর সমুদ্র দেখে যে নেশা ধরেছিল, সেই নেশার ঘোর এখনও কাটেনি এই মানুষগুলোর।

পালসাহাব এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কি রে শালেরা, ঝোপড়ির ভেতর যাবি না! খানা গিলবি না!'

পাঁচটা দিন জাহাজে ভালো করে খেতে পারে নি। তবু খাদ্যের কথায় মানুষগুলোকে এতটুকু উৎসুক দেখাল না। বিন্দুমাত্র চঞ্চল হলো না কেউ। এই মুহূর্তে তাদের খিদে এবং তেষ্টার অনুভূতিও যেন লোপ পেয়েছে।

এবার পালসাহাব আর চিল্লাল না, খেঁকাল না। মানুষগুলোকে বেতের মোটা একটি ডাণ্ডা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঝুপড়ির ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ত এই মানুষগুলোর চরিত্র অনেকখানি বুঝে ফেলেছে পালসাহাব। এদের নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। আর থাকলেও সে ইচ্ছা তাদের উপর কোন ক্রিয়াই করে না। অন্যের ইচ্ছায় কি তাড়নায় তারা নড়ে চড়ে, চলে ফেরে।

ঝুপড়ির ভেতর ঢুকিয়ে সবাইকে সারি সারি বসিয়ে দিল পালসাহাব।

পাটোয়ারী এবং চেনম্যানরা বড় বড় প্যাডক পাতায় ভাত ডাল এবং মাছের সুরুয়া দিতে লাগল।

মানুষগুলো গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে টিলার মাথায় এই নতুন আশ্রয় আর চেনম্যান পাটোয়ারীদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে দেখতে কী ভাবছে, তারাই জানে।

পালসাহাব চিৎকার করে উঠল, 'খা শালেরা, হাতের সামনে খানা রয়েছে। গপাগপ মুখে ঢোকাবি তো। খাওয়ার কথাও বুদ্ধুগুলোকে বলে দিতে হয়! বহোত তাজ্জবের আদমী সব।'

চিল্লিয়ে ধমকে একরকম জবরদস্তি করেই পালসাহাব মানুষগুলোকে খাওয়াল।

খাওয়ার পালা চুকে গেলে পাটোয়ারী আর চেনম্যানরা ঝুপড়িগুলো সাফ করে ফেলল। পালসাহাব বলল, 'মরদানারা (পুরুষেরা) আমার সাথ আয়।'

পালসাহাবের মুখ থেকে কথা খসবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মানুষগুলো উঠে পড়ল এবং তার পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এল।

টিলার মাথায় মোট চল্লিশটা ঝুপড়ি। পালসাহাব বলল, 'বিশ ঝুপড়িতে মরদানারা থাকবে, বাকি বিশ ঝুপড়িতে বালবাচ্চা নিয়ে জেনানারা থাকবে।'

পালসাহাবই থাকার সব বন্দোবস্ত করে দিল। সামনের দিকের ঝুপড়িগুলো পুরুষদের ; পেছনের ঝুপড়িগুলো মেয়েদের।

বাইরে রাত্রি আরো গাঢ় হয়েছে। কুয়াশা এবং অন্ধকারের তলায় উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা একেবারেই হারিয়ে গেছে যেন।

পালসাহাব বলল, 'এবার আমি যাব। জোঁক, কানখাজুরা (এক ধরনের বিষাক্ত বিছে) আর সাপ মেহেরবানি করে যদি রাত্তিরটা তোদের বাঁচিয়ে রাখে তা হলে কাল সকালে আবার দেখা হবে।' বলে পালসাহাব হাসল। হাসলে দু-পাটির সবগুলো ভাঙা বাঁকা হলদে ছোপধরা দাঁত বেরিয়ে পড়ে।

বিকট শব্দ করে হাসতে থাকে পালসাহাব। হাসির দাপটে ভুরু আর হনু জোড়া লেগে চোখ দুটো ঢেকে যায়। বিশাল মাংসল শরীর দুলতে থাকে।

খানিকটা পর হাসির দাপট কমল। পালসাহাব বলল, 'আমি যাচ্ছি। লেকিন একটা কথা মনে রাখিস শালে লোগ। কোন হারামী জেনানাদের ঝুপড়ির দিকে যাবি না। গেলে হাড্ডি চুরচুর করে ফেলব, জান তুড়ে দেব। এই জঙ্গল আমার দুনিয়া, এখানে দুশমনি বেয়াদপি চলবে না। হোঁশিয়ার! মানুষগুলোকে সাবধান করে দিয়ে পালসাহাব ঝুপড়ির বাইরে এল। চেনম্যান এবং পাটোয়ারীরা আগেই চলে গেছে। পালসাহাব একটা মশাল ধরাল তারপর খাড়াই টিলাটা বেয়ে নিচের উপত্যকায় নেমে গেল। সেখান থেকে গভীর জঙ্গলের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

মুহূর্তে উত্তর আন্দামানের কুয়াশা অন্ধকার এবং অরণ্য পালসাহাব আর তার মশালটা গ্রাস করে ফেলল।

৬

নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছে পালসাহাব। তার হাতের মশালটা গাঢ় কুয়াশাকে ঠেলে খুব বেশি পিছু হটাতে পারছে না।

মশাল থেকে যেটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে, অন্ধকারে আন্দামানের অরণ্যে পথ চলার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। একটা বেতঝোপের মধ্যে গুঁজে সেটা নিবিয়ে ফেলল পালসাহাব।

এবার একটানা অন্ধকার, নিবিড় বনভূমি আর ঘন কুয়াশা নিরেট দেওয়াল হয়ে চারদিকে দাঁড়িয়ে গেল।

রাত্রির অন্ধকারে পালসাহাবের চোখজোড়া যেন জ্বলতে থাকে। অরণ্য ভেদ করে এগিয়ে চলেছে সে। এখন হাতে শুধু একটা বর্মী দা বাগিয়ে ধরা। কাঁটা বেত এবং ডালপালার খোঁচা লাগলেই সেগুলো কেটে কেটে পথ বানিয়ে নিচ্ছে।

বিচিত্র মানুষ পালসাহাব। রাতের এই অন্ধকার, এই কুয়াশা আর আদিম এই অরণ্যের মতই সে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়।

জঙ্গল ফুঁড়ে চলতে চলতে হঠাৎ বড় ভাল লেগে গেল পালসাহাবের। প্যাডক গাছের পাতা থেকে মাথার ওপর থোকায় থোকায় জোঁক পড়ছে, বাড়িয়া পোকা কামড়াচ্ছে সমানে, তবু ভ্রুক্ষেপ নেই। এই নিস্তব্ধ রাত্রির অরণ্য পাল-সাহাবকে যেন জাদু করেছে। মোহগ্রস্তের মতো সে হাঁটতে লাগল।

কতকাল পর উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আজ নতুন মানুষ এসেছে। পালসাহাব ভাবছে, একদিন সে-ও এসেছিল এই দ্বীপে। ঠিক এই দ্বীপে নয়, সে এসেছিল দক্ষিণ আন্দামানে।

কত বছর আগে আন্দামানে এসেছিল, আজ আর মনে করতে পারে না পালসাহাব। বিশ বছর হতে পাবে, পঁচিশ বছরও হতে পারে, আবার তার চেয়েও বেশি হতে পারে। কতকাল যে সে আন্দামানের জঙ্গলে কাটাচ্ছে তার হিসেবই বা কে রাখে। এই দ্বীপ হিসেবের জগতের বাইরে।

জমির ব্যাপারে দাঙ্গা এবং খুনের অপরাধে পঁচিশ বছরের দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে আন্দামান এসেছিল পালসাহাব। সেলুলার জেলে দু মাস বিশ দিন মেয়াদ খেটে 'আন্দামান রিলিজ' নিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজে আসে।

বিশ পঁচিশ কি তিরিশ বছর আগের অতীতের প্রায় অনেকটাই স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে পালসাহাবের। পুরনো জীবনটা তার কাছে প্রায় ঝাপসাই হয়ে গেছে। সে জন্য বিশেষ মাথাব্যথাও নেই পালসাহাবের।

শুধু মনে আছে, দেশ ছিল তার সুদূর পূর্ব বাঙলায়—ময়মনসিং জেলায়। শুধু মনে পড়ে, কোথায় যেন জাম গাছেব ছায়ায় ছায়ায় শান্ত একটি গ্রাম ছিল, মাটির দেওয়াল আর টিনের চালের একটি ছোট্ট ঘর ছিল। তকতকে করে নিকানো আঙিনায় বাতাবী গাছেব দীঘল ছায়া পড়ত। কোথা থেকে লেবু ফুলের গাঢ় গন্ধ ভেসে আসত। মাটিব দেওয়ালে সিঁদুর দিয়ে কী যেন আঁকা ছিল। সেই আঁকা ছবিটার নাম যে কী—এক এক সময় অনেক ভেবেও মনে করতে পারে না পালসাহাব। উঠোনে ভারি নরম চেহারায় কোমলমুখী এক বউ ঘুরে বেড়াত। বাতাবী গাছের ছায়ায় গোলগাল একটি অবোধ শিশু খিলখিলিয়ে হেসে উঠত।

দুপুরের রোদে ঢেউটিনের চালটা পালিশ করা রুপোর মতো জ্বলত। কোথায় যেন ঘুঘু ডাকত। ঠিক সেই সময় কে এক কৃষাণ সর্বাঙ্গে মাটি মেখে কাঁধে লাঙল ফেলে ফিরে আসত। সেই ঝকঝকে উঠোন, ঘুঘুর ডাক, বাতাবী গাছের ছায়া মোহ ধরাত মনে। কোমলমুখী বউ তখন গোলগাল নাদুস-নুদুস ছেলে কোলে নিয়ে বসেছে বাতাবী লেবুর ছায়ায়। শিশুটি তার অমৃতভরাট বুকে সান্ত্বনার উৎসে মুখ ডুবিয়েছে। দেখে দেখে চোখ আর ফিরত না। মুগ্ধ চোখে পলক পড়ত না সেই কৃষাণের।

পঁচিশ তিরিশ বছর আগের সেই জীবনটার খেই একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে পালসাহাব। টুকরো টুকরো অস্পষ্ট কতকগুলো ছবি স্বপ্নের মতো শুধু মনে পড়ে।

আচ্ছন্ন স্মৃতির গভীর থেকে মাঝে মাঝে এখনও সেই বউ, বাতাবী গাছের ছায়ায় সেই ছেলে, দুপুরের সেই খা খা রোদ, ঘুঘুর ডাক, সেই মুগ্ধ কৃষাণের ছবি ভেসে ওঠে। কোথায় কতদূরে তাদের ফেলে এসেছে, ঠিক করে উঠতে পারে না পালসাহাব। কোনদিন আদৌ তারা সত্য ছিল কিনা, কে তার হদিস দেবে?

আন্দামানে আসার পর সেই বউ আর সেই ছেলের কাছে ফিরে যাবার জন্য প্রথম প্রথম উন্মাদ হয়ে উঠত পালসাহাব। খেত না, ঘুমোত না, কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না। উপসাগরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দিনরাত কী যে ভাবত, সে-ই জানে। সাঁতরে দেশে ফেরার জন্য দু দু-বার সে বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে। দু-বারই সেলুলার জেলের পেটি অফিসার আর টিণ্ডালরা তাকে সমুদ্র থেকে তুলে এনেছে।

একদিন ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কাজে পালসাহাবকে জঙ্গলে চালান দেওয়া

হল। তারপর আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে কত বছর যে কেটে গেল, আজ আর পালসাহাব হিসেব করে বলতে পারবে না।

ইয়ার-দোস্তরা আগে আগে জিজ্ঞেস করত, 'পালসাহাব, তোমার সাজার মেয়াদ তো ফুরিয়েছে। এবার মুলুকে ফিরবে না?'

পালসাহাব মুখে কিছু বলত না। মাথা ঝাঁকিয়ে জানাত, যাবে না।

ইয়ার-দোস্তরা বলত, 'গাঁও-মুলুকে জরু-বেটা কেউ নেই?'

পালসাহাব এবারও জবাব দিত না। ঝকঝকে উঠোনে একটি কোমলমুখী বউ আর একটি অবুঝ অবোধ শিশুর ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠত শুধু। সঙ্গে সঙ্গে মনটা উদাস হয়ে যেত।

কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জ যেন জাদু করেছে পালসাহাবকে, কতকাল ধরে তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন কুহকিত হয়ে রয়েছে এর অরণ্যের মধ্যে। এর উপসাগর-উপকূল-পাহাড় এবং সমুদ্রের মধ্যে মিশে গেছে সে। অন্ধকার দ্বীপের সঙ্গে তার অস্তিত্ব একাকার হয়ে গেছে। এখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে পালসাহাব।

না, কোনদিনই এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও সে যেতে পারে নি। সেই বউ আর শিশুর টানেও না।

তাছাড়া পালসাহাব যাবেই বা কোথায়? পঁচিশ তিরিশটা বছর আন্দামানের এই দ্বীপে দ্বীপেই তার কাটল। এই দীর্ঘ সময়ে সেই বউ, সেই শিশু, সেই ঝকঝকে আঙিনার ঠিকানা পৃথিবী থেকে একেবারেই মুছে গেছে কি না, সে খবর পালসাহাব জানে না। খুনের অপরাধে জেলখাটা দ্বীপান্তরের আসামী পুরনো সমাজে ফিরে গেলে কে কেমন ভাবে নেবে, সে সম্বন্ধে ভয় আছে তার। হয়ত নিজের স্ত্রী-পুত্র থেকে শুরু করে সবাই তার গায়ে থুতু দেবে। কিন্তু এই আন্দামানে কে কার গায়ে থুতু দেয়! এখানে সবাই তো খুন বা অন্য কোন মারাত্মক অপরাধের আসামী।

এই দ্বীপের বাইরে কোথাও যেতে চায় না পালসাহাব। যাবার মতো কোন ঠিকানাও তার নেই। এখানে আসার আগে তার যে অতীত ছিল, পৃথিবীর বুকে তার যে ঠিকানা ছিল, এতদিনে সেই ঠিকানা এবং অতীত—দুই-ই খুইয়ে বসেছে পালসাহাব।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপগুলির বাইরে যে বিপুল দুর্জ্ঞেয় পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে সে সম্বন্ধে পাল সাহাবের মনে অদ্ভুত এক সংশয় আছে, সন্দেহ মেশানো বিচিত্র এক ধরনের ভয়ও আছে। মনে মনে সেই পৃথিবীটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণাও খাড়া করতে পারে না পালসাহাব। সেই জগৎটা কেমন, তার স্বরূপ কী, যখনই সে সম্বন্ধে কিছু ভাবতে বসে, থই আর মেলে না। ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। ফলে একসময় ভাবনাটা ছেড়েই দেয় সে।

না, কোনদিন এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না পালসাহাব।

আজকাল সেই কোমলমুখী বউ আর সেই গোলগাল অবোধ শিশুটির কথা ঠিকমতো মনেও পড়ে না। যদিও বা পড়ে, মনটা একটু উদাস হয় মাত্র। তাদের কোথায় কত পিছনে যে ফেলে এসেছে পালসাহাব!

এখানে আসার আগে বাঙলাতেই কথা বলত পালসাহাব। সে ভাষাটা প্রায় ভুলেই গেছে! তার বদলে আজকাল হিন্দী এবং উর্দু মেশানো বিচিত্র আন্দামানী বুলি শিখেছে।

এই দ্বীপপুঞ্জ একটু একটু করে এই পঁচিশ তিরিশ বছরে পালসাহাবকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।

সেলুলার জেল থেকে 'আন্দামান রিলিজ' পাওয়ার পর ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কুলীর কাজ নিয়ে এসেছিল সে, তারপর হয়েছে জবাবদার। শেষ পর্যন্ত 'পারমোশ' (প্রমোশন) পেয়ে হয়েছিল ফরেস্ট গার্ড।

ইদানীং কয়েক বছর ধরে পূর্ব বাঙলার উদ্বাস্তু এবং মালাবার থেকে মোপালা কৃষাণরা সেটেলমেণ্টের জন্য বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপগুলোতে আসতে শুরু করেছে। অরণ্য সংহার করে দক্ষিণ মধ্য ও উত্তর আন্দামানে, হ্যাভলক দ্বীপে উপনিবেশ বানাবার কাজ চলছে। উদ্বাস্তু উপনিবেশ, সরকারী পরিভাষায় যার নাম 'রিফুজী সেটেলমেণ্ট'। আন্দামানের অরণ্যময় বর্বর দ্বীপগুলিতে জীবনের উৎসব শুরু হয়েছে।

হঠাৎ কী খেয়াল হল পালসাহাবের, ফরেস্টের কাজ ছেড়ে সেটেলমেণ্টের কাজ ধরল। এখন সে কলোনাইজেশন অ্যাসিস্টাণ্ট। সংক্ষেপে সি. এ. পালসাহাব।

অন্ধকার আর কুয়াশা ঠেলে, বর্মী দায়ের ফলায় পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে পালসাহাব। উত্তর আন্দামানের এই অরণ্যের সব অন্ধিসন্ধি, কোথায় কোন ঝোপ, কোথায় প্যাডক গাছের জটলা, কোথায় দিদু আর পেমা গাছগুলি তাদের খাড়া খাড়া মাথা আকাশের দিকে তুলে রেখেছে—সমস্ত কিছু পালসাহাবের মুখস্থ। একরকম চোখ বুজেই সে এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে পারে।

চলতে চলতে একসময় পথ ফুরোয়। ছোট্ট একটা টিলায় এসে পড়ল পালসাহাব। চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা-তিন, এ মা-তিন—'

কোন জবাব মিলল না।

পালসাহাব বিড় বিড় করে বলল, 'শালীর সন্ধ্যে হলেই নিদ! নিদ আর নিদ। নিদ আজ ঘোচাচ্ছি!' তারপর তিন পর্দা গলা চড়াল. 'এ শালী মা-তিন, জলদি ওঠ।'

'কৌন রে?' ঘুম-জড়ানো ভাঙা ভাঙা স্বরে মা-তিন বলল।

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি রে শালী, তোর বাপ! হারামীর বাচ্চার

খালি নিদ আর নিদ। জলদি বাতি জবাল।'

ও পক্ষও চুপচাপ রইল না। হিংস্র গলায় মা-তিন বলল, 'গালি দিবি না শালে! জান তুড়ে দেব। তুই কত বড় বাপ হয়েছিস, একবার দেখব। কুত্তার বাচ্চা কাঁহাকা।'

গভীর রাত্রিতে যখন বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ কুয়াশা এবং অন্ধকারের তলায় একেবারেই ডুবে গেছে, তখন পালসাহাব আর মা-তিনের মধ্যে খানিকটা অশ্লীল অকথ্য গালিগালাজের আদান প্রদান হয়ে গেল।

একটু পরে কুয়াশা ফুঁড়ে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল। আলোটা পাল-সাহাবের দিকে এগিয়ে আসছে।

আবছা ছেঁড়া ছেঁড়া আলোতে বোঝা যায়, ছোট্ট টিলার মাথায় হাওয়াই বুটির জঙ্গল উদ্দাম হয়ে রয়েছে। ওপাশের উতরাইর দিকটা প্রকৃতির অদ্ভুত খামখেয়ালিতে ন্যাড়া। সেখানে একটা ঘাসও জন্মায় নি। ঐ ন্যাড়া উতরাইটায় পালসাহাবের ঝুপড়ি। কুয়াশায় আর অন্ধকারে ঝুপড়িটা থাবা গেড়ে বসে থাকা কোন আদিম জন্তুর মতো দেখায়।

আলোটা সামনে এসে পড়ল। দেখা গেল, লণ্ঠন জবালিয়ে মা-তিন এসে পড়েছে।

হাওয়াই বুটির জঙ্গলের এপাশে বিরাট এক খাদ। রোজই এই খাদটা পর্যন্ত এসে মা-তিনকে ডাকে পালসাহাব। অন্ধকারে খাদে নামতে ভয় হয় তার।

লণ্ঠনের আলোয় খাদের ভেতরটা দেখতে দেখতে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ওপারে চলে গেল পালসাহাব। এখনও সে বিড় বিড় করে বকে চলেছে, 'খিলাফৎ ঠিকই বলেছিল, বর্মী মাগীগুলো বহুত খারাবী।'

মা-তিন পালসাহাবের কথাগুলো ঠিক শুনে ফেলেছে। সে গর্জে উঠল, 'বর্মী মাগীগুলো বহুত খারাবী? দুশমন কাঁহাকা, এত সাল ঘর করে এখন বেইমানির কথা বলছিস!' বলতে বলতে তার চাপা কুতকুতে চোখ থেকে আগুন ঠিকরোতে লাগল। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধ বুকটা দ্রুত-তালে ওঠানামা করছে। ফোঁস ফোঁস করে গরম নিশ্বাস পড়ছে।

সেই ভয়ংকর মূর্তির দিকে তাকিয়ে পালসাহাবের মুখে কথা যোগাল না।

হাওয়াই বুটির জঙ্গল পেছনে ফেলে ঝুপড়ির সামনে এসে পড়ল দুজনে। বাঁশের ঝাঁপ খুলে প্রথমে মা-তিন ভেতরে ঢুকল। তার পেছনে পালসাহাব।

বাঁশের পাটাতনের তলায় একপাল শুয়োর ডেলা পাকিয়ে রয়েছে। মানুষের সাড়া পেয়ে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে উঠল। মাচানের তলা থেকে অনেকগুলো কুকুর আহ্লাদে কেঁউ কেঁউ করে ডাকল। কুকুর এবং শুয়োরের গা থেকে দুর্গন্ধ উঠে আসছে। জান্তব গন্ধে ঝুপড়ির বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে যেন।

শুধু কি কুকুর আর শুয়োরের গন্ধ; নাপ্পির গন্ধ, শুঁটকি মাছের গন্ধ,

আধসিদ্ধ গো-সাপের চামড়ার গন্ধ; নোংরা চটচটে বিছানা থেকে ভ্যাপসা পচা দুর্গন্ধ—সব মিলিয়ে একটা মিশ্রিত উগ্র গন্ধ এই টিলার অন্ধকার কুয়াশা এবং বাতাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় দেখা যায়, ঝুপড়ির ভেতর তিনটে বাঁশের মাচান। শোবার জন্য দুটো, খাওয়ার জন্যে একটা। খাওয়ার মাচানটা বেশ উঁচু।

বাঁশের দেওয়ালে বর্মী দা এবং সড়কি গোঁজা রয়েছে। বোঁচকা-বুচকি-গাঁটরি, ভাঙা জঙ-পড়া দু চারটে টিনের পেঁটরা ঝুপড়ির এ-কোণে ও-কোণে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে।

গজর গজর করতে করতে একটা কাঠের থালায় ভাত, নাপ্পি আর শুঁটকি মাছের সুরুয়া ঢেলে পালসাহাবের দিকে ঠেলে দিল মা-তিন। নিজেও একটা থালা টেনে নিল।

পালসাহাব বলল, 'আজ তারা এসে পড়ল।'

মা-তিন কিছুই বলল না। শুঁটকি মাছের থকথকে ঝোল দিয়ে ভাত মেখে বড় বড় ডেলা তুলতে লাগল মুখে।

ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে পালসাহাব বলল, 'এখানে কলোনি বসবে, কুঠিবাড়ি উঠবে, জঙ্গল সাফ হয়ে ক্ষেতিবাড়ি হবে।'

মা-তিন পালসাহাবের দিকে তাকায় না। তার মুখেচোখে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। নিজের মনে ঝোলমাখানো ভাতের দলা মুখে পুরতে থাকে মা-তিন।

পালসাহাব আপন খেয়ালেই বলে যায়, 'খুব ভাল হবে। এই দ্বীপে যত মানুষ আসে ততই ভাল।' বলতে বলতে মুখ তোলে। লক্ষ্য করে, তার কোন কথাই শুনছে না মা-তিন। কিছুক্ষণ মা-তিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করে পালসাহাব। তারপর নরম স্বরে ডাকে, 'এ মা-তিন, এ শালী—'

'হাঁ—'

'শালী, গোসা করেছিস ?'

ঘাড় গুঁজে নিজের থালাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে মা-তিন। চাপা গলায় ফুঁসে ওঠে, 'হারামী।'

এবার এক কাণ্ডই করে বসে পালসাহাব। কাঠের থালাটা এক পাশে ঠেলে উঠে আসে। এঁটো হাতেই মা তিনকে জাপটে ধরে তার সুরুয়া লেপটানো মুখে এক দমে গোটা বিশেক চুমু খায়।

সমানে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে মা-তিন। আঁচড়ে কামড়ে পালসাহাবকে ফালা ফালা করে ফেলতে থাকে। বলে, 'ছাড়, ছাড়।'

'না না—'

পাল সাহাব দু হাতে মা-তিনের মাংসল, নরম শরীরটা জাপটে ধরে বুকের কাছে গুটিয়ে আনে। তার জাপটানিতে মনে হয়, হাড়গুলো ভেঙে মা-তিন একটা পিণ্ড পাকিয়ে যাবে।

পাটাতনের তলা থেকে শুয়োরের পাল এবং মাচানের তলা থেকে কুকুরের পাল মা-তিন আর পাল সাহাবের কাণ্ড দেখে। দেখে দেখে শব্দ করতে পর্যন্ত ভুলে যায় তারা।

'ছাড়—ছাড়—ছাড়—' মা-তিন সমানে চিল্লায়। দাপাদাপি করে। হঠাৎ পায়ের গুঁতো লেগে মাচানের ওপর থেকে লণ্ঠনটা নিচে পড়ে নিবে যায়। মুহূর্তে বাইরের কুয়াশা আর অন্ধকার ছুটে এসে ঘরটাকে ভরে ফেলে। আর তারই মধ্যে উন্মাদের মত পাল সাহাব মা-তিনকে সোহাগ জানাতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সমস্ত কিছুই সৃষ্টিছাড়া। অনেক অনেক দূরে সভ্য ভদ্র মানুষের জগতে যে নিয়মে প্রণয়ের প্রকাশ ঘটে, এখানে সে নিয়ম খাটে না। প্রণয় এখানে হৃদয়ের সূক্ষ্ম পথ ধরে চলে না। তার প্রকাশ বন্য বর্বর এবং দেহগত।

মাচানের বিছানা থেকে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ উঠছে। বাঁশের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে সাদা ধোঁয়ার আকারে হিমাক্ত কুয়াশা ঢুকছে।

মাচানে শুয়ে শুয়ে মা-তিন আর পালসাহাবের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়।

৭

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে প্রথম রাত্রিটা পার হয়ে গেল।

কাল সন্ধ্যায় পালসাহাব ভয় ধরিয়ে গিয়েছিল সাপ জোঁক আর কান-খাজুরারা যদি মেহেরবানি করে মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে তবে আজ দেখা হবে। মানুষগুলো সত্যিই বেঁচে আছে। কিং কোব্রা আর কানখাজুরার দল তাদের কাছে ঘেঁসে নি। তাদের বাঁচিয়ে রেখে এই দ্বীপ কোন্ গূঢ় মতলব হাসিল করতে চায় কে বলবে!

এখন সকাল।

সারা রাত এই দ্বীপের ওপর স্তরে স্তরে কুয়াশা পড়েছে। সেই গাঢ় স্থাবর কুয়াশার নিচে পাহাড়-অরণ্য—সব কিছু এখনও অবলুপ্ত। অবশ্য কুয়াশা ভেদ করে সোনার তারের মতো দু চারটে রোদের রেখা এসে পড়েছে টিলার মাথায়।

মানুষগুলো ঝুপড়ির বাইরে এসে বসল।

কাল মনে হয়েছিল, এক একটা মানুষ রক্ত মাংসের জড় স্তূপ ছাড়া কিছু

নয়। তাদের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। এমন কি নিজেদের কোনরকম ইচ্ছা-অনিচ্ছা পর্যন্ত নেই। অন্যের ইচ্ছায় কি তাড়নায় তারা নড়ে চড়ে, চলে ফেরে।

কাল বিকেলেও মানুষগুলো একসঙ্গে ডেলা পাকিয়ে ছিল। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে পুরো একটা রাত কাটিয়ে কালকের সংশয় জড়তা এবং ভয় তারা খানিকটা যেন কাটিয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে, তাদের আলাদা আলাদা অস্তিত্বও আছে।

কালকের সেই মৃতমুখ বিষণ্ন মানুষগুলো চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এখন এই দ্বীপের স্বরূপটা বুঝবার চেষ্টা করছে।

বুড়ী বাসিনী বলল, 'এতবড় সমুন্দুর (সমুদ্র) পাড়ি দিলাম, পাচ-পাচটা দিন পারকূল দেখি নাই। ডরে বুকের লৌ (রক্ত) জইমা গেছিল।' একটু থামে সে। কাপড়ের একটা গিট খুলে কাঁচা তামাকপাতা বার করে মুখে পোরে। তারপর আবার বলে, 'পারকূল যহন পাইছি, মাটি যহন মিলছে, তহন আমরা বাচুম।'

ঝুপড়ির সামনে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল মানুষগুলো। স্তরে স্তরে জমা কুয়াশা ভেদ করে সকালের প্রথম রোদ এসে পড়ছে ন্যাড়া টিলাটার মাথায়।

চারদিক থেকে উঠে এসে মানুষগুলো বুড়ী বাসিনীকে ঘিরে বসল।

বাসিনী আবার বলল, 'আমরা বাচুম, নিচ্চয় বাচুম।'

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'আমরা যে বাচুম, কী কইরা বুঝলা ?'

'আমার মন কয়।'

পাটের ফেঁসোর মত এক মাথা রুক্ষ চুল। শরীরের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে। মুখের চামড়া কুঁচকে অসংখ্য আঁকিবুকি ফুটে উঠেছে। সমস্ত মুখটা জুড়ে কত যে দাগ, তার লেখাজোখা নেই। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। গলায় এক লহর তুলসীর মালা। চোখে মাছের আঁশের মতো পুরু ছানি। এই হল বুড়ী বাসিনী। সে মুখ তুলল। ছানিভরা চোখের বিবর্ণ ঘোলাটে দৃষ্টি কুয়াশার স্তরের ওপারে পাঠিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'এততেও যহন মরি নাই, ভগমান তার সাধখান মিটাইয়া মারতে পারে নাই, তহন বাচুম, নিচ্চয় বাচুম। তরা দেখিস—'

তার গলায় জীবন সম্পর্কে অটুট বিশ্বাসের সুর ফোটে। কুয়াশার স্তরের ওপারে কোন্ দুর্জ্ঞেয় জগৎ থেকে সে এই বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে কে বলবে।

নিত্য ঢালী দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে এক ধারে বসে ছিল। এবার সে মাথা তোলে। নিরাশ বিমর্ষ গলায় বলে, 'না, কোন আশাই নাই।' বলতে বলতে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকায়।

বুড়ী বাসিনী বলল, 'কিয়ের আশা নাই ?'

'পরানে বাচনের।' টেনে টেনে শ্বাস নেয় নিত্য ঢালী। শূন্য দৃষ্টিতে

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বলে, 'কুনখানে সাত পুরুষের ভিটামাটি পইড়া রইল; আর হগল খুয়াইয়া কুনখানে মরতে আইলাম। না না খুড়ী (কাকী), মিছাই তুমি আশার কথা শুনাও, বাচার কথা শুনাও।' নিত্য ঢালী একেবারেই ভেঙে পড়েছে। তার মনে বাঁচার সামান্য আকাঙ্ক্ষাটা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

রসিক শীলও সায় দেয়, 'পাচদিন কালাপানি পাড়ি দিয়া আন্ধারমান (আন্দামান) আইছি। কপালের লিখন কি খণ্ডান যায় খুড়ী! ভগমানের ইচ্ছা, এই দীপেই (দ্বীপেই) আমরা মরি।'

বুড়ী বাসিনী সস্নেহে বলে, 'মইরা তো আছিই রসিক, তাই বইলা বাচার শ্যাষ চ্যাণ্টাখান করুম না? পরানটা বাচানের লেইগা (জন্য) কি না করেছি আমরা? পিছের দিনগুলার কথা একবার ভাইবা দ্যাখ দেহি! কথায় কয় যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

রসিক শীল কিছু বলে না। ডাইনে-বায়ে খালি মাথা ঝাঁকায়। মাথার ঝাঁকানিতে কী যে সে বোঝাতে চায় সঠিক বোঝা যায় না।

বাসিনী আবার বলে, 'তরা পুরুষ মানুষ; এমুন কইরা ভাইঙ্গা পড়িস না।

রসিক শীল বলল, 'ভাইঙ্গা কি সাধে পড়ি খুড়ী! কাইল বিকালে জাহাজ থনে এই দীপে নামছি। কুনখানে নামছি, জঙ্গলের ভিতর দিয়া ভিতর দিয়া পালসাহাবের পিছে পিছে কুনখানে আইসা পড়ছি, ভাইবা ভাইবা কূল পাই না। মানুষ নাই, জন নাই, আত্মবান্ধব নাই। যেদিকে চোখ মেলবা, খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। দেইখা মনে লয়, কুনো কালে এই দ্বীপে মানুষ আহে নাই।' দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'জঙ্গলের দিকে একবার চাইয়া দেখছ খুড়ী, বুকখান থর থরাইয়া কাপে। জঙ্গল দেখলে বাচনের সাধখান আর থাকে না। হা ভগমান, কালাপানি পাড়ি দিয়া এই কুনখানে আনলা? কপালে কী যে লেখছ, তুমিই জানো!'

চারপাশের মানুষগুলো নির্জীব স্বরে বলে, 'ঠিক কথা।'

বুড়ী বাসিনীর ঘোলা ঘোলা বিবর্ণ চোখ দুটো হঠাৎ ঝকঝকিয়ে ওঠে। সে ক্ষেপে ওঠে, 'মুখে খালি মরণের কথা! ক্যান—বাচনের কথা কইতে পারস না? তরা জীয়ন্ত মানুষ, না কতগুলান মড়া?'

অতি দুঃখে হাসে মানুষগুলো।

রসিক শীল বলে, 'খুড়ী, এককালে মানুষ আছিলাম ঠিকই—যহন দ্যাশ আছিল, ঘর আছিল, চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি আছিল। কিন্তুক এই জীবনটার উপর দিয়া কয়টা বছর যা গেল, হেইতে আর আমরা মানুষ নাই।'

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না। বাসিনীকে ঘিরে ঝিম মেরে বসে থাকে।

হঠাৎ কে যেন বলে ওঠে, 'পালসাহাব কাইল রাইতে কইয়া গেছিল আইজ

রাইত পুয়াইলে আইব। কই অহনও তো আইল (এল) না!'

মানুষগুলো চকিত হয়ে উঠল, 'ঠিকই তো।'

'তবে কি পালসাহাব আর আইব না!'

রসিক শীল বলল, 'এই নিঃঝুম জঙ্গলে আমাগো (আমাদের) দ্বীপান্তরি দিয়াই বুঝি গেল পালসাহাব। এইখানেই আমরা মরুম।'

রসিক শীলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো ডেলা পাকিয়ে গেল। বউ-বাচ্চা-ছেলে-মেয়ে-বুড়ো—যারা ঝুপড়ির ভেতর ছিল, ছুটে এসে মানুষের পিণ্ডটার মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেল। তারপরেই কান্নার রোল উঠল। এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অন্তরাত্মাকে চমকে দিয়ে নতুন আগন্তুকেরা ভয়ে আতঙ্কে কাঁদছে। বুঝি বা এই ভীষণ অরণ্যে মৃত্যুর স্বরূপটা কিছু বুঝে, বাকিটা না বুঝে জীবনের জন্য শেষবারের মতো তারা কেঁদে নিচ্ছে।

পরস্পরের গলা জড়িয়ে মানুষগুলো ডুকরে ডুকরে ডাক ছেড়ে জীবনের অন্তিম কান্না কাঁদছে। এমন যে বুড়ী বাসিনী, বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের এই গভীর অরণ্যে যে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়, হঠাৎ ভয় পেয়ে সে-ও কাঁদতে শুরু করেছে।

সবাই কাঁদে, কিন্তু একজন কাঁদে না। সে কাপাসী। অনেক দূরে বসে কান পেতে এতগুলি মানুষের কান্নার বিচিত্র ধ্বনি শুনতে থাকে। শুনতে শুনতে আপন মনেই হাসে। আশ্চর্য! সে হাসিতে শব্দ নেই।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় কান্নার উদ্যম ফুরিয়ে গেল। জড়াজড়ি করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মানুষগুলো।

ন্যাড়া টিলাটার মাথায় সারি সারি মুখ দেখা যায়। শঙ্কিত, ভয়াতুর, পাংশুর কতকগুলি মুখ।

এদিকে কুয়াশার স্তরগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। রোদের তেজ বাড়ছে। প্রথমে কুয়াশা ফুঁড়ে সোনার তারের মতো রোদ আসছিল। এখন ঢল নেমেছে। ঝলমলে সোনালী রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

টিলাটার চারপাশে জটিল অরণ্য। সেদিকে তাকালে বুকের ভিতর কাঁপুনি ধরে। অদ্ভুত এক ভয়ে স্নায়ুগুলো আড়ষ্ট হয়ে যায়।

একসময় দেখা গেল সামনের জঙ্গল ফুঁড়ে একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে আসছে।

ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে চেয়েই থাকে মানুষগুলো।

চড়াই বেয়ে লোকটা যখন প্রায় টিলার মাথায় এসে উঠেছে, তখন ঘোলা ঘোলা চোখের উপর একটা হাত রেখে বুড়ী বাসিনী বিড় বিড় করে বলে, 'আমাগো (আমাদের) হারাইন্যা, না!' তার স্বরে বিস্ময়।

মানুষগুলো এবার নড়েচড়ে বসে। তাদের চোখেমুখে কৌতূহল ফুটেছে। সকলে প্রায় একই সংগে গলা মেলায়, 'হারাইনা'।

ততক্ষণে হারাণ ওপরে উঠে এসেছে। বুড়ী বাসিনীর পাশে বসে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল সে। এই সকাল বেলায় যখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে চারিদিকে তখন তার কপালে কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

বছর পঁচিশেক বয়স। কালো পাথরে খোদাই চেহারা, ছোট ছোট চাপা চোখের ওপর ভুরু দুটো টান টান হয়ে রয়েছে। খাড়া চোয়াল, ঈষৎ থ্যাবড়া নাক, লম্বা লম্বা কিছু চুল এলোমেলো হয়ে কপালের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। দাড়ির রোঁয়াগুলো শক্ত এবং ধারাল। এই হল হারাণ।

কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে চামড়া ছিঁড়েছে হারাণের, কাঁধের ওপর থেকে খানিকটা মাংস উঠে গেছে। তার সারা গা বেয়ে তাজা গাঢ় রক্ত ঝরছে। কিন্তু কোন খেয়াল নেই তার, ভ্রূক্ষেপ নেই। সবাইকে একবার দেখে নিয়ে দু পাটি সাদা ঝকঝকে দাঁত মেলে হাসল হারাণ।

বুড়ী বাসিনী বলল, 'বিহানে (সকালে) উইঠা কুনখানে গেছিলি, হারাইনা?'

হারাণ বলল, 'জাগাখান (জায়গাটা) ঘুইরা ঘাইরা এট্টু দেইখা আইলাম ঠাকুরমা।'

'একা একা জংগলে গেলি ডর ধরল না?'

সবগুলি দাঁত মেলে হি-হি করে হাসল হারাণ। কিছু বলল না।

বাসিনী বলল, 'হাসস যে?'

'হাসনের কথায় হাসুম না! তুমি তো জানো ঠাকুরমা, কুনো কিছুতে আমার ডর নাই।' আঙুল দিয়ে নিজের নিরেট কঠিন চওড়া ঢালের মতো বুকটা দেখিয়ে হারাণ বলে, 'দ্যাখ, দ্যাখ ঠাকুরমা—এই বুকখানের ভিতর এতটুকু ডর নাই।' বলেই হেসে ওঠে হারাণ।

রসিক শীল একটু দূরে বসে ছিল। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে হারাণের পাশের জায়গাটা দখল করে বসল। বলল, 'পুরা জাগাখান দেখছস হারাইণা?'

'হ।'

'কেমুন দেখলি?' আগ্রহে রসিকের চোখজোড়া চক চক করে।

'বড় বাহারের জাগা তালই (তালুই)। এই পাহাড়টার পিছে একখান খাল আছে, খালে যা মাছ দেখলাম তালই'—কথাটা পুরা না করেই তালুতে জিভ ঠেকিয়ে লোভাতুর একটা শব্দ করে হারাণ। তারপর শুরু করল, 'সারা জন্ম হেই মাছ খাইয়া ফুরাইতে পারবা না।'

'ক'স (বলিস) কি!'

'সাচা কথাই কই।'

'আর কী দেখলি ?'

'আর কী দেখলাম, তুমিই কও দেহি তালই ?'

'কী দেখলি, আমি ক্যামনে জানমু ?'

হারাণ মিটি মিটি হাসে। বলে, 'চাষী কিষাণের পোলা (ছেলে) দেখমু আর কী ? দেখলাম মাটি। এক দলা মাটি হাতে নিয়া চাপ দিলাম। ঝুরঝুরাইয়া গুড়া হইয়া গেল। এই মাটিতে সোনা ফলব।

'সাচ্চা ?'

'সাচা গো তালই।' হাতের তালুটা চিত করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয় হারাণ। বলে, 'দেখ—'

হারাণের হাতে এক ডেলা ভিজে নরম মাটি। ডেলাটা নিজের হাতে নিয়ে অল্প অল্প চাপ দেয় রসিক শীল। ভেঙে সেটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। এ মাটি মিহি মসৃণ মোলায়েম। এ মাটি আঠা আঠা, সরস।

রসিক শীল বলল, 'বড় বাহারের মাটি। ঠিকই কইছস হারাইণা, এই মাটিতে সোনা ফলব।'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'পিরথিমীতে (পৃথিবীতে) মাটির মত খাটি বস্তু আর নাই রে। হেই মাটি একবার হারাইছি। মাটি হারাইয়া কয়ডা বছর কত দুঃখুই না পাইলাম।'

বাসিনীর বুক ভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ধীরে ধীরে সে বলে, 'এই আন্ধাবমান (আন্দামান) দ্বীপে আইয়া আবার মাটি মিলল আমরা মরুম না রে, বাচুম। নিচ্চয় বাচুম।'

চারপাশে মানুষগুলো চুপচাপ বসে রয়েছে। বুড়ী বাসিনী নতুন করে তাদের বাঁচার স্বপ্ন দেখায়, 'এই মাটিই আমাগো (আমাদের) বাচাইব।'

মৃতমুখ বিষণ্ণ মানুষগুলোর চোখ চক চক করে। অনুচ্চ ফিস ফিস গলায় তারা বলে, 'বাচুম, আমরা বাচুম।

বাঁচবার নেশায় মানুষগুলো এখন বুঁদ হয়ে বসে থাকে।

একটু দূরে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে রয়েছে কাপাসী। হাঁটুর ওপর মাথাটা হেলিয়ে পলকহীন তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি স্থির এবং শূন্য। চোখের পাতা পড়ছে না। মেঘের মতো ঘন কালো চুল ভেঙে মুখের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ করে উত্তর আন্দামানের এই টিলাটিকে চমকে দিয়ে শব্দ করে হেসে উঠল কাপাসী। হাসির দমকে সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে।

কাপাসীর হাসি ক্রমশ মেতে উঠতে লাগল।

কাপাসী হাসে আর বলে, 'বাচার সাধ কত শয়তানগো! কেউ বাচব না; সগলে (সকলে) মরব। মর, মর তরা।'

পূব দিকের জংগল ভেদ করে সাংগোপাংগ নিয়ে একসময় পালসাহাব এসে পড়ল।

বেলা অনেক চড়েছে। সূর্যটা আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। দ্বীপের নোনা মাটি তেতে উঠতে শুরু করেছে।

এক ঝাঁক বুনো টিয়া সামনের জংগল টপকে কোন দিকে যে উড়ে গেল, কে তার হদিস দেবে।

প্রথমে টিলার মাথায় উঠল পালসাহাব। তার পিছু পিছু উঠল সরকারী চেইনম্যান নিবারণ সাপুই, পাটোয়ারী আতমন সিং এবং চার জন আদিবাসী রাঁচী কুলী—ধানোয়ার, কচ্ছপ, ভুণ্ডভুণ্ড আর টিরকি।

টিলার মাথায় উঠেই পালসাহাব কিছুক্ষণ খ্যা খ্যা করে হাসল। তারপর আচমকা হাসিটা থামিয়ে বলল, 'বহুত তাজ্জবকি বাত!'

পাশ থেকে চেইনম্যান নিবারণ সাপুই বলল, 'কিসের তাজ্জব পালসাহাব?'

পালসাহাব নিবারণের প্রশ্নের জবাব দিল না। রসিক শীলেরা তখনও টিলার মাথায় বসে ছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচাল, 'শালে লোগ এখনও বেঁচে আছিস!'

হারান বলল, 'হ পালসাহাব, অখনও মরি নাই।'

পালসাহাব বলল, 'সাপ কানখাজুরা আর জোঁক যখন তোদের সাবাড় করতে পারে নি, তখন মালুম হচ্ছে বাঁচবি। জানের জোর আছে তোদের।'

হারান বলল, 'ঠিকই কইছেন পালসাহাব, আমাগো (আমাদের) জানের জোর আছে। তা না অইলে এত কষ্ট সইয়াও তো মরে নাই। বুকের ভিতর বাচনের সাধটা অহনও তাজা আছে।'

পালসাহাব বলল, 'বহুত আচ্ছা।'

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলল না।

তেজী রোদে জঙ্গলের মাথা জ্বলছে। নীল আকাশ জ্বলছে। কোথা থেকে যেন দু-চার টুকরো মৌসুমী মেঘ বাতাসের তাড়া খেয়ে ভাসতে ভাসতে উত্তর আন্দামনের এই আকাশে এসে জমা হয়েছিল। মেঘের টুকরোগুলো জ্বলছে।

অন্যমনস্কের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে পালসাহাব কী ভাবছিল, সে-ই

জানে। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে অদ্ভুত গাঢ় গলায় বলল, 'পারবি—এই শালো লোগ?'

'কী পারুম পালসাহাব?' অবাক হয়ে পালসাহাবের মুখের দিকে তাকায় মানুষগুলো।

'আন্দামানের এই জঙ্গল সাফ করে গাঁও বসাতে, ক্ষেতবাড়ি বানাতে, কুঠিবাড়ি তুলতে? পারবি?' বলতে বলতে ফের অন্যমনস্ক হয়ে যায় পালসাহাব। অরণ্যের মাথায় উত্তর আন্দামানের সীমাহীন নীলাকাশ। তার ওপারে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলল সে। এই মুহূর্তে কোথায় যেন সে একটা সুন্দর ছবি দেখছে। সেই ছবিটার কথাই বিড় বিড় করে বলতে লাগল, 'মাটির ঘর থাকবে, দেওয়ালে দেওয়ালে ঘি আর সিন্দুর দিয়ে আঁকবি। কী আঁকবি?—এই শালেরা?' বলতে বলতে পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল। কিছুতেই সে মনে করতে পারছে না, মাটির দেওয়ালে ঘি আর সিঁদুর দিয়ে কী আঁকতে হবে। ঘি আর সিঁদুরের সেই চিত্রটির যে কী নাম, একেবারেই ভুলে গেছে সে।

পালসাহাব আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বল না কী আঁকবি?'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'বসুধারার কথা ক'ন (বলেন) নিকি সাহেব বাবা?'

'হাঁ—হাঁ, ঠিক বাত। বসুধারা—বসুধারাই আঁকবি। কত সাল বাদ বসুধারার নাম শুনলাম।' আবার তন্ময় হয়ে গেল পালসাহাব, 'একটা আঙনা (উঠোন) থাকবে, বাতাবী লেবুর গাছ থাকবে, ঘুঘু ডাকবে, একটা লেড়কা, একটা বহু—তার হাতে কাঙনা, পায়ে মল—' গলাটা ভারী হয়ে আসতে লাগল পালসাহাবের। সুদূর আকাশের ওপারে একটি অপরূপ ছবি দেখতে দেখতে নিমেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সে। কতকাল আগে বসুধারা আঁকা একটি মাটির ঘর, ঝকঝকে তকতকে উঠোন, বাতাবী ফুলের গন্ধ, ঘুঘুর ডাক, একটি নাদুস নুদুস ছেলে আর মল বাজানো কোমলমুখী একটি বউ—সব মিলিয়ে স্বপ্নের মতো সুন্দর একটি ছবি ছিল। ছবিটা এক মুগ্ধ কৃষাণের চোখ জুড়িয়ে দিত।

সেই ছবিটা কোথায় যেন হারিয়ে এসেছে পালসাহাব। আশ্চর্য, তার কথাই সে এখন বলছে, 'বহুটার পায়ে মল বাজবে, আঙনায় ধান মলবি, খড়ের পালা সাজিয়ে রাখবি। বহুকে রুপার বিছাহার বানিয়ে দিবি—'

আচমকা তীব্র তীক্ষ্ণ অবুঝ হাসির শব্দ উঠল। হাসিটা ক্রমশ মেতে উঠতে লাগল। কাপাসী হাসছে। অন্ধ উন্মাদ হাসির দাপটে তার সারা দেহ বেঁকেচুরে দুমড়ে যাচ্ছে।

কত কাল আগের একটা সুন্দর স্বপ্ন চোখের সামনে ভাসছিল। মুহূর্তে সেটা ছিঁড়ে গেল আর সেই ছবিটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পালসাহাব। তারপর হঠাৎই ক্ষেপে উঠল সে, 'কৌন—কৌন হাসতা? কে হাসছে?'

পাশ থেকে হারান বলল, 'কাপাসী হাসে সাহাব বাবা।'

'কাল যে জেনানা হেসেছিল—সে?'

'হু, সাহাব বাবা।'

'এমন হাসে কেন?'

'অর পরানে বড় দুঃখু; তাই হাসে।'

কাল যে কথাটা বলেছিল, আজও তা-ই বলল পালসাহাব, 'বহুত তাজ্জবের আওরত! দুখ থাকলে আদমীরা কাঁদে। এ শালী হাসে।' বলতে বলতে কাপাসীর সামনে এসে দাঁড়াল পালসাহাব। ডাকল, 'এ লেড়কী—'

কাপাসী জবাব দিল না, ফিরেও দেখলে না, সমানে হাসতেই লাগল।

পালসাহাব এবার খেঁকিয়ে উঠল, 'হাসো মাত্। এখানে হাসি চলবে না। এ লেড়কী—'

অবুঝ অস্বাভাবিক বিচিত্র হাসি। কাপাসীর সে হাসি থামে না। পালসাহাবের ধমক অগ্রাহ্য করে মাততেই থাকে।

পালসাহাব বলল, 'লেড়কী পাগলী নাকি?'

দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে ছিল নিত্য ঢালী। এবার সে মুখ তুলল। ভাঙা ভাঙা ধরা গলায় বলল, 'হগলই অদিষ্ট সাহাব বাবা। আমার কপাল।' বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে।

পালসাহাব চেঁচাল, 'কাঁদ মাত্ শালে। তুম কৌন?'

'আমি নিত্য ঢালী—কাপাসীর বাপ।' বলে একটু থামে নিত্য—তার বুকের গভীর থেকে অনেকগুলো স্তর ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আস্তে আস্তে সে বলে, 'সুখে কী আর কান্দি বাবা, চোখের জল ফালাইতে কার সাধ হয়! বড় দুঃখু বাবা, এই দুঃখু কুনোকালে ঘুচবে না।' নিজের কপালটা দেখিয়ে নিত্য বলতে থাকে, 'এই যে কপাল সাহাব বাবা, এই কপালই কান্দায়। কপালের লিখা কি খণ্ডান যায়!' বলে আর কাঁদে নিত্য ঢালী। কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে ওঠে। ঘোলাটে চোখের তারা দুটো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় নোনা জল ঝরতে থাকে।

গলার স্বরটা এবার নরম শোনায় পাল সাহাবের, 'কী হয়েছে?'

'কাপাসী পাগল অইয়া গেছে। হগলই আমার দোষে, আমার পাপে।' দুই হাঁটুর ফাঁকে আবার মাথা গোঁজে নিত্য ঢালী। অদম্য কোন যন্ত্রণায় তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

পালসাহাব বলে, 'লেড়কী পাগল হল কেন?'

নিত্য বলল, 'আইজ না বাবা, আর একদিন কমু। হে কথা কইতে গেলে বুক আমার ভাইঙ্গা যায়। বাপ না আমি শত্তুর, রাইক্ষস—'

পালসাহাব কী বুঝল সে-ই জানে, একেবারে চুপ করে গেল।

বেলা বেড়ে বেড়ে দুপুর হয়ে গেল একসময়। সূর্যটা এখন খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে।

হঠাৎ যেন হুঁশ ফেরে পালসাহাবের। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে সে, 'শালেরা খানা খাবি না?'

মানুষগুলো নড়ে চড়ে উঠল।

পালসাহাব চিল্লাতে লাগল, 'তোরা মানুষ না, দুসরা কিছু? কাল রাত্তিরে গিলেছিস, এখন দুফর। তোদের খিদের হুঁশও থাকে না। উল্লু বুদ্ধু নালায়েক কাঁহাকা! খাওয়ার কথাও বলে দিতে হবে!' বলতে বলতে সে ঘুরে দাঁড়াল। পাটোয়ারী, চেইনম্যানদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জলদি খানা লাও, জোর কদমে যাও—'

চেইনম্যান পাটোয়ারী আর আদিবাসী রাঁচী কুলীরা টিলা থেকে নেমে দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকল। খানিকটা পর মস্ত মস্ত লোহার বালতি বোঝাই করে ভাত ডাল এবং কচুঘেঁচু আলু কুমড়োর ঘ্যাঁট নিয়ে ফিরল।

সঙ্গে সঙ্গে পালসাহাব টিলার মাথায় মানুষগুলোকে কাতার দিয়ে বসিয়ে দিল।

একসময় খাওয়ার পালা চুকল। সূর্যটা পশ্চিম দিকে আরো খানিকটা হেলে পড়েছে তখন।

এতক্ষণ দু-চার টুকরো মৌসুমী মেঘ অনেক দূরে দূরে আকাশের এ মাথায় ও মাথায় আটকে ছিল। হঠাৎ সমুদ্র ফুঁড়ে উন্মাদ বাতাস উঠে এল। সেই বাতাস দিগন্তের ওপার থেকে সাদা সাদা মেঘের টুকরোগুলোকে উত্তর আন্দামানের মাথার ওপর টেনে আনতে শুরু করেছে।

পালসাহাব বলল, 'মরদানারা (পুরুষেরা) আমার সাথ সাথ চল্।'

হারান বলল, 'কুনখানে যামু পাল সাহাব?'

'জমিন লিবি না?' পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'শালে, একটু আগে বলছিলি না, বাঁচতে চাস! জমিন না পেলে বাঁচবি কেমন করে? চল্—'

পুরুষ মানুষগুলো উঠে পড়ল।

সকলের আগে আগে চলল সি. এ. পালসাহাব। মাঝখানে মানুষগুলো। একেবারে পিছনে পাটোয়ারী চেইনম্যান এবং চারজন কুলী।

একটু পর টিলার মাথা থেকে নেমে সকলে জঙ্গলে ঢুকল।

উত্তর আন্দামানের এই অরণ্য—জটিল, দুর্জ্ঞেয়, ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীর আলো সেই অরণ্য ফুঁড়ে ভেতরে ঢোকার ফাঁক খুঁজে পায়না। সরীসৃপের চোখে জ্বলন্ত ফসফরাস ছাড়া এখানে কোন আলো নেই। অরণ্যের মধ্যে এক ধরনের বিচিত্র নীলাভ ছায়া। সেই ছায়াময় অন্ধকারে পেঁচার চোখ ধকধক করে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুটো চড়াই, দুটো উতরাই এবং ছোট একটা উপত্যকা

পার হয়ে একটা মালভূমি পাওয়া গেল। দুদিকে দুটো খাড়া পাহাড়, মাঝখানে বিরাট অংশ জুড়ে মালভূমি। জায়গাটা মোটামুটি সমতল।

এখানে জংগল নেই। হাজার বছরের বনভূমি নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। প্যাডক দিদু চুগলুম টর্মাপিণ্ড—বিরাট বিরাট সব বনস্পতি আকাশের সীমাহীনতার দিকে কত কাল মাথা তুলেছিল। মোটা মোটা মুথিয়া লতা বেতের লতা আর থুমিয়া লতা গাছগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে অরণ্যকে ঘন করে তুলেছিল।

হারাণরা আসার আগে পেট্রোল ছড়িয়ে ছড়িয়ে জংগলে আগুন ধরানো হয়েছে। ডালপালা এবং ছাল পুড়ে পুড়ে গাছগুলি কবন্ধের মতো সারি সারি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর এসেছে করাত। করাতের ধারাল দাঁতে দাঁতে বিরাট বিরাট বনস্পতি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে।

গাছ পুড়েছে, লতা পুড়েছে, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটির ঝোপ পুড়েছে। চারদিকে রাশি রাশি পোড়া অংগার স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। ছাই উড়ছে এখন। ঘাসবন পুড়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। মালভূমি জুড়ে এখন যেন একটা অন্তহীন মহাশ্মশান।

মানুষ আসবে। উপনিবেশ গড়বে। আগুনের মুখে, করাতের মুখে, শাণিত কুড়ালের মুখে জঙ্গল তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হাজার হাজার বছর ধরে এই দ্বীপের ওপর অরণ্য তার দাবী এবং দখল প্রতিষ্ঠা করে ছিল। মানুষের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের কাছে চিরদিনের জন্য সে তার দখল হারাল। জংগলের তলা থেকে মুখ তুলল কুমারী মাটি।

পালসাহাব বলল, 'এই তোদের জমিন—'

মালভূমির এক কিনারে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে দু পাশের পাহাড়, মাঝখানের মালভূমি এবং মাটির নমুনা দেখছিল।

পালসাহাব সস্নেহে বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ—ভাল করে দ্যাখ। জমিন পসন্দ তো ?

বুড়ো রসিক শীল এক ডেলা মাটি হাতের চাপে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পরখ করছিল। লোভে খুশিতে তার ঘষা ঘষা বিবর্ণ চোখজোড়া চক চক করে উঠল। সে বলল, 'বড় বাহারের মাটি সাহাব বাবা। জমিন আমাগো (আমাদের) পছন্দ অইছে।'

পালসাহাব এবার আর কিছু বলল না। মালভূমিতে নেমে গেল। তার পিছু পিছু নামল পাটোয়ারী, চেইনম্যান এবং কুলীরা।

নিচে এসে খাকি প্যান্টের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করল পালসাহাব। হাঁকল, 'ভীমরাজ জয়ধর—'

'এই যে সাহাব বাবা—' মাঝ বয়সী একটা লোক জমিতে নামল।

পালসাহাব বলল, 'তিন একর জমি তুই পাবি। জমি বুঝে নে। মাপ দেখে নে।' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে বলল, 'পাটোয়ারী, চেইনম্যান, তিন একর জমিন মাপ।'

চেইনম্যান লোহার ফিতে দিয়ে জমি মাপতে লাগল।

এতক্ষণ চোখে পড়ে নি। এবার দেখা গেল একটা হাওয়াই বুটির ঝোপের পাশে হাত তিনেক করে লম্বা, সমান মাপের অগুনতি বাঁশের টুকরো স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। চেইনম্যান যেমন যেমন জমি মাপছে তেমনি রাঁচী কুলীরা বাঁশের টুকরো পুঁতে পুঁতে জমির সীমানা ঠিক করে দিল। আর পাটোয়ারী একটা মোটা খেরো খাতায় জমির হিসাব টুকে রাখতে লাগল।

পালসাহাব হেঁকে যেতে লাগল, 'রসিক শীল, হারান দাস, মনোহর ভক্ত, বিপদভঞ্জন বিশ্বাস—'

একে একে সবাই নিজের নিজের জমি বুঝে নিতে লাগল।

জমি মাপামাপির ফাঁকে কখন যেন সূর্যটা পশ্চিম আকাশে অনেকখানি নেমে গেছে। অরণ্যের মাথায় তখন দিনের আলো ম্লান বিষণ্ণ হয়ে আটকে রয়েছে। রোদের তেজ আর নেই। ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস জঙ্গলের মধ্য থেকে উঠে আসতে শুরু করল।

পালসাহাব এবার ডাকল, 'হরিপদ বারুই—'

কেউ জবাব দিল না।

পালসাহাব গলা চড়াল, 'কোন হো হরিপদ বারুই ? নালায়েক হারামী বুধ্ধু কাঁহাকা!'

এবারও কেউ জবাব দিল না।

টেনে টেনে বিরক্ত গলায় চিল্লাতে থাকে পালসাহাব, 'হরিপদ কুত্তা—'

পেছনের জঙ্গলটা ফুঁড়ে হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে বিশ বাইশ বছরের একটি যুবতী মেয়ে পালসাহাবের সামনে এসে দাঁড়াল। তার গায়ের রঙ মাজা কালো; উজ্জ্বল মসৃণ দেহ। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলো উড়ু উড়ু। সিঁথিতে গুঁড়ো গুঁড়ো শুকনো বাসী সিঁদুরের দাগ। পাতলা নাকে লাল পাথরের নাকছাবি। চোখের মণি দুটি ঈষৎ কটা। বাঁ গালে একটা কাটা দাগ মেয়েটিকে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। তার দীর্ঘ দেহে উদ্দাম স্বাস্থ্য। সেই স্বাস্থ্যে কেমন এক ধরনের বন্যতা মিশে আছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অনেকটা চড়াই উতরাই ভেঙে দৌড়ে এসেছে মেয়েটা। ফলে পরিশ্রমে আর ক্লান্তিতে এখনও সমানে হাঁফাচ্ছে। বুকটা দ্রুত তালে উঠছে, নামছে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তার।

মেয়েটা যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হুঁশ নেই পালসাহাবের। সে সমানে চিৎকার করছে, 'এ হারামী, এ হরিপদ কুত্তা—'

বিড়ালীর মত কটা চোখ দুটো কুঁচকে মেয়েটি ফুঁসে উঠল, 'এ্যাই ড্যাকরা, যমের অরুচি—'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'তুই কোন ? এ ঔরত—'

'আমি তিলি।'

'এই জংগলে কী করতে এসেছিস্ ?'

তিলি বলল, 'রূপ দেখাইতে রে যমের অরুচি পালসাহাব ; রূপ দেখাইতে আইছি।'

হঠাৎ পালসাহাব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তামাশা মাত কর তিলি। এখন কাজের সময়।'

'এই দ্বীপে জনমনিষ্য নাই, জংগল দেখলে ডরে বুক কাপে। হেই জংগল ভাইংগা এখানে আমি তামাশা মারতে আইছি! তামাশা মারনের মানুষ পাইলাম না আর!' তাচ্ছিল্যে মুখ বাঁকায় তিলি।

এবার তিলির দিকে তাকায় পালসাহাব। দেহের সবটুকু জোর গলায় ঢেলে চিল্লায়, 'এ হরিপদ—হরিপদ কুত্তা—'

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল তিলি। ক্ষেপলে তার নাকের ডগাটা তির তির করে কাঁপতে থাকে। সে চিৎকার করে উঠল 'তুই কুত্তা, তর বাপ কুত্তা, তর চৌদ্দ গুষ্টি কুত্তা—'

পালসাহাব বিমূঢ় হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে সে বলে, 'আজীব লেড়কী!' তারপর আস্তে আস্তে গলার স্বরটা চড়াল, 'গালি দিচ্ছিস কেন?'

'তুই ক্যান গালি দিতে আছস আমার সোয়ামীরে?'

'আমি কখন তোর সোয়ামীকে গালি দিলাম?'

'গালি দ্যাস, আর টের পাস না ড্যাকরা?'

'নাম কী তোর সোয়ামীর?'

'ড্যাকরা পালসাহাব, সোয়ামীর নাম জিগাইস (জিজ্ঞাসা করিস)! সরম লাগে না! মাইয়া মাইনষে সোয়ামীর নাম মুখে আনে?'

তিলির পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হারান। সে বলল, 'অর সোয়ামীর নাম হরিপদ বারুই।'

পালসাহাব চেঁচাল, 'হরিপদ কোথায়?'

তিলি বলল, 'ক্যাম্পে। তার হাপির (হাঁফানির) টান উঠছে, হেইর লইগা আমি আইলাম।'

'তুই এসেছিস কী করতে?'

কটা চোখ দুটো কুঁচকে কিছুক্ষণ ভয়ানক ভাবে তাকিয়ে রইল তিলি। চোখের পাতা নড়ছে না। একটা কথাও বলছে না সে। শুধু রাগে গর গর করছে। নাকের মধ্যে ফোঁস্ ফোঁস্ করে কেমন এক ধরনের জান্তব আওয়াজ করছে আর সমানে ফুঁসছে। ফোঁসানির তালে তালে অস্বাভাবিক পুষ্ট বুক দুটো উঠছে, নামছে।

তিলির ভয়ংকর মূর্তির দিকে তাকিয়ে এমন যে পালসাহাব, সে-ও দু পা পিছু হটল। বিড় বিড় করে বকতে লাগল, 'শালী, আওরত না দুসরা কুছ!'

পালসাহাবের গলা তিলির কান পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না, সে-ই জানে।

তিলি এবার বলতে লাগল, 'বুকে দরদ, পিঠে দরদ, বুড়া মানুষ হাপির (হাঁফানির) টানে কাহিল হইয়া রইছে। আর ড্যাকরা পালসাহাব জিগায় (জিজ্ঞাসা করে) কি না, আমি আইছি ক্যান? ক্যান আবার, জমিনের ভাগ নিতে। আমার ভাগের জমিন নিমু না রে পোড়ার মুখ?'

'জমিন লিবি? লে না শালী। তোর ভাগের জমিন আমি দেব না, আমার বাপ দেবে। বাপ রে বাপ রে বাপ। আওরত না দুসরা কুছ।'—বলে পেছন দিকে ঘুরে পালসাহাব চেঁচাল, 'এ পাটোয়ারী, এ চেইনম্যান, জমিন মাপ। শালীর জমিন আভি বুঝিয়ে দে।'

চেইনম্যানরা মাপ জোখ করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিল।

জমি মাপতে মাপতে সন্ধ্যা হয়ে এল। চারপাশের জঙ্গলের মাথায় সাদা ফিনফিনে কুয়াশার পর্দা নামতে লাগল।

জমি বাঁটোয়ারা বন্ধ করে পালসাহাব বলল, 'আজকের মতো কাম খতম। কাল আবার জমিন মেপে দেব। আন্ধেরা নেমে যাচ্ছে, সবাই ফিরে চল।'

পালসাহাবের পিছু পিছু মানুষগুলো ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল।

৯

মায়া বন্দর থেকে রাত থাকতে থাকতেই ওরা বেরিয়ে পড়েছিল।

বিরাট একটা সুরমাই মাছের মতো জল কেটে 'নটিলাস' বোটটা এই মাত্র উত্তর আন্দামানের এরিয়াল উপসাগরে পৌঁছেছে। ঘণ্টায় পনর নটিক্যাল মাইল বেগে ছুটে এসেছে বোটটা। মোটর এঞ্জিনটা ক্লান্ত একটা হৃৎপিণ্ডের মতো একটানা শব্দ করে হাঁফাচ্ছে এখন।

'নটিলাস' বোটে সওয়ারী মাত্র তিনজন। মালিক পানিকর; নিজেকে সে বলে প্রোপ্রাইটার। প্রোপ্রাইটার পানিকর ছাড়া আরো দুজন আছে। দু'জনই শেল ডাইভার। একজন লা তে; জাতে সে বর্মী। অন্য লোকটার নাম ধানুক; জাতে ওঁরাও।

রোজই রাত থাকতে থাকতে 'নটিলাস' বোট মায়া বন্দর থেকে এরিয়াল উপসাগরে আসে। এর কারণও আছে।

সারাদিন রোদে টগবগ করে ফুটবার পর রাত্তিরে সমুদ্র জুড়োতে থাকে। তখন অথৈ দরিয়া থেকে টার্বো ট্রোকাস ফ্রগশেল কোণ্ড নী-ক্ল্যাম্প সান ডায়াল—নানা ধরনের 'শেল' গুটি গুটি বুকে হেঁটে সমুদ্র থেকে উপসাগর আর

উপকুলের দিকে উঠে আসে। যখন রোদ ওঠে, আস্তে আস্তে রোদের তেজ বাড়তে থাকে, তখন সেই সমস্ত 'শেল' আবার সমুদ্রের গভীরে পালিয়ে যায়। রোদের তেজ তারা সহ্য করতে পারে না। তাই সকাল বেলাটাই 'শেল' তোলার পক্ষে সেরা সময়। ডাইভাররা সকালেই সবচেয়ে বেশি 'শেল' তোলে।

এখনও ভোর হয় নি। উপকুলের ম্যানগ্রোভ বনগুলো নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে ফুটে বেরোয় নি। দূরের স্যাডল পীকের মাথাটা এখন অস্পষ্ট। গাঢ় কুয়াশা আর অন্ধকার উপসাগর উপকুল বন-পাহাড় এবং অনেক দূরের সমুদ্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কুয়াশা এবং অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। শুধু বোঝা যায়, 'নটিলাস' বোটটার চারপাশে আলকাতরার মতো কালো জল দুলছে।

উপসাগর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে রয়েছে ধানুক। দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা তার গোঁজা। কিন্তু লা তে'র চামড়া কোন ধাতুতে তৈরী কে জানে। সে চামড়ায় কড়া রোদ বা তীব্র শীত কোনটাই বেঁধে না। 'নটিলাস' বোটের পাটাতনের ওপর জুত করে বসে ডলে ডলে সারা দেহে সর্ষের তেল মাখছে লা তে, আর হুস্ হুস্ করে কেমন এক ধরনের শব্দ করছে।

মোটর বোটের এঞ্জিনটার পাশে চুপচাপ বসে ছিল প্রোপ্রাইটর পানিকর। এবার সে নড়ে চড়ে উঠল। বলল, 'এ লা তে—'

'হাঁ জী—'

'আজ বড় জাড় (শীত) !'

'কোথায়! আমার তো তেমন জাড় লাগছে না।'

'তুই কি মানুষ! তুই একটা জানোয়ার।'

লা তে কিছুই বলল না। হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। পানিকর তাকে জানোয়ার বলেছে। এ ব্যাপারে লা তে'র পুরোপুরি সায় আছে।

চাপা স্বরে পানিকর আবার বলে, 'জানোয়ার!'

খানিকটা সময় কাটে।

পানিকরই আবার শুরু করল, 'আজ আমরা অনেক আগে এসে পড়েছি, তাই না রে লা তে?'

'হাঁ মালিক।' গায়ে তেল ডলতে ডলতে জবাব দিল লা তে।

পানিকর স্বর চড়িয়ে ডাকল, 'এ ধানুক—ধানুক—'

'হাঁ জী—' কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকানো ধানুক দুই হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা না তুলে জড়ানো স্বরে কুঁই কুঁই করে উঠল। হিমে গায়ের রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে তার।

এবারই প্রথম 'শেল' ডাইভারের কাজ নিয়েছে ধানুক। খাড়ি কি উপসাগর থেকে ডুব দিয়ে দিয়ে সামুদ্রিক শামুক তুলতে হবে। হাঙর-অক্টোপাস এবং

বিষাক্ত সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে লড়াই করে 'সিপি' (শেল) শিকার করতে হবে। খুব সম্ভব এ সব কথাই ভাবছে ধানুক। যতই ভাবছে, অদ্ভুত এক ভয় চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরছে। ভয় আর শীত—এই দুইয়ে ধানুক বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে। হাঁটু দুটো ঠক ঠক করে কাঁপছিল তার; কিছুতেই পা দুটো বশে আনতে পারছে না ধানুক।

পানিকর আবার বলল, 'ডর লাগছে ধানুক!'

'হাঁ মালিক। বদমাস মচ্ছির (হাঙর) সাথ লড়াই করে 'সিপি' তুলতে হবে। জরুর মরে যাব।' হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলে প্রায় কেঁদেই উঠল সে।

হাঙর-অক্টোপাসের মুখ থেকে 'সিপি' তোলার লোক সহজে মেলে না। আন্দামানে যে ক'জন শেল ডাইভার আছে, 'সিপি' তোলার মরসুম শুরু হবার আগেই মহাজনেরা তাদের আগাম টাকা দিয়ে বায়না করে রাখে।

এই মরসুমে একমাত্র লা তে'কেই পেয়েছে পানিকর। লা তে ওস্তাদ ডাইভার। সারা আন্দামানে তার জুড়ি নেই। যত ওস্তাদই হোক লা তে, একজন মাত্র ডাইভারের ভরসায় গোটা মরসুম চালানো যায় না। তা ছাড়া এই মরসুমের জন্য সরকারের কাছ থেকে পুরো উত্তর আন্দামানের লাইসেন্স পেয়েছে পানিকর। উত্তর আন্দামানের উপকুল আর উপসাগরের যত 'সিপি' আসে, একমাত্র সে-ই তুলতে পারবে। কিন্তু উত্তর আন্দামানে কত যে খাড়ি, কত যে উপসাগর, কত যে উপকুল, কে তার হিসাব রাখে।

অনেক চেষ্টা করেছে পানিকর। ডাইভার জোটাবার জন্য নানা দিকে লোক পাঠিয়েছে সে, কিন্তু লা তে ছাড়া আর একটা ডাইভারও জোটাতে পারে নি। সবাই অন্য অন্য মহাজনের কাজ নিয়ে দক্ষিণ আন্দামান, নিকোবর, মধ্য আন্দামান কি লিটল্ আন্দামানে চলে গেছে।

মাস খানেক হল, ফরেস্টের কুলী হয়ে আন্দামান এসেছিল ধানুক। সারা দিন জঙ্গলে কাজ করত। রাত্তিরে মায়া বন্দরে এক কারেনের কুঠিতে শুতে আসত। কারেনটাও ফরেস্টে কাজ করে। জবাবদারির কাজ। এবারের 'সিপি'র মরসুমে মায়া বন্দরে কুঠি ভাড়া করে আছে পানিকর। তার ঠিক পাশেই কারেন জবাবদারের বাড়ি।

সারাদিন লা তে'কে নিয়ে শেল তুলে রাত্তিরে মায়া বন্দরের আস্তানায় ফেরে পানিকর। আস্তানা বলতে ছোটখাটো একটা কাঠের বাড়ি। সেটার সামনে খানিকটা খোলা মাঠ। সেখানে দড়ির খাটিয়া পেতে নেয় পানিকর। গোটা দুই লণ্ঠন জেলে দেয় কারেন জবাবদার। ধানুক আসে, জবাবদার আসে, মায়া বন্দরের করাত কলে যারা কাজ করে, তারাও এসে পড়ে। তারপর গান-বাজনা-নাচ-হল্লা শুরু হয়ে যায়। রোজই পুরোদস্তুর আসর বসে।

এই আসরেই ধানুকের সঙ্গে পানিকরের আলাপ-পরিচয় হয়েছে।

ধানুকের গলা ভারি মিঠে। ডান হাতে বাঁ কানটা চেপে বাঁ হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে, ঘাড়টা সামান্য কাত করে গেয়ে ওঠে :

'ছারা রা-রা—ছা-রা-রা-রা
দেখ চলি যা,
দেখ চলি যা,
ভগলুকা বহিনিয়া, পতিয়ায়া বিটিয়া, জোয়ানিয়া ছোকরিয়া
পাতলি কোমরিয়া লছকিয়া লছকিয়া
দেখ চলি যা,
দেখ চলি যা,
ছারা-রা-রা—ছা-রা-রা-রা'

গলায় গিটকিরি খেলে ধানুকের। কোমল নিখাদ থেকে গলাটাকে যখন চূড়ায় তুলে ওস্তাদী মার মারে সে, 'তিরছি নজরিয়া, পাতলি কোমরিয়া—'

চারপাশ থেকে হল্লা ওঠে, 'সাবাস—'

ধানুক তুখোড় ফুর্তিবাজ। দু চার দিনের মধ্যে তার সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে নিয়েছিল পানিকর। পানিকর অনেক বুঝিয়েছে তাকে, 'জংগলে কুলীগিরি করে জিন্দগী খতম করে কী লাভ? কত রুপাইয়া তলব (মাইনে) মেলে?'

'দো বিশ আউর দশ রুপাইয়া।'

'ফুঃ!' অদ্ভুত এক শব্দ করেছিল পানিকর। 'পঞ্চাশ রুপাইয়াতে হয়! মুলুকে কে কে আছে তোমার?'

'জরু আছে, দুই লেড়কা আছে।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ধানুকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল পানিকর। তারপর বলেছিল, 'তোমাকে আমি মাসে মাসে চার বিশ রুপাইয়া দেব।'

'কাঁহে?'

'তুমি আমার কাছে কাজ করবে।'

'কী কাজ?'

'সিপি চেন?'

'হাঁ জী।'

'দরিয়া থেকে সিপি তুলবে। আর মাসে মাসে চার বিশ রুপাইয়া পাবে। জংগলের নোকরি তুমি ছেড়ে দাও।'

একটু ভেবে ধানুক বলেছিল, 'ঠিক হ্যায় মালেক।'

ফরেস্টের কাজ সত্যিই ছেড়ে দিল ধানুক। মাসে মাসে চার বিশ। অর্থাৎ আশি টাকার লোভটাকে কিছুতেই সামলাতে পারে নি সে।

মায়া বন্দরের অগভীর উপসাগরে নামিয়ে ধানুককে দিন কয়েক তালিম দিল পানিকর। সমুদ্র থেকে কেমন করে সিপি তুলতে হয়, তার প্রক্রিয়াটা শিখিয়ে দিল।

তারপর আজই প্রথম ধানুককে নিয়ে সিপি তুলতে বেরিয়েছে পানিকর

'নটিলাস' বোটের ডেকে শীত আর দুর্বোধ্য এক ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে ধানুক। মাঝে মাঝে নাকের ভিতর শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠছে।

হাতে পায়ে কড়ুয়া তেল ডলতে ডলতে লা তে ধমকে ওঠে, 'এ শালে, বেফায়দা কাঁদছিস কেন ?'

'মর যায়েগা, মর যায়েগা, জরুর মর যায়েগা। হু-হু—' ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলে ফেলে ধানুক, 'আমি সিপি তুলব না। চার বিশ রুপাইয়া তলব আমার দরকার নেই।'

কিছুক্ষণ খ্যা-খ্যা করে হাসে লা তে। তারপর বলে, 'ডরপোক কাঁহিকা! মরবি কেন ? হয়েছে কী ? তাগড়া জোয়ান মরদ কেমন কাঁদছে দেখ, বুরবক —বুদ্ধু—'

'সিপি তোলার সময় বদমাস মচ্ছি (হাঙর) জরুর কাটবে।' ধানুকের ফোঁপানি বাড়তেই থাকে। একদমে সে বলে যায়, 'জঙ্গলের কামই আমার ভাল, আমি আভী মায়া বন্দর ফিরে যাব। দরিয়ায় নেমে জান দিতে পারব না।'

লা তে চোখ কুঁচকে কিছুটা তাকিয়ে রইল। তার তাকানোর ভঙ্গিতে ঘৃণা আর অবজ্ঞা মেশানো।

একটু পরেই ভোর হয়ে এল। সারা রাত এই উপসাগরের ওপর অন্ধকারের যে জালটা ছড়িয়ে থাকে, এই মাত্র অদৃশ্য হাতে কে যেন একটানে সেটা গুটিয়ে নিয়েছে। ঝাঁক ঝাঁক সোনার তীর ছুঁড়ে দিনের প্রথম রোদ গাঢ় কুয়াশার স্তর গুলিকে ছিঁড়ে ফেলেছে। অনেক, অনেক দূরে যেখানে আকাশ আর সমুদ্রের মধ্যে সীমারেখাটা মুছে গেছে সেখানে বিরাট সোনার থালার মতো সূর্যটা দেখা দিতে শুরু করেছে।

উপসাগরের জল কাচের মত স্বচ্ছ। 'নটিলাস' বোট সন্তর্পণে সামনের দিকে এগুতে থাকে। ফলে জলে ঢেউ ওঠে কি ওঠে না।

জলের নিচে বাদামী বালির বিছানা। সেখানে অগুনতি টার্বো আর ট্রোকাস পড়ে রয়েছে।

জলের দিকে ঝুঁকে রয়েছে লা তে। তার চাপা কুতকুতে চোখদুটো চক চক করছে যেন। নিচে টার্বো আর ট্রোকাসগুলোর চারপাশে ঝাঁক ঝাঁক হাঙরের বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জলতলের জগৎটা দেখতে দেখতে আচমকা উপসাগরে লাফিয়ে পড়ল লা তে। ঝপাং করে একটা শব্দ হল।

তারপর সারাদিন উপসাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে সিপি তুলল লা তে।

সমুদ্রের কাছ থেকে কি সহজে কর মেলে! নোনা জলের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ যুঝে, হাঙর আর অক্টোপাসের সঙ্গে অনবরত লড়াই করে সিপি তুলতে হয়।

যতক্ষণ উত্তর আন্দামানের আকাশে দিনের শেষ আলোটুকু ছিল, যতক্ষণ জলের নীচে টার্বো ট্রোকাসগুলোকে দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ উপসাগর থেকে ওঠে নি লা তে। সমানে সিঁপি কুড়িয়েছে।

দুপুরের দিকে একবার মাত্র মোটর বোটে উঠেছিল লা তে। খান দশেক শুকনো রুটি আর খানিকটা ভাজি খেয়েই আবার জলে নেমে গেছে সে।

দ্বীপ আর অরণ্যের ওধারে সূর্যটা কখন যে নেমে গেছে, লা তে টের পায় নি।

এখন যতদূর তাকানো যায়, গোটা সমুদ্র জুড়ে সন্ধ্যা নামার আয়োজন চলছে। আবছা অন্ধকার আর কুয়াশায় চারদিক কেমন যেন বিষণ্ণ, মলিন। এখন উড়ুক্কু মাছগুলি ফিনফিনে রুপোলী ডানায় জল কাটছে না। পাঁশুটে রঙের সাগরপাখিরা সারাদিন দরিয়ায় ঘোরার পর ক্লান্ত ডানায় আকাশ মাপতে মাপতে এখন দ্বীপের আশ্রয়ে ফিরে যেতে শুরু করেছে।

আকাশ থেকে দিনের শেষ আলোটুকু মুছে যাবার সংগে সংগে উপসাগর থেকে মোটর বোটে উঠে এল লা তে। সারা দিন নোনা জলে কাটিয়ে জল শুকিয়ে লা তে'র সারা গায়ে দানা দানা নুন ফুটে বেরিয়েছে।

শেডের এপাশে চুপচাপ বসে রয়েছে ধানুক। দুই হাঁটুর ফাঁকে তার মাথাটা গোঁজা। হাঙর অক্টোপাস আর হিংস্র সব মাছের ভয়ে সে জলে নামে নি। তোষামোদ করে, ধমক-ধামক দিয়ে, আরো বেশি টাকার লোভ দেখিয়েও তাকে জলে নামাতে পারে নি পানিকর। হাজার বার সাহস দেবার পর লা তে'ও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে।

ধানুক জলে তো নামেই নি, সারাদিন কিছু খায়ও নি। দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা ঢুকিয়ে প্রাণের ভয়ে অবুঝ শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সমানে কেঁদে গেছে। আর ভেবেছে, চার বিশ (আশি) টাকার লোভে সিঁপি তোলার কাজটা না নিলেই ভাল করত। এর চেয়ে ফরেস্টের কাজ ঢের ভাল। মেহনত হয়ত বেশি, তলব (মাইনে) হয়ত কম, কিন্তু প্রাণের ভয় তো নেই। সিঁপি তুলে কাজ নেই। মায়াবন্দর ফিরে ফরেস্টের নোকরিতে আবার ফিরে যাবে ধানুক।

শেডের ওপাশে বসে আছে প্রোপ্রাইটর পানিকর। তার গা ঘেঁষে উবু হয়ে রয়েছে লা তে। পানিকর আজ বেজায় খুশি। সিঁপিতে সিঁপিতে 'নটিলাস' বোটের আধাআধি ভরে ফেলেছে লা তে।

এই মরসুমে সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে 'শেল' উপসাগর আর উপকূলের দিকে উঠে আসছে। চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে প্রোপ্রাইটর পানিকর মনে মনে হিসাব কষতে লাগল। এটা তার মুদ্রাদোষ। কোন কিছু ভাবতে শুরু করলেই আপনা থেকে তার চোখ দুটো কুঁচকে যায়। পানিকর ভাবল, সব মরসুমেই এমন সিঁপি আসে না। পনের বছর ধরে আন্দামানের সমুদ্রে ইজারা

নিয়ে 'শেল' তুলছে সে। কিন্তু এই মরসুমের মত এত সিপি ক্বচিৎ চোখে পড়েছে।

হিসাব কষতে কষতে পানিকরের মনে হল, এবার ঠিকমতো সিপি তুলতে পারলে বাকি জীবনের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে না। ভাবল, পোর্ট ব্লেয়ার শহরে একটা বাড়ি কিনে কায়েমী হয়ে বসবে।

সিপির ব্যবসা বড় অনিশ্চিত। সব কিছু দরিয়ার মর্জির ওপর নির্ভর করে। যেবার সমুদ্রের মেজাজ দরাজ থাকে সেবার পানিকররা দু পয়সা কামিয়ে নেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বঙ্গোপসাগর বড় কৃপণ হয়ে যায়। সে-সববারে উপকূলের দিকে সিপি আসে না। যা-ও আসে তা হল ফ্রগ শেল; ক্লাম, স্পাই-ডার—বাজারে যেগুলোর দর কানাকড়িও না। সে সব বার মাথায় হাত দিয়ে বসে পানিকররা। ইজারার টাকা ডাইভারদের মজুরি, মোটর বোটের তেলের খরচ, খাইখরচা—এসব দিয়ে কিছুই প্রায় ওঠে না। লাভ দূরের কথা, ঘরের মজুদ টাকা ঢেলে তাল সামলানো দায় হয়ে ওঠে।

দরিয়ায় দরিয়ায় সিপির পেছনে, আর সিপির সঙ্গে সঙ্গে অনিশ্চিত ভাগ্যের পেছনে পনের বছর ধরে ঘুরছে পানিকর। কিন্তু ভাগ্যকে মুঠোর ভেতর পুরতে পারছে কই? পানিকর ভাবল, এই মরসুমটা ভালয় ভালয় কাটলে হয়। পোর্ট ব্লেয়ার ফিরে অন্য ব্যবসার ফিকির দেখবে। তার অনেক দিনের সাধ, একটা ছোটখাটো হোটেল খোলে।

পানিকরের ভাবনাটা নানা পথে ঘুরে আবার সিপির মধ্যে এসে পড়ল। এবার ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, সান ডায়াল উপসাগরের দিকে উঠে আসছে। দরিয়া এবার দরাজ হাতে ঢেলে দিতে চাইছে। কিন্তু শুধুমাত্র লা তে'র ভরসায় এত বড় একটা মরসুম চালানো যাবে না। শিখিয়ে পড়িয়ে ধানুককে এনেছিল। অক্টোপাশ আর হাঙরের ভয়ে হারামীটা তো জলেই নামল না। অথচ এ মরসুমে অনেক, অনেক ডাইভার দরকার। এত ডাইভার পায় কোথায় পানিকর?

চোখ দুটো কুঁচকেই আছে। কপালের ওপর অনেকগুলো ভাঁজ পড়েছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল পানিকরের। পাশেই উবু হয়ে রয়েছে লা তে। তার পাঁজরে আস্তে একটা গুঁতো দিয়ে সে ডাকল, 'এ লা তে—'

'হাঁ মালেক—'

'ডিগলিপুরে নাকি বহোত নয়া আদমী এসেছে?'

'হাঁ মালেক—'

'শুনেছি পাঁচ ছ মাইল দূরে ওদের সেটেলমেণ্ট বসেছে।'

লা তে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, 'আমিও শুনেছি।'

পানিকর বলল, 'দু চার রোজের মধ্যে একবার সেটেলমেণ্টে যাব।'

'কী মতলব মালেক?'

'কাম আছে।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে পানিকর।

কিছুই না বুঝে পানিকরের দেখাদেখি লা তে'ও মাথা নাড়তে থাকে।

শুধু কি বুড়ি বাসিনী, আজকাল উন্ধব বৈরাগীও বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। একা নিজেই কি দেখছে, আর দশজনকেও দেখাচ্ছে।

উন্ধব হল জাত বৈরাগী।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসার আগে অন্য একটা জীবন ছিল উন্ধবের। সেই জীবনটাকে একটা ধু ধু স্বপ্নের মতো মনে হয়। সেই জীবনটা আদৌ সত্য ছিল কি না, এক এক সময় উন্ধবের মনে সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

জিরানিয়া গ্রামের কথা মনে পড়ে।

জিরানিয়া গ্রামের শিয়র ঘেঁষে একটি মাঝারি নদী তির তির করে বয়ে যেত। নদীর নাম ধলেশ্বরী; রসিক সুজনেরা বলত উজানিয়া গাঙ, মাতানিয়া নদী। ধলেশ্বরীর কাচের মত স্বচ্ছ জলে উজান-ভাটির ঢেউ খেলত।

নদীর পারে কত যে হিজল গাছ, তার লেখাজোখা নেই। ধলেশ্বরীর জল যেমন মিঠে, হিজলের ছায়া তেমনি মিঠে। হিজলের ঠাণ্ডা ছায়ায় জিরানিয়া গ্রামটি জুড়িয়ে থাকত।

মাঝারি নদীটির পারে জিরানিয়া গ্রামটি কিন্তু বেশ বড়। মোট তিন শ ঘর সদগোপ, যুগী আর সোনারুর বাস। কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া আর ঢেউটিনের চালের সারি সারি ঘর। আম গাছ, জাম গাছ, বেতফলের গাছ, বউন্যা আর ঝিকিট গাছ। পাখি? তাও হাজার রকমের। শালিক, ডাহুক, হাড়গিলা, বথারি, তিতির, কাদাখোঁচা—কত যে, কে তার হিসেব রাখে। আর আছে জমি—একফসলা, দোফসলা, তেফসলা। বছর ভরে মাটিতে বীজ ছড়িয়ে যাও। মাটিও অকৃপণ হাতে দিয়ে যাবে। আহা, কি বাহারের জমি। বছরের কোন সময় তার ঝাঁপি শূন্য হয় না।

মাটি মানুষ পাখি গাছ ছায়া নদী—এই সব নিয়েই তো জিরানিয়া গ্রাম।

তাঁতি, সদগোপ, সোনারু—জিরানিয়া গ্রামের কেউ কৌলিক ব্যবসা করত না। সবাই চাষ-আবাদ করত। মাটি নিয়ে মেতে থাকত। তাই জিরানিয়া ধানী গৃহস্থের গ্রাম হয়ে উঠেছিল।

উন্ধব কিন্তু ব্যতিক্রম। তার বিষয়-বাসনা ছিল না। বিষয়-বাসনা কেন, ছেলে-বউ-সংসার, কিছুই ছিল না। পৃথিবীর কোন কিছুর জন্য টান কি মোহ, লোভ কি আসক্তি, কিছুই বোধ করত না সে।

ধলেশ্বরীর কিনার ঘেঁষে একখানা দোচালা ঘর তুলে নিয়েছিল উন্ধব।

সম্পত্তি বলতে এই ঘরটাই ছিল তার সব কিছু। এই ঘরখানাই শুধু নয়, খান-দুই আট হাতি ধুতি, খান দুই ফতুয়া, একটা জলচৌকি, রাধামাধবের যুগল-মূর্তির একটি ছবি আর ছিল একটি সারিন্দা। সারিন্দাটা নিজেই বানিয়েছিল উদ্ধব। নিজের হাতেই সেটাতে তার লাগিয়ে নিয়েছিল। তারই শুধু বাঁধে নি, সুরও সাধত।

নিজেই গান বাঁধত উদ্ধব, সুরও বাঁধত। ভোর হতে না হতে সারিন্দায় ছড় টানতে টানতে বেরিয়ে পড়ত। গলাটি ভারি মিষ্টি। মাথাটা একপাশে হেলিয়ে সে গাইত :

'যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে,
যন্ত্রী বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে,
যন্ত্র বাজে না, বাজে না!'

জিরানিয়া গ্রামে তিন শ ঘর গৃহস্থের বাস। আর গৃহস্থদের দাক্ষিণ্যের মুঠোটি কৃপণ নয়। সারা গ্রাম না ঘুরলেও চলত। সাত বাড়ি থেকে সাত মুঠো পেলেই অক্লেশে দিন চলে যেত। তা ছাড়া সঞ্চয়ের মোহ নেই উদ্ধবের। দু বেলা খাওয়ার মত জুটলেই সে গ্রাম ছেড়ে নদীর পথ ধরত।

নদীর পারে খা খা শূন্য বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে সারিন্দার ছড় টেনে আপন উদাস মনে গাইতে গাইতে কোন দিকে যে চলে যেত, দিশে থাকত না উদ্ধবের।

'কাম ক্রোধ লোভ ত্যজহ
কাঞ্চনময় হবে এ দেহ।'

গান বেঁধে, সুর সেধে, সারিন্দায় ছড় টেনে আর সাত গৃহস্থের ঘর থেকে সাত মুঠো জুটিয়ে জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারত উদ্ধব।

কিন্তু ধলেশ্বরীর নিস্তরঙ্গ জলে আচমকা কোথা থেকে একদিন অন্ধ উন্মাদ একটা স্রোত ছুটে এল। হিজল গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় শান্ত ঘুমন্ত গ্রামটা চমকে উঠল।

আগের দিন বড় গৃহস্থ মহিন্দর সোনারু ঢাকা শহরে গিয়েছিল। খবরটা সে-ই এনেছে। ঢাকা থেকে ফিরেই গ্রামের সব গৃহস্থকে নিজের বাড়ি ডেকে আনল মহিন্দর। এমন যে বিষয়-বিমুখ উদ্ধব, যার কোন ব্যাপারেই মোহ নেই, সেও বাদ পড়ল না।

খবরটা শোনার পর থেকেই সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে মহিন্দর সোনারু। জিরানিয়া গ্রামের সবচেয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ সে; সমাজের শিরোমণি। পুরো দুশো কানি তেফসলা জমি তার।

শহর-গঞ্জের খবরের জাতই আলাদা।

জিরানিয়া গ্রামের বাসিন্দারা কোনকালে ইতিহাস-ভূগোল পড়ে নি। পুঁথি-পুরাণ খবরের কাগজ কোন কিছুর কড়িও তারা ধারে না।

ঢাকা শহরে গিয়ে মহিন্দর যে খবরটা শুনে এসেছে তা হল এই। দেশখান নাকি দু ভাগ হয়ে গেছে। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, জমি-জিরাত ছেড়ে, এই গ্রাম আর ধলেশ্বরীর মায়া কাটিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

মহিন্দর সোনারুর উঠোনে ঠাসাঠাসি করে বসে ছিল মানুষগুলো। তারা ভেবেই পায় না, কেমন করে দেশটা ভাগ হয়ে গেল। যেমন বাতাস তেমনি বইছে, মাটিতে দাগ পড়ল না, নদীর জলে রেখ্ পড়ল না, তবু কিসের কারসাজিতে দেশখানা ভাগ হয়ে গেল? দেশ যে কেমন করে ভাগাভাগি হয়, বাপের বয়সে জিরানিয়া গ্রামের বাসিন্দারা কোনকালে শোনে নি।

এই গ্রামের মাটির সঙ্গে বত্রিশ নাড়ির যোগ। সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যেতে হবে! বড় গৃহস্থ মহিন্দরের খবরটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু কথাটা নাকি সত্যি। খবরের কাগজে বেরিয়েছে। খবরের কাগজের কয়েকটা ছাপা অক্ষরের মর্জিতে জিরানিয়া গ্রামের সঙ্গে এতকালের সম্বন্ধটা চুকিয়ে চলে যেতে হবে! মন ঠিক সায় দিয়ে ওঠে না। তা ছাড়া তারা যাবেই বা কোথায়? এই গ্রামের সীমানার বাইরে যে বিপুল পৃথিবী পড়ে রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাদের বিশেষ কোন ধারণাই নেই। কতটুকুই বা তারা দেখেছে!

ঘরবসত ছেড়ে চলে যেতে হবে। ধলেশ্বরীর পারে হিজল গাছের ছায়ায় শান্ত, নিরুদ্বেগ জিরানিয়া গ্রামটা ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল।

কিন্তু মহিন্দর সোনারুর খবরটা যে মিথ্যে নয়, কয়েক দিনের মধ্যেই টের পাওয়া গেল। এক মাস যেতে না যেতেই আশেপাশের গ্রামগুলিতে ভাঙন ধরল। আগমপুর, রসুনিয়া বেতকা, গোপীগঞ্জ—নানা জায়গা থেকে চারমাল্লাই, ছ মাল্লাই নৌকো বোঝাই হয়ে মানুষজন চলে যেতে লাগল।

একবার ভাঙন শুরু হলে তাকে ঠেকান কি সোজা কথা! চারপাশ থেকে বেড়া আগুনের মত ভাঙন এসে পড়ল জিরিনিয়া গ্রামে। প্রথম গ্রাম ছাড়ল সোনারুরা। তারপর সদগোপেরা। তারও পর যুগীরা। ধলেশ্বরীর জলে ভেসে ভেসে ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকোর বহর চলে যেতে লাগল তারপাখায় ভাগ্যকুল কি মুন্সিগঞ্জের স্টীমার ঘাটায়।

শেষ পর্যন্ত গ্রামের মাটি কামড়ে পড়ে ছিল উদ্ধব। কিন্তু কিসের আশায়, কার ভরসায় সে পড়ে থাকবে?

একটা মানুষও আর নেই। খা খা গ্রামটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত উদ্ধব। সব ব্যাপারেই সে নিস্পৃহ। তবু শূন্য গ্রামটার দিকে তাকিয়ে কেন যেন উদাসীন থাকতে পারেনি সে। নিজের অজান্তে কখন যেন চোখ দুটো সজল হয়ে উঠত।

একদিন রাধামাধবের ছবিখানা, আট হাতি ধুতি দুটো, খাটো ফতুয়া আর

সারিন্দাটা একটা পুঁটুলিতে বেঁধে নৌকোয় উঠল উদ্ধব। জিরানিয়া গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কটা চিরদিনের জন্য ঘুচে গেল।

জিরানিয়া গ্রাম ছেড়ে নানা ঘাটে অঘাটে ঘুরে কলকাতায় এসে উঠল উদ্ধব। এখানে নিদারুণ জীবন শুরু হল তার। প্রথমে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। প্ল্যাটফরম থেকে ফুটপাতে, ফুটপাথ থেকে রিফিউজি ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে মরতে লাগল উদ্ধব।

এখানে কোথাও সাত গৃহস্থের ঘর থেকে সাত মুঠো মেলে না। এখানে দাক্ষিণ্যের হাত বড় কৃপণ। পেটের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল উদ্ধব। শুধু কি উদ্ধব, হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ খাদ্যের জন্য, খিদে নামে আদিম জৈবিক দাবীটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য না করল হেন কাজ নেই।

পৃথিবীর সেই প্রথম যুগে অর্ধপশুগঠন বর্বর মানুষ যেভাবে দিন কাটাত কলকাতায় আসার পর অবিকল সেইভাবেই তাদের দিন কেটেছে। এক, এক সময় তার ধন্দ লেগেছে, একে আদৌ জীবন বলে কি না।

জিরানিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে ন'টা বছর কাটিয়ে দিয়েছে উদ্ধব। এই ন' বছরে একটু একটু করে অদ্ভুত এক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। মৃত্যু ছাড়া একে কী-ই বা বলা যায়! জীবনে সব ব্যাপারেই উদ্ধব নির্বিকার, নিরাসক্ত। তবু নাড়ির টান রয়েছে যে মাটির সঙ্গে, সেই জিরানিয়া গ্রামের কথা ভাবতে ভাবতে মনটা তার ভীষণ খারাপ হয়ে যেত। গ্রামের মানুষগুলো ছন্নছাড়ার মত কে কোথায় যে ভেসে গেল! ঘর গেল, বসত গেল, আত্মবান্ধবেরা গেল। মাথার ওপরকার কয়েকজন নেতা আর মুরুব্বির কারসাজিতে সমস্ত গেল। সব খুইয়ে শুধুমাত্র একমুঠো খাদ্যে জন্য জানোয়ারের মত ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকা! আর যাই হোক, এর নাম জীবন নয়। এর চাইতে মৃত্যুও কাম্য। ন'টা বছর বেঁচে থেকেও মরে রইল উদ্ধব।

সারিন্দাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এই ন' বছরে। গানের একটি পদও বাঁধে নি উদ্ধব; গলায় একদিনের জন্যও তার সুর ফোটে নি।

ন'বছর পর হঠাৎ একদিন ক্যাম্পে খবর এল, আন্দামান দ্বীপে গেলে জমি-জিরাত, হাল-হালুটি, সব মিলবে। যে জীবন তারা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর ওপারে রেখে এসেছে, আন্দামান দ্বীপে গেলে তা ফিরে পাবে।

আশায় আশায় সকলে বুক বাঁধল। জমি পাবে, মাটি পাবে, জীবন পাবে নতুন করে বেঁচে উঠবে। বাঁচার নেশায় অন্ধ হয়ে কত মানুষ যে কালাপানির জাহাজে উঠল, তার লেখাজোখা নেই। তাদের সঙ্গে উদ্ধবও উঠল। সে বাঁচতে চায়।

উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে এসে তিন একর অর্থাৎ ন' বিঘে জমি পেয়েছে উদ্ধব। সারাদিন কোদালের মুখে মাটি কেটে কেটে জমি চৌরস করে সে। রাত্রে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে গানের আসর বসায়।

সারিন্দাটা ভেঙে গেছে, সে জন্য দুঃখ নেই উদ্ধবের। আন্দামানে এসে একটা দো-তারা বানিয়ে নিয়েছে। দো-তারার তারে আঙুলের ঘা মেরে মেরে গুন গুন করে সুর তোলে—

'পরবাসী নাইয়া রে-এ-এ-এ—'

পালসাহাব উদ্ধবের গান-বাজনার সবচেয়ে বড় সমঝদার। উদ্ধবের গানের সময় দুই হাঁটুতে তাল ঠোকে সে। ঘনঘন মাথা ঝাঁকায় আর মুখে বলে, 'বহোত আচ্ছা উস্তাদ, বহোত আচ্ছা—'। উদ্ধবকে সে উস্তাদ বলে।

পালসাহাবের গলা যেমন কর্কশ, তেমন বাজখাঁই। মাঝে মাঝে নিজের স্বরের মহিমা ভুলে উদ্ধবের সুরে সুর মেলাতে যায় সে, 'পরবাসী লাইয়া রে-এ-এ—', নিজের কানেই নিজের স্বরটা কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায়। সুর থামিয়ে পালসাহাব বলে, 'বুঝলি উস্তাদ, গলাটা আমার বহোত নালায়েক, বদখত। শালে যেন ঘোড়ার ডাক ডাকে।' নিজের গলার সঙ্গে হ্রেষাধ্বনির তুলনা দিয়ে খ্যা খ্যা করে হেসে ওঠে সে।

বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে উদ্ধব।

ধলেশ্বরী পারের যে সুর, যে গান কলকাতায় এসে হারিয়ে ফেলেছিল সে, বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এই দ্বীপে এসে সেই সুর সেই গান আবার ফিরে পেয়েছে।

এখন সন্ধ্যা।

কুয়াশা আর অন্ধকারের তলায় উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা তলিয়ে যাচ্ছে। এখন আকাশটা আর দেখা যায় না। চারপাশের অরণ্যকে ধোঁয়ার পাহাড়ের মতো মনে হয়।

সারাদিন জমি মাপ-জোখ করেছে পালসাহাব। এত মানুষকে তো দু-একদিনে জমি মেপে দেওয়া সম্ভব না। যাদের এখনও দেওয়া হয়নি, হিসেব করে তাদের অনেককে জমি বুঝিয়ে দিয়ে বাঁশের টুকরো পুঁতে সীমানা ঠিক করে দিয়ে এসেছে।

দিনের শেষে মানুষগুলো এখন ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে চলেছে। সবার আগে আগে চলেছে পালসাহাব।

আজ কী তিথি কে জানে! কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে! সে আলোতে কিছুই স্পষ্ট নয়। এই ট্রানজিট ক্যাম্প, টিলা, চারপাশের জঙ্গল—সব কেমন যেন আবছা, রহস্যময়!

খানিকক্ষণ পর টিলা বেয়ে ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে উঠতে উঠতে পালসাহাব হাঁকল, 'এ উস্তাদ, উস্তাদ হো—'

সকলের পেছনে টিলা বাইছিল উদ্ধব। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পালসাহাবের কাছে এসে পড়ল। বলল, 'এই যে পালসাহাব—'

'হাঁ উস্তাদ ; দিল চায়—' বলে একটু থামল পালসাহাব। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'দিল কী চায় বল দিকি উস্তাদ ?'

'কি জানি।'

ভয়ে ভয়ে পালসাহাবের মুখের দিকে তাকাল উম্ধব। এই রহস্যময় মানুষটাকে আদৌ বুঝতে পারে না সে। কখন কোন কথায় পালসাহাব ক্ষেপে উঠবে, কোন্ কথায় খুশী হবে, আগে থেকে তার হদিস মেলে না। পালসাহাবের চরিত্র বড় দুজ্ঞেয়। তাই সব সময় উম্ধব তটস্থ হয়ে থাকে। বেশ ভেবে-চিন্তে তার কথার জবাব দিতে হয়।

পালসাহাব আবার প্রশ্ন করল, 'আমার দিল কী চায় উস্তাদ ?'

এবারও জবাব দিল না উম্ধব। পালসাহাবের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

পালসাহাব উম্ধবের পিঠে একটা হাত রেখে সস্নেহে বলল, 'নালায়েক বুম্ধু, এতরোজ আমার সাথ থেকেও দিলের কথাটা বুঝতে পার না উস্তাদ! দিলের কথা না বুঝলে দোস্ত বনবে কেমন করে ?'

কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে উম্ধব বলল, 'হু।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

যে মানুষগুলো জমির ভাগ নিতে গিয়েছিল, তারা ট্রানজিট ক্যাম্পের ঝুপড়িগুলোর ভেতর ঢুকে পড়েছে।

পালসাহাব বলল, 'এ উস্তাদ, দিল চায় একটু গান-বাজনা হোক।'

অবাক হয়ে পালসাহাবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে উম্ধব। এই মানুষটা সম্বন্ধে ভেবে ভেবে থই পায় না সে।

সারাদিন অসুরের মতো খেটেছে পালসাহাব। এক হাতে জমি মেপেছে, আর এক হাতে বাঁশ পুঁতে সীমানা ঠিক করেছে। উম্ধব ভাবতে চেষ্টা করল, হাজার খেটেও কি পালসাহাবের ক্লান্তি আসে না ? সারাদিন খাটুনির পর যখন চোখ দুটো আপনা থেকেই বুজে আসে, আপনা থেকেই ঢুলুনি লাগে, শরীরটা আর বশে থাকতে চায় না, তখনও গান-বাজনা করার মত উদ্যম কোথায় পায় পালসাহাব ?

অফুরন্ত প্রাণশক্তি পালসাহাবের। অদম্য তার উৎসাহ। তার প্রাণশক্তি হাজার অপচয়েও ফুরোয় না। আজকের উম্ধব জানে না, কিন্তু বহুকাল পরের আর এক উম্ধব জেনেছিল, পালসাহাবের দৌলতেই নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে সে। শুধু সে-ই না, এখানে যারা উপনিবেশ গড়তে এসেছে পাল সাহাবের কল্যাণে তারা সকলেই। তারা উত্তর আন্দামানের এই নিদারুণ দ্বীপে তারই জন্য নতুন করে তারা বেঁচে উঠেছে।

পালসাহাব এবার তাড়া লাগায়, 'যাও উস্তাদ, গান-বাজনার ইন্তেজাম কর। জলদি উস্তাদ—'

ঝুপড়ি থেকে দো-তারাটা নিয়ে এল উদ্ধব।

ট্রানজিট ক্যাম্পের সামনে খানিকটা সমতল, ঘাসের জমি। সেখানে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল উদ্ধব আর পালসাহাব।

দো-তারার তারে মৃদু মৃদু ঘা মারে উদ্ধব। টুং টুং করে সুর ফোটে। দুই হাঁটুর উপর চাপড় মেরে মেরে তাল দেয় পালসাহাব। দো-তারার বাজনা যখন জমে ওঠে, তখন বলে, 'লাগাও উস্তাদ, গানা লাগাও—'

দো-তারার শব্দ পেয়ে ঝুপড়িগুলোর ভেতর থেকে হারাণ, রসিক শীল আর বুড়ী বাসিনী বেরিয়ে এসেছে। সরাসরি পালসাহাব আর উদ্ধবের গা ঘেঁষে বসে পড়েছে।

পালসাহাব অস্থির হয়ে উঠল, 'লাগাও উস্তাদ—'

উদ্ধব গান ধরল ঃ

'গোরানাম লইতে অলস
করো না রসনা,
যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?'

পালসাহাব সায় দেয়, 'ঠিক ঠিক, বহোত সাচ্ বাত বলেছ উস্তাদ, ঢেউ দেখলেই কি নৌকো ডুবাতে হয়!'

উদ্ধব উত্তর দেয় না। গানের শেষ পদটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানা তালে নানা সুরে গাইতে থাকে, 'ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল পালসাহাব! উদ্ধবের মুখে হাত চাপা দিয়ে গান থামিয়ে দিল। তারপর বলল, 'এট্টু থাম উস্তাদ, আগে শালে-লোগদের ডেকে আনি। তাদের তুমি সমঝিয়ে দাও। শালেরা মুখ বেজার করে থাকে, খালি কাঁদে। আরে নালায়েক বুদ্ধুর দল, ডরের কী আছে। এক জিন্দগী তুড়ে গেছে, কী করা যাবে! মুর্দা কোলে করে কে আর কতক্ষণ বসে থাকে। এই দ্বীপে জমিন পেয়েছিস। নয়া জমানা, নয়া জিন্দগী বানা।' বলেই পালসাহাব ট্রানজিট ক্যাম্পটার দিকে ছুটল। ঝুপড়িগুলোর সামনে এসে চিল্লাতে লাগল, 'এ শালে-লোগ, এ কুত্তার দল বেরিয়ে আয়।'

পালসাহাবের চেল্লাচিল্লিতে ক্যাম্প থেকে সবাই সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দৌড়ে বেরিয়ে এল। সকলকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধবরা যেখানে বসে আছে সেখানে এসে পড়ল পালসাহাব। বলল, 'গাও উস্তাদ, তোমার সেই গানটা এবার শুরু কর। ওদের সমঝিয়ে দাও, জিন্দগীতে বহোত ভারী ভারী তুফান আসে। তুফান দেখেই যারা নাও ডুবিয়ে দেয় তারা মানুষ না।' গলার স্বরটা গভীর শোনাতে থাকে পালসাহাবের। অনেক কথাই সে বলে যায়। জীবনে কত ভারী ভারী

ঝড় আসে, ঘর-বসত সাধ-বাসনা কত বার ভেঙে যায়, তাই বলে কি হতাশ হলে চলে! কোন ব্যাপারে কোন আপসোস রাখতে নেই। বিমুখ প্রতিকুল অবস্থা থেকে সব বাধা, সব হতাশা ভেঙেচুরে ওঠার নামই তো জীবন। এই কথা-গুলিই নিজের ভাষায়, নিজের নিয়মে বলে যায় পালসাহাব।

উদ্ধব গাইতেই থাকে—

'ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি,
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?'

১১

চারপাশে নোনাজল, মাঝখানে মিঠে মাটি।

মাপজোখ করে সেই মাটি সকলকে ভাগ করে দিয়েছে পালসাহাব। বাঁশের ছোট ছোট টুকরো পুঁতে সীমানা ঠিক করে দেওয়াও শেষ হয়েছে।

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী পারের মাটি হারিয়ে এসেছে মানুষগুলো। বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেল।

নিঃস্ব, নির্ভুম, দুঃখী মানুষগুলো মাটি পেয়েছে। জমি বাঁটোয়ারা করতে করতে পালসাহাব বলেছিল, 'জমিন দিলাম। এবার নতুন করে বেঁচে ওঠ।' বলতে বলতে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে সে। তার চোখ দুটো চারদিকের উঁচু উঁচু পাহাড় পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। গাঢ় অদ্ভুত গলায় সে সমানে বলে গেছে, 'এখানে গাঁও বসাবি, ধান মলবি, দেওয়ালে ঘিউ-সিন্দুর দিয়ে বসুধারা আঁকবি…'

মানুষগুলো জবাব দেয় নি। শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে।

নতুন বসতের আশায় সমুদ্র পেরিয়ে যারা এখানে এসেছে তাদের কেউ বারুই, কেউ সোনারু, কেউ কাহার, কেউ কুমোর, কেউ জোলা, কেউ মালো, কেউ যুগী, কেউ কামার, আবার কেউ সদগোপ। কিন্তু এ সবই তাদের বিগত জীবনের পরিচয়—যে জীবন তারা পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পারে পারে হারিয়ে এসেছে।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ মানুষগুলোর অতীত পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়েছে। এখানে কেউ আর কাহার-কুমোর-সদগোপ কি যুগী নয়, এখানে সকলের একটি মাত্র পরিচয়, একটি মাত্র বৃত্তি। মাটি পেয়ে সবাই এখানে কৃষাণ হয়ে গেছে।

কৃষির দৌলতেই পৃথিবীর আদিম যাযাবর মানুষ প্রথম গৃহী হয়েছিল। হাজার মাইল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে যারা এই দ্বীপে এসেছে, একদিন তারাও গৃহস্থ ছিল। তাদের নিরাপদ নিশ্চিন্ত সভ্য একটা জীবন ছিল। কী না ছিল তাদের! ঘরভদ্রাসন, জমিজিরেত—সব।

পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীপারের মাটি মরসুমে মরসুমে ফসলের লাবণ্যে ভরে উঠত। দূর থেকে ফসলের ক্ষেত দেখে মনে হত, কেউ যেন পরম আদরে এক-খানা নক্সিকাটা আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে।

ফসল ওঠার পর আসত ঢপের নৌকো, জারি সারি এবং নানা লীলাপালার দল। গানে গানে নদীতীরের গ্রাম মাতোয়ারা হয়ে উঠত। গায়কেরা বড় দরদ দিয়ে পিরীতের গীত গাইত:

'ও সজনী, প্রাণ সজনী, মুখ তুলিয়া চায়।
ভরা দেহের গাঙ্গে লো সই, সাধের জোয়ার যায়।'

জীবনে রঙ ছিল, রস ছিল। গৃহপালিত জীবনটিকে ঘিরে স্বপ্ন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত। আহা, যেদিকে তাকানো যায়, সুধা যেন উছলে উছলে পড়ত।

কিন্তু কী বিড়ম্বনা!

কোথায় কোন হিল্লি দিল্লীতে কারসাজি হল। আর তারই ফলে দেশখানা দু টুকরো হয়ে গেল। ভূগোলের হৈ চৈ থেকে অনেক অনেক দূরে পদ্মা-মেঘনা ধলেশ্বরীপারের মানুষের তৈরী বড় সাধের ঘর ভেঙে গেল। সেই সব গ্রাম, সেই জীবন, সাত পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন কোথায় পড়ে রইল! সে যেন অন্য-জন্মের স্মৃতি। সুখী গৃহী মানুষগুলি যাযাবর হয়ে পৃথিবীর আদিম পরিচয়ে ফিরে গেল।

কী নিদারুণ প্রহসন! কুৎসিত বিষাক্ত রাজনীতি পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-পারের গৃহস্থ মানুষগুলোকে কত হাজার বছর পর আবার নতুন করে যাযাবর করে দিল।

নিঃস্ব মানুষগুলো কয়েকটা বছর ভূমিহীন ইহুদীদের মতো ঘোরার পর এই দ্বীপে আবার মাটি পেয়েছে। পায়ের নীচে আশ্রয় পেয়ে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাল-হালুটি, লাঙল-বলদ এখনও আসে নি। তবে পালসাহাব সবাইকে একটা করে কোদাল দিয়েছে। সেই কোদাল নিয়ে সকলে জমিতে নেমেও পড়েছে। মাটি কোপাচ্ছে। জমি চৌরস করছে।

পালসাহাব এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে। দেখতে দেখতে পাগলার চোখে স্বপ্ন নিবিড় হয়ে আসে।

অরণ্যের তলায় এতকাল যে মাটি বন্দিনী হয়ে ছিল, তা তো কুমারী।

মানুষের ভোগের জন্য তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। লোহার কোদালের কোপ পড়ছে তার শরীরে। এই দ্বীপের মাটি এই প্রথম মানুষের স্পর্শ, পুরুষের স্পর্শ পাচ্ছে।

পাগলা পালসাহাব ভাবে, একদিন এখানে হাল বলদ আসবে। লাঙলের ধারাল ফলায় ফলায় মাটি তৈরি হয়ে যাবে। তারপর একদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামবে। একদিন নরম মাটি বীজদানা পেয়ে গর্ভিনী হয়ে উঠবে। তারপরও আর একদিন আছে, যেদিন মাটি ফসলবতী পুলকময়ী হবে।

এক কিনারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলা পালসাহাব সেই স্বপ্নই দেখতে থাকে। দেখে দেখে সাধ আর মেটে না।

১২

এতকাল এই মাটির ওপর অরণ্য চেপে বসে ছিল। পরম নিশ্চিন্তে সে তার সংসার বাড়িয়েই যাচ্ছিল। তার অধিকারে হাত দেবার মতো দ্বিতীয় কোন দাবীদার এখানে ছিল না।

উত্তর আন্দামানের এই জটিল অরণ্যে মানুষের নজর চলে না। পৃথিবীর আদিম অন্ধকারকে নিজের বুকের ভেতর ধরে রেখে নির্বিঘ্নে তার দিন কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু এই দ্বীপে মানুষ এসেছে। মানুষের প্রয়োজন এসেছে। উদ্ধব বৈরাগী, রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর—বুড়ো-জোয়ান সকলেই কোদালের মুখে পরল পরল মাটি তুলছে। শুধু কি পুরুষ মানুষরাই এসেছে, ঘরের বউ-ঝিরাও জমিতে এসে নেমে পড়েছে।

হরিপদ বারুইর বুকে টানের দোষ; নড়াচড়া করলেই ব্যথাটা বাড়ে। তাই তার বউ তিলি এসেছে। শুধু কি তিলি? হিমি, ক্ষীরি সারী কাপাসী বুড়ী বাসিনী—আরো কত জন এসেছে, কে তার হিসাব রাখে।

যে সব ঘরের বাপ-ভাই-সোয়ামী অক্ষম অপরাগ, নিত্য দিন ব্যারামে ভোগে, সেই সব ঘরের বউ-ঝিদের জমিতে না নেমে উপায় কী? বিশেষ এই আন্দামান দ্বীপে।

পাগলা পালসাহাব যেন ঘোরের মধ্যে ছুটতে থাকে। মাটি কোপাতে কোপাতে তিলি হয়ত হয়রান হয়ে পড়ে। ছোঁ মেরে তার কোদালখানা ছিনিয়ে খানিকটা কুপিয়ে দেয় জঙ্গল। পোড়া অঙ্গারের স্তূপ সরাতে সরাতে বুড়ো রসিক শীলের হয়ত জিভ বেরিয়ে পড়ল। ছুটে গিয়ে পালসাহাব সরিয়ে দিল।

দীর্ঘ উপত্যকার এক মাথা থেকে আর এক মাথায় ছুটে বেড়াচ্ছে পাল সাহাব। এর মাটি কুপিয়ে দেয়, ওর জমির আগাছা সাফ করে, তার কোদালের আছাড়ি পরিয়ে দেয়।

পালসাহাবের ওপর বিচিত্র এক নেশা যেন ভর করেছে। ঠিক নেশা নয়, পাগলার প্রাণের মধ্যে কোথায় যেন উৎসব শুরু হয়েছে। পাল সাহাব দেখতে পাচ্ছে, প্রাণেই শুধু নয়, উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ জুড়ে জীবনের উৎসব শুরু হয়েছে।

এখন বেলা কত, কে জানে!

আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলার বয়স বোঝার জো নেই। তা ছাড়া বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে যারা নয়া বসতের আশায় আশায় এসে পড়েছে, এমনিতেই তারা সময়ের কড়ি ধারে না।

মাথার ওপর আকাশের বিরাট টুকরোটা জ্বলছে। এক ঝাঁক সাগরপাখি উড়তে উড়তে বুঝি বা এরিয়াল উপসাগরের দিকেই চলে গেল। একটু পরেই সূর্যটা দ্বীপের মাথায় এসে পৌঁছুবে। আজ সবার শেষে জমিতে এল হারাণ। এসে দেখল, জমি কোপানো চলছে। কোদালের মুখে মুখে পরল পরল মাটি উঠছে।

উত্তর দিকে পাহাড় ঘেঁষে হারাণের জমি। আচমকা সেদিক থেকে ডাকটা ভেসে এল, 'এ শালে হারাণ, এ কুত্তা লবাবকা বাচ্চা, ইধর আয়।'

খিস্তির নমুনাতেই বোঝা গেল, পালসাহাব। নিজের জমির দিকে দৌড়ল হারাণ।

পাল সাহাব হারাণের জমি কোপাচ্ছিল! কপালে মুখে হাতে পায়ে— সারা দেহ মাটি-মাখা। কামিজ আর প্যাণ্টে, মাথার ফেল্ট হ্যাটে, রোমশ বুকে, পাটকিলে রঙের এক মুখ দাড়িতে ডেলা ডেলা মাটি লেগে রয়েছে। ঘামে ভিজে সেই মাটি লেপটে গেছে। কি অদ্ভুতই না দেখাচ্ছে পাল-সাহাবকে!

মুখখানা কাচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়াল হারাণ।

'এত দেরী করলি যে? সব আদমী এক পর্দা মিট্টি তুলে ফেলল—' বলে একটু থেমে এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিল পালসাহাব। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'শালে শোন, এই দ্বীপ আমার এলাকা। এখানে লবাবী চলবে না। রোজ সুবেতে (সকালে) জমিন কোপাতে না এলে পিটিয়ে হাড্ডি ঢিলা করে দেব। বাতটা ইয়াদ রাখিস।' বলতে বলতে হারাণের জমি থেকে উঠে এল পালসাহাব।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হারাণ। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে তার। বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে যে মানুষটার হাতে তাদের

মরা-বাঁচা নির্ভর সেই পালসাহাব নিজে তার জমি কুপিয়ে দিয়েছে। এ লজ্জা কোথায় রাখবে হারাণ! মাথা তুলে সে পালসাহাবের দিকে তাকাতেই পারছে না। কাঁপা ভীরু গলায় এক সময় সে বলল, 'আপনে আমার জমিন কুপাইলেন (কোপালেন) ক্যান? আমার কত অপরাধ হইল!'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পালসাহাব। তারপর বলল, 'দিল হল তাই তোর মিট্টি কুপিয়ে দিলাম। সবার জমিন কোপানো হচ্ছে, খালি তোরটাই বাদ পড়ে থাকবে?' বলতে বলতে থেমে গেল পালসাহাব। হঠাৎ স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল সে। আকাশের ওপারে কোথায় যেন দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলল। এই দ্বীপের নতুন মানুষ আর অরণ্যের তলা থেকে বার করে আনা নতুন মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে পালসাহাব।

এখন, এই মধ্য দুপুরে সূর্যটা যখন সরাসরি দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে, পাগলা পালসাহাব সেই স্বপ্নটাই দেখতে লাগল। অনুচ্চ ফিস ফিস স্বরে সে বলল, 'এই দ্বীপে তোরা এক সাথ এসেছিস। এক সাথ তোদের জমিন ভাগ করে দিয়েছি। এক সাথ তোরা মিট্টি কোপাবি, ফসল ফলাবি। কেউ আগে না, কেউ পিছে না। সবাই এক সাথ। কেউ পিছে পড়লে আমি তার কাম করে দেব।' বলতে বলতে পালসাহাব থেমে গেল।

খানিকক্ষণ পর আস্তে করে হারাণ ডাকল, 'পালসাহাব—'

পালসাহাবের হুঁশ নেই। উঁচু উঁচু পাহাড়ের ওপারে কোথায় যেন সেই স্বপ্নটা তখনও দেখে চলেছে সে। এই মুহূর্তে পালসাহাবকে ঠিক বোঝা যায় না। সে এখন দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য অনেক দূরের স্পর্শাতীত জগতের মানুষ।

ভয়ে ভয়ে হারাণ আবার ডাকল, 'পালসাহাব—'

'হাঁ—' একটু আগের ঘোরটা কেটে গেল পালসাহাবের। সঙ্গে সঙ্গে সে খেঁকিয়ে উঠল, 'আমার মুখের দিকে চেয়ে কী দেখছিস হারামজাদকে বাচ্চে। যা আপনা কাম কর—' হারাণের ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে জমিতে নামিয়ে দিল পালসাহাব। তারপর পশ্চিম দিকে তিনখানা জমি বাঁয়ে রেখে বুড়ো রামকেশবের জমির দিকে ছুটল।

এদিকে মাটিতে কোপ মেরেই হারাণ চমকে উঠল। কোদালের মুখে মাটির যে পরলটি উঠল, তার নীচে সরুমোটা কত যে শিকড় রয়েছে, লেখাজোখা নেই।

সরকারী বনবিভাগের লোকেরা মাটির ওপরের জঙ্গল সাফ করে গিয়েছিল। কিন্তু অরণ্যকে নির্মূল করা এতই সহজ! মাটির নীচে কত কাল ধরে হাজার হাজার শিকড় নামিয়ে অরণ্য তার দখল কায়েম করে রেখেছে। শুধু কি শিকড়, মাটির গর্ভে হাওয়াই বুটি, জলডেঙ্গুয়া, ইকড় ঘাস, কড়ুই ঘাস

প্যাডক-দিদ্-চুগলুম গাছের কত বীজই না জমা হয়ে রয়েছে! আর এই সব বীজ আর শিকড়ের মধ্যেই রয়েছে নতুন অরণ্যের সম্ভাবনা।

তবু প্রাণপাত করে জমি কুপিয়ে চলল হারাণ। কোদালের ঘায়ে মাটির সঙ্গে টুকরো টুকরো শিকড় উঠে আসছে।

এই দ্বীপের মাটি কি বাহারের! এক ডেলা মাটি হাতে তুলে চাপ দিলে গুঁড়ো গুঁড়ো ঝুরো ঝুরো হয়ে যায়। কিন্তু সেই মাটিকে অরণ্যের দখল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সোজা ব্যাপার নয়।

এতকাল অরণ্য এই দ্বীপের মাটির গভীর তলদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এখন কোদালের মুখে মুখে মাটির ওপর তার লক্ষ কোটি বছরের দাবী ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে; নতুন করে বাঁচার জন্য মানুষের বিপুল পরিমাণে জমি দরকার।

সমানে মাটি কোপাচ্ছে হারাণ। সারা গায়ে বনপোড়া ছাই মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

বন বিভাগের লোকেরা জঙ্গল পুড়িয়ে বড় বড় গাছগুলো কেটে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও অজস্র হাঁওয়াই বুটি আর জলডেঙ্গুয়ার ঝোপ রয়েছে।

হারাণ এক একবার ধারাল দা দিয়ে ঝোপঝাড় সাফ করে, আবার মাটি কোপায়। পিছল মাটি থেকে কত যে জোঁক বেয়ে বেয়ে গায়ে উঠছে, এক এক সময় খেয়াল থাকে না তার। যখন খেয়াল হয়, দা দিয়ে জোঁকগুলোকে চেঁছে ফেলে। যেগুলো পিঠের দিকে বা পায়ের গোছের পেছন দিকে লেগে থাকে সেগুলো রক্ত শুষে শুষে কচি তেলাকুচের মতো ফুলে আপনা থেকেই খসে পড়ে।

একসময় বেলা ঢলে পড়ল। রোদের তেজও মরে আসতে শুরু করল। কোদালটা নামিয়ে রেখে একবার পেছনে তাকায় হারাণ। আজ বেশ খানিকটা জমি কোপানো হয়েছে। কিন্তু আরো অনেকটাই বাকি। পুরো জমি কোপাতে অন্তত মাসখানেক লেগে যাবে।

এবার অন্য দিকে তাকায় হারাণ। চারপাশের জমিগুলোতে কাজ চলছে। তার চোখ দুটো এধার ওধার ঘুরতে ঘুরতে পাশের জমিতে এসে পড়ল।

বাঁশের টুকরো পুঁতে পুঁতে কবার জমির সীমানা ঠিক করে দিয়েছে পাল-সাহাব। হারাণের জমির ঠিক পাশেই নিত্য ঢালীর জমি। কিন্তু আজ নিত্য জমি কোপাতে আসে নি; তার বদলে এসেছে কাপাসী।

কাপাসী মাটিতে দু চার কোপ বসায় আর হাঁপায়। হাঁপায় আর কাঁদে। াঁদে, কিন্তু শব্দ হয় না। চোখ বেয়ে লোনা জলের যে ধারা নামে, হাতের পিঠ দিয়ে তা মুছে ফেলে কাপাসী।

হারাণ অবাক হয়ে গেছে। যে কাপাসীকে কোনদিন কাঁদতে দেখে নি সে াখন কাঁদছে। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে

হারাণ। তারপর এদিক সেদিক দেখে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। খুব আস্তে করে ডাকে, 'কাপাসী—'

'কে?' কাপাসী চমকে উঠল।

'আমি, আমি।' বলে একটু থেমে কি যেন ভেবে নিল হারাণ। বলল, 'কান্দো (ক্যাঁদো) ক্যান?'

'কোথায় কান্দি (কাঁদি)? কান্দি না তো।'

'এই যে দেখলাম। অহনও তো তোমার চোখ ভিজা।'

'ভুল, ভুল দেখছ পুরুষ।' ভিজে চোখদুটো হাতের পিঠে ঘষে ঘষে মোছে কাপাসী। তারপর শব্দ করে অদ্ভুত হাসে। বলে, 'কই, কান্দি (কাঁদি) না। এই তো হাসি।' হেসে হেসে ঢলে পড়ে কাপাসী। হাসির দমকে দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে যায়। সর্বাঙ্গ দিয়ে অস্বাভাবিক অবুঝ হাসি হাসছে মেয়েটা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হারাণ। কাপাসীর হাসির এই তীব্র বিচিত্র শব্দটা যখনই সে শোনে, তখনই অদ্ভুত এক ভয় তাকে ঘিরে ধরে।

আচমকা যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা কাপাসীর হাসি থেমে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারাণ বলে, 'তুমি জমিন কুপাইতে আইছ যে, নিত্য তালুই কই?' হারাণ নিত্য ঢালীকে তালুই ডাকে।

কাপাসী বলল, 'বাবায় আহে নাই। পিত্তি শূলের ব্যথাখান বাড়ছে। হেইর লেইগা আমি জমিন কুপাইতে আইছি।'

মাঝে মাঝে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলে কাপাসী। তখন আশায় বুক বাঁধে হারাণ। খুশিতে আনন্দে চোখ দুটো চক চক করে তার। নিজের মনকে কে বুঝ মানায়, আর দশ জনের মতো কাপাসী আবার সুস্থ হবে, স্বাভাবিক হবে। তাকে ঘিরে জীবনের সুন্দর সাধটাকে মিটিয়ে নেবে সে। কাপাসীকে ঘিরে হারাণের বুকে কত যে আশা, কত যে সাধ!

কাপাসী বলতে থাকে, 'বাপ শূলের বেদনায় কাতর। আমি জমিন না কুপাইলে ফসল ফলামু কেমনে? খামু কী?' এরপর আর কথা বাড়ায় না কাপাসী। কোদালটা তুলে মাটিতে কোপ বসায়।

হারাণ চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। মেয়েমানুষের হাতে কত শক্তিই বা ধরে! কোদালের ফলা মাটি নীচে এক কড়ও ঢোকে না। মাটির ওপর আঁচড় বসায় মাত্র। হারাণ হাসে। বলে, 'এই কোপের কাম না কাপাসী। পরল পরল মাটি তুইলা জমিনের উথাল পাথাল কইর‍্যা ফালাইতে কইর‍্যা অইব। তবে না মাটি চাষের যুইগ্য অইব। তবে না মাটি ফসলের জন্ম দিব।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'কোদালখান আমারে দাও, আমি জমিন কুপাইয়া দি।'

খুব নিরাসক্ত মুখ করে কাপাসী বলে, 'না।'

হারাণ জোরজার করতে থাকে, 'দাওই না কোদালখান।'

'না, তুমি তোমার জমিনে যাও।' বলে আর মাটি কোপায় কাপাসী।

হারাণ বলে, 'যা কোপ মার, হেইতে কুনো কালে জমিন চৌরস অইত না কাপাসী।'

'দ্যাখো পুরুষ, তা অইলে লয়ন ভইর‍্যা দেখ; কেমন কোপ মারি!' জোরে, আরো জোরে কোপ বসায় কাপাসী। এবার কোদালের ফলা পরল পরল মাটি তুলতে থাকে। আর কোপাতে কোপাতে আবার তীব্র অবুঝ গলায় হেসে ওঠে সে।

গভীর এক দুঃখের ছায়া পড়ে হারাণের মুখে। অবোধ এক কষ্ট তাকে চারদিক থেকে যেন ঘিরে ধরতে থাকে। একটু আগে স্বাভাবিক ভাল মানুষের মতো কথা বলছিল কাপাসী। এই মুহূর্তে সেই অদ্ভুত হাসিটার মধ্য দিয়ে আবার অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। হারাণের মনে হল, কেঁদে ওঠে। যে কান্নাটা গলার ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, অতি কষ্টে তা বাগ মানালো হারাণ।

পশ্চিম দিকের পাহাড় ঘেঁষে বুড়ো রসিক শীলের জমি। তার মাটি কুপিয়ে দিচ্ছিল পালসাহাব। হাসির শব্দে সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল; সেটাকে ঠিক করে মাথার উপর বসাল। তার বিরক্ত মুখে অগুনতি ভাঁজ পড়ল। রোমশ ভুরু দুটো কুঁচকে যেতে লাগল।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল পালসাহাব, 'কৌন, কৌন হাসতা? শালের জান লে লেগা।'

পাশ থেকে কে যেন বলল, 'কাপাসী হাসে বাবা।'

হাতের কোদালটা ছুঁড়ে দৌড়তে দৌড়তে কাপাসীর জমিতে এসে পড়ল পালসাহাব। জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে হুমকে উঠল, 'এই মাগী, হাসো মাত। হাসবি না। তোর হাসি শুনলে আমার মেজাজ বিগড়ে যায়।'

হাসিটা তুমুল হয়ে উঠল কাপাসীর। হাসতে হাসতেই সে বলে, 'আঁই ড্যাকরা, আঁই পালসাহাব, আমার হাসন থামাইতে চাস?'

'হাঁ, এখানে এ্যায়সা হাসি চলবে না।'

'হাসন তো থামাইতে চাস! আরে সোনা, আমার হাসন কি তর বশে?'

পালসাহাব গর্জে ওঠে, 'চোপ্—'

হাসিটা বাড়তেই থাকে কাপাসীর। সে বলে, 'ধমক দিয়া আমার হাসন থামাইতে পারবি না! আমার হাসন তর বশে না, আমার বশে না, এই পিরথিমীর কোন মনিষ্যের বশে না।'

এবার আর কথা বলে না পালসাহাব। একদৃষ্টে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাপাসী হাসে আর বলে। তার গলাটা বড় করুণ শোনায়, 'ভগমান জন্মের সময় কপালে যা লিখছিল, তা কি মিছা হয় পালসাহাব? হাসতে হাসতেই আমার পরান যাইব।'

পালসাহাব মুখটা অন্য দিকে ঘোরায়। কি যে সে ভাবে, সে-ই জানে।

অনেকটা সময় কাটে। হঠাৎ পালসাহাবের নজরে পড়ে, কাপাসীর জমির এক কোণায় হারাণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ক্ষেপে ওঠে, 'অ্যাই শালা এখানে কী করছিস?'

হারাণ থতমত খেল। কাঁপা গলায় বলল, 'কাপাসী জমিন কুপাইতে পারে না। দুই চার কোপ দিয়াই হাপায়, হয়রান হইয়া পড়ে। তাই—

'তাই কি হয়েছে।' পালসাহাব মুখিয়ে উঠল।

মাথাটা নামিয়ে আস্তে আস্তে হারান বলল, 'তাই অর জমিনটা কুপাইয়া দিতে আইছিলাম।'

'হারামী, নালায়েক কাঁহাকা! রসিক শীলের জমিন থেকে আমি দেখেছি, কতক্ষণ ধরে শালে তুই কাপাসীর কাছে ঘুরঘুর করছিস। আওরতের গায়ের গন্ধ না পেলে দিলে ফুর্তি লাগে না! যাও কুত্তা, আপনা কাম কর। আপনা জমিন বানাও।'

মুখখানা কাচুমাচু করে নিজের জমিতে গিয়ে নামল হারাণ।

আর কাপাসীর হাসি আরো তীব্র হতে লাগল। শরীরটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, 'আমার উপকারী বান্ধব জমিন কুপাইয়া দিতে চায়! ঠিক করছস পালসাহাব, অরে খেদাইয়া দিছস। অত উপকার আমার সইব না। হিঃ—হিঃ—হিঃ—'

সন্ধের আগে আগে কাজ বন্ধ করে দিল পালসাহাব।

আজকের মত মাটি কোপানো, জমি চৌরস করা কি জঙ্গল সাফ করা শেষ।

এখন সূর্যটাকে আকাশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আকাশটা জঙ্গলের ওপারে যেখানে ধনুরেখায় নেমে গেছে, এক ঝাঁক সিন্ধুশকুন সেদিকে উড়ে যাচ্ছে।

সবাইকে নিয়ে পালসাহাব ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। গোটা পাঁচেক টিলা, অনেকগুলো চড়াই-উতরাই আর ছোট পাহাড়ী নদী কিলপণ্ড পেরিয়ে ট্রানজিট ক্যাম্প। পেঁছিতে পেঁছিতে রাত হয়ে যাবে।

জমি কোপাতে কোপাতে সেই যে হাসতে শুরু করেছিল কাপাসী সে হাসি এখনও থামে নি। চারপাশের অরণ্য এবং পাহাড়গুলিকে চমক দিয়ে হাসতে হাসতে সে চলেছে।

সবার আগে আগে চলছে পালসাহাব আর হারাণ।

হঠাৎ পালসাহাব ডাকল, 'হারাণ—'

হারাণ মুখে কিছু বলল না। আস্তে আস্তে পালসাহাবের পাশে ঘেঁষে এল।

পালসাহাব আবার ডাকল, 'এই হারাণ—'

হারাণ এবারও নিরুত্তর।

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল পালসাহাব। হারাণের কাঁধে একটা হাত রেখে নিজের দিকে টেনে নিল। সস্নেহ গাঢ় গলায় বলল, 'কি রে কুত্তা, গুস্সা করেছিস?'

'না।' ঘাড় গোঁজ করে এগুতে লাগল হারাণ।

'করেছিস, জরুর গুস্সা করেছিস।'

হারাণ ফিস ফিস করে বলে, 'কার উপুর গোসা হমু পালসাহাব?'

'আমার ওপর।' পালসাহাব বলতে থাকে, 'তোকে কাপাসীর জমিন থেকে ভাগিয়ে দিয়েছি, তাই তোর মেজাজ বিগড়ে গেছে।'

হারাণ জবাব দেয় না। তার পাঁজরে আস্তে একটা গুঁতো মারে পাল-সাহাব। ডাকে 'অ্যাই মুখ তোল।'

'কী?' মুখ না তুলেই বলে হারাণ।

'কাপাসীর সাথ তো তোর অনেক কালের জান-পয়চান, তাই না?'

আধফোটা স্বরে হারাণ কি যে বলে বোঝা যায় না।

পালসাহাব আবার বলে, 'জান-পয়চান না থাকলে এত দরদ হয়! আপনা জমিনের কাম ফেলে কাপাসীর জমিন কোপাতে যাস। সবই সমঝাচ্ছি রে হারাণ, তোর দিলের অন্দরে মহব্বতের খুসবু আছে।'

পালসাহাবের গলাটা কেমন যেন রহস্যময় শোনায়।

'কী যে ক'ন পালসাহাব!' হারাণের গলা শোনা যায় কি যায় না। অদ্ভুত এক লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলে।

পালসাহাব বলে, 'সরমাচ্ছিস (লজ্জা কচ্ছিস) কেন রে! জোয়ান মরদানা জোয়ানীর সঙ্গে মহব্বত করবে, এ তো দুনিয়ার কানুন।' বলতে বলতে হঠাৎ খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল পালসাহাব। একটু পর আচমকা হাসিটা থামিয়ে আবার শুরু করল, 'এই বল না, কাপাসীর সাথ তোর কত কালের জান-পয়চান?'

'দুই বছরের জানাশুনা পালসাহাব। আমরা এক সাথ এক গাড়িতে কইলকাতায় (কলকাতায়) আইছিলাম। দুই বছর এক সাথ শিয়ালদা স্টিশনে কাটাইছি।'

'দু বরষ ধরে মাগীটা হাসছে?'

'হ পালসাহাব, দুই বছর তাকে এমুন হাসতে দেখি।'

'মাগী হাসে কেন?'

'তা ত জানি না পালসাহাব।'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'তা কেন জানবি! বুদ্ধু, নালায়েক, হারামী কাঁহাকা! আপনা পেয়ারের লেড়কী এমন বেতাবিয়ত হাসি হাসে, তুই শালে কুচ্ছু জানিস না!'

একটু দম নেয় পালসাহাব। আবার বলে, 'কাপাসী পাগলী না কি রে হারাণ? ওর বাপ নিত্য তো বলে পাগলী!'

'পাগল না ভাল মানুষ, কাপাসী যে কী, কিছুই জানি না পালসাহাব, কিছুই বুঝতে পারি না।'

'হুঁ—' হুস্ করে বড় রকমের একটা শ্বাস ফেলে পালসাহাব।

হারাণ বলে, 'কাপাসীর কথা তার বাপের কাছে শুনবেন পালসাহাব।'

পালসাহাবের গলাটা এবার বড় শান্ত শোনায়, 'মনে হয়, কাপাসীর বুকে বহুত দরদ, বহুত কষ্ট! লেড়কী বহুত বদ্নসীব (মন্দ ভাগ্য)।' একটু থেমে উদাস স্বরে পালসাহাব বলে, 'নিত্যর কাছে যাব। লেড়কীর জিন্দগীর কথা শুনতে হবে।'

পাহাড়ের চড়াই-উতরাই বেয়ে মানুষগুলো ট্রানজিট ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে চলে।

আর কাপাসীর তীব্র, অবুঝ হাসিটা মাততেই থাকে।

১৩

পুরো দিনটা নেশার ঘোরেই যেন কেটে যায়।

রাত থাকতে থাকতে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে পালসাহাব। তখন মা-তিন পাশের মাচানে ঘুমোতে থাকে।

চেইনম্যান, পাটোয়ারীদের নিয়ে পালসাহাব যখন ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে পৌঁছয়, তখন সকালের প্রথম রোদ সবে রাতের কুয়াশা আর অন্ধকার ছিঁড়তে শুরু করেছে।

এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে সারাটা দিন মেতে থাকে পাল-সাহাব। সকালে ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে তাদের নিয়ে জমিতে যায়। মাটি কোপানো, জমি চৌরস করা, জঙ্গল সাফ করা, ক্যাশ ডোল দেওয়া—এমনি কাজের তদারকিতে দিনটা কাবার হয়ে যায়।

এক দণ্ড এই মানুষগুলোর সঙ্গে না থাকলে উপায় আছে! হয়তো জমি কোপাবে না, মাটি বানাবে না, এমন কি খাবে না পর্যন্ত। হয়ত ট্রানজিট ক্যাম্পের টিলার মাথায় জড়াজড়ি করে ডেলা পাকিয়ে বসে ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকবে।

এই মানুষগুলোর নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। পালসাহাবের ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা। তাই সব সময় পালসাহাবকে এদের তাড়িয়ে ফিরতে হয়। ধমকে চিল্লিয়ে খিস্তিখেউড় করে চালাতে হয়।

দুপুরেও ঝুপড়িতে ফিরতে পারে না পালসাহাব। এদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নেয়।

জমির কাজ চুকিয়ে, মানুষগুলোর খাওয়ার পর্ব শেষ করে, উদ্ধবকে দিয়ে গান-বাজনা করিয়ে যখন ঝুপড়ির দিকে পালসাহাব ফিরে যায়, তখন সমস্ত দ্বীপ জুড়ে স্তরে স্তরে কুয়াশা নামতে থাকে। অরণ্য নিঝুম হয়ে যায়, রাত্রি গভীর এবং ঘন হতে থাকে।

আজও অনেকটা রাত হয়ে গেল। এখন হাওয়াই বুটির ঝোপে ঝিঁঝিঁদের একটানা বিষণ্ন বিলাপ চলছে। জঙ্গলের মাথায় নাম-না-জানা বুনো পাখি-গুলি ককিয়ে ককিয়ে মরছে।

আজকের কুয়াশা অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি গাঢ়। তা ছাড়া দক্ষিণ দিক থেকে মৌসুমী বাতাস ছুটেছে।

ঝুপড়ির সামনের সেই খাদটার কাছে এসে পালসাহাব ডাকাডাকি শুরু করল, 'এ মা-তিন, মা-তিন—'

অন্য দিন দু তিন ডাকেই জবাব মেলে। আজ অনেক চিল্লাচিল্লি করল পালসাহাব, মা-তিনের সাড়া না পেয়ে অশ্রাব্য খিস্তি করল। তারপর বিড় বিড় করে বকতে বকতে অন্ধকারেই খাদটা পেরিয়ে ঝুপড়িতে এসে ঢুকল।

তাজ্জবের ব্যাপার।

ঝুপড়ির ভিতর লণ্ঠন জ্বলছে। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা ঢুকিয়ে পাটা-তনের উপর বসে রয়েছে মা তিন। তার চাপা কুতকুতে চোখদুটো ঝিকঝিক করে জ্বলছে।

পালসাহাব ভেবেছিল, মা-তিন বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে। লণ্ঠন জ্বালিয়ে তাকে বসে থাকতে দেখে খানিকটা ফুটন্ত রক্ত মাথায় চড়ে বসল পালসাহাবের। সে খেঁকিয়ে উঠল, 'জেগে বসে রয়েছিস! এদিকে ডেকে ডেকে গলা আমার ফেঁসে গেল।'

মা-তিন নড়ল না। হাঁটুতে থুতনি রেখে যেমন বসে ছিল, ঠিক তেমনি বসে রইল। একটা কথাও বলল না। শুধু তার চোখ দুটো জ্বলতেই লাগল।

পালসাহাব গর্জে উঠল, 'হারামী আওরত জবাব দিচ্ছিস না কেন? জেগে বসে রয়েছিস, তবু লালটির (লণ্ঠন) নিয়ে আমাকে পথ দেখাতে গেলি না! তুই ভেবেছিস কী? খাদে পড়ে যদি আমার হাড্ডি ভাঙত!'

এবার কথা বলে মা-তিন। গলাটা তার অদ্ভুত শোনায়, 'হাড্ডি ভাঙলে ভালই হত, আমার দিল খোশ হত। তবু তুই ঝুপড়িতে থাকতি, আমার আঁখের সামনে

থাকতি।' একটু দম নেয় মা-তিন। পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'এখন তো তামাম দিন রিফুজী লোকদের নিয়ে মেতে থাকিস। আমার কথা ভুলে যাস।'

পালসাহাব চেঁচাল, 'এ নোকরি। নোকরি না করলে কী খাবি শালী?'

অবুঝ গলায় মা-তিন বলে, 'নোকরি উকরি আমি বুঝি না। সেই সুবেতে (সকালে) বেরিয়ে যাস, ফিরিস মাঝ রাতে। আমি একা একা ঝুপড়িতে থাকতে পারব না।'

কিছুক্ষণ মা তিনের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল পালসাহাব। তারপর খিঁচিয়ে উঠল, 'নোকরি উকরি ছেড়ে ঝুপড়ির অন্দর থাকব। দিনরাত তোর গায়ের গন্ধ শুঁকব আর মহব্বতের মিঠা মিঠা কথা বলব। কি রে হারামী, এই তো তোর মতলব?'

পাটাতন থেকে উঠে আসে মা তিন। পালসাহাবের বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ায়। গাঢ় গলায় বলে, 'হাঁ, এই আমার মতলব।'

'পন্দর সাল মহব্বতের মিঠা কথা শুনিয়েছি, কত পেয়ার করেছি, তবু তোর তিয়াস মেটে না?'

'না।'

পালসাহাব ভাবতে চেষ্টা করে, পনের বছর একসঙ্গে থেকে এত পেয়ার মহব্বতের কথা শুনে, এত আদর এত সোহাগ ভোগ করেও অরুচি ধরে না মা-তিনের, এতটুকু বিতৃষ্ণা আসে না। মেয়েমানুষটার খাঁই কত?

পনের বছর ধরে মা-তিনের দেহের মনের সব দাবীই পূরণ করে আসছে পালসাহাব। তবু তার আশ মেটে না!

এতকাল মা-তিনকে নিয়েই আকণ্ঠ মজে ছিল পালসাহাব। ছোট একটি ঝুপড়ি, ছোট একটি নোকরি, মা-তিন, ছোট ছোট সুখ, ছোট সোহাগ আর আনন্দে বিভোর হয়ে ছিল। পৃথিবীর কোন দিকে মুখ তুলে তাকাবার ফুরসতই ছিল না পালসাহাবের। তার আধা বর্বর হৃদয় জুড়ে, চোখ জুড়ে যে ছিল সে মা-তিন। সারা দুনিয়াকে এক পাশে সরিয়ে মা-তিনকে নিয়ে এই দ্বীপে পনেরটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে পালসাহাব। মা-তিনকে নিয়েই বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারত সে। কিন্তু সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল।

আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে গার্ডের কাজ করত পালসাহাব। সেটা ছেড়ে রিফিউজি সেটেলমেণ্টে ঢুকেছে। এই সেটেলমেণ্টের কাজ নেবার পর থেকেই জীবনটা ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছে পালসাহাবের। আশ্চর্য জীবন-রসিক হয়ে উঠেছে সে।

এতকাল পালসাহাবের যে মহব্বত একটি মাত্র নারীকে ঘিরে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, আজকাল সে মহব্বতটাই অসংখ্য মানুষের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। পালসাহাবের সমস্ত উদ্যম, উৎসাহ আর প্রাণশক্তি মা-তিনকে ডলে-পিষে আর

সোহাগ জানিয়ে একদিন হয়ত ফুরিয়ে যেত। সেই প্রাণশক্তিটা এখন হাজার হাজার মানুষের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। অসংখ্য মানুষকে ভালবাসার মধ্যে অদ্ভুত এক নেশা আছে। সেই নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে পালসাহাব।

বহু মানুষের ভেতর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে বলে মা-তিনের কথাটা আজকাল তেমন মনে থাকে না পালসাহাবের। উপনিবেশ তৈরীর কাজে সারাদিন এত ডুবে থাকে যে ঝুপড়িতে ফেরার কথা প্রায়ই ভুলে যায়।

হাজার হাজার মানুষ পেয়েছে পালসাহাব। নিজেকে তাদের মধ্যে অকৃপণ হাতে ঢেলে দিতে পেরেছে। কিন্তু মা-তিন পেয়েছে কী? মা-তিন কিছুই পায় নি, বরং তার নিজস্ব বলতে যা কিছু তার সবই হারাতে বসেছে। পনের বছর ধরে পালসাহাব নামে একটি মাত্র পুরুষকে নিয়ে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে মা-তিন। পালসাহাব ছাড়া আর কোন মানুষের এতটুকু ভালবাসা সে কোনদিন পায় নি। এজন্য তার আপসোস নেই, দুঃখ নেই, বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। পালসাহাবের মহব্বত এত প্রবল, এত প্রখর, এত অপর্যাপ্ত যে পুরো পনের বছর ভোগ করেও তা ফুরোতে পারে নি মা-তিন। কোনদিন তা পুরনো হয় নি; সব সময় মনে হয়েছে, তা তাজা এবং সতেজ।

পালসাহাব আজকাল তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সারাদিন কতটুকু সময়ই বা তাকে কাছে পায় মা-তিন? রাত থাকতে থাকতেই ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে মাঝ রাতে।

এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলো তার কাছ থেকে পালসাহাবকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এ জন্য ভয়ানক রাগ হয় মা-তিনের, আক্রোশ হয়, ভয় হয়। বিচিত্র এক যন্ত্রণা তাকে দিনরাত আচ্ছন্ন করে রাখে।

মা-তিন আর পালসাহাব পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। একসময় মাতিনই শুরু করল, 'তামাম দিন তুই রিফুজীদের সঙ্গে সঙ্গে কাটাস।'

পালসাহাব বলল, 'তবে কি তোর সাথ সাথ থাকব?'

'হাঁ, জরুর—'

'কভী নেহী—' পালসাহাব চিৎকার করে উঠল, 'পন্দর সাল তোর গায়ের গন্ধ শুঁকছি। আর পারব না। কভী নেহী। আমার দুসরা কাম আছে, বহুত ভারী কাম। এই জাজিরাতে (দ্বীপে) নয়া মানুষ এসেছে, নয়া জিন্দগী বানাচ্ছে। সেই আদমীগুলোর সাথ সাথ থাকব, না তোর সাথ থাকব রে হারামী?'

'পন্দর সাল আগে সেই কথাই তো ছিল। সেই ভরসাতেই তো তোর কাছে রয়েছি। ইয়াদ হয় না, কী কথা দিয়েছিলি?'

'হয়, হয়। সবই ইয়াদ হয়। লেকিন আর পারব না। পন্দর সাল পেয়ার করেছি। এখনও তোর খাঁই মিটল না!' পালসাহাব বলতে থাকে, 'তুই কী আমার শাদি-করা আওরত যে, তামাম জিন্দেগী পেয়ার করতে হবে?'

'কী বললি—' মা-তিন ফুঁসে উঠল। চাপা কুতকুতে চোখ জোড়া ধক্ ধক্ করতে লাগল। ক্রুদ্ধ বুকটা ফোঁসানির তালে তালে ওঠানামা করছে। ধাঁ করে বাঁশের বেড়া থেকে একটা বর্মী দা টেনে বাগিয়ে ধরল সে। সামনে চিল্লাতে লাগল, 'নিকালো শালে, আভি নিকালো—'

মা-তিনের ভয়ানক চেহারাটা দেখে এমন যে দুর্দান্ত পালসাহাব, তার বুকের মধ্যটা কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত অসহায় ভীত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল পালসাহাব। তারপর গুটি গুটি পিছু হটতে হটতে ঝুপড়ির বাইরে এসে পড়ল।

ভিতর থেকে ঝাঁপটা টেনে বন্ধ করে দিল মা-তিন।

রাত আরো বেড়েছে। অন্ধকার আর কুয়াশা পাল্লা দিয়ে গাঢ় হতে শুরু করেছে। এখন এই দ্বীপের কিছুই স্পষ্ট নয়। নিরেট অন্ধকার ফুঁড়ে দৃষ্টি চলে না। পাহাড়, জঙ্গল, আকাশ—এই দ্বীপের সব কিছুই ঘন কুয়াশায় অবলুপ্ত।

ঝুপড়ির ভিতর অস্থির পায়ে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে মা-তিন। বাঁশের পাটাতনটা মচমচ করছে। ঝুপড়িটা দুলছে।

মা-তিন দাপায় আর অদ্ভুত শব্দ করে কাঁদে। মাঝে মাঝে কান্না থামিয়ে ফোঁসে, 'হারামীর বাচ্চা, শালে দুশমন, পন্দর সাল পরে এখন বলছে আমি ওর শাদি-করা আওরত না! আরে কুত্তা, শাদি-করা আওরত কি আমার চেয়ে বেশি সুখ দিত? বেশি মহব্বত দিত? বেইমান—' এক সময় ফোঁপাতে শুরু করে মা-তিন।

ঝুপড়ির বাইরে একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে পালসাহাব। এখন বুঝি বা তার দুঃখই হচ্ছে। মা-তিনকে এমন করে না বললেই হত। মেয়েমানুষটার দিল ভরা গোসা। একটুকুতেই ক্ষেপে ওঠে।

কিন্তু কি করবে পালসাহাব? মেজাজটা আজ তার বশে ছিল না। সারাটা দিন এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে সে জমি কুপিয়েছে, মাটি চৌরস করেছে, বনতুলসী আর জলডেঙ্গুয়ার ঝোপ সাফ করেছে। সারা দিন পর হয়রান হয়ে, প্রাণশক্তির অনেকখানি অপচয় করে একটু শান্তি, একটু বিশ্রামের আশায় মা-তিনের কাছে এসেছিল পালসাহাব। রোজই সেটেলমেণ্টে যে উদ্যম যে উৎসাহ সে খরচ করে, মা-তিনের কাছে এসে তা আবার পূরণ করে নেয়।

আজ খাদটার কাছে এসে ডেকে ডেকে গলা ফাটাল পালসাহাব। তবু যখন মা-তিনের সাড়া মিলল না, তখনই মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফুটন্ত রক্ত সরাসরি তার মাথায় চড়ে বসেছিল।

জঙ্গল ফুঁড়ে মৌসুমী বাতাস ছুটছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথা জুড়িয়ে গেছে। পালসাহাব উঠে দাঁড়াল।

এখন ঝুপড়িতে কোন শব্দ নেই। মা-তিনের দাপাদাপি এবং চিৎকার থেমে গেছে।

ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপের ফাঁকে চোখ রাখল পালসাহাব। লণ্ঠনটা জ্বলছে। পাটাতনের উপর আলুথালু হয়ে পড়ে রয়েছে মা-তিন। রুক্ষ চুলগুলি লুটোচ্ছে। বুকের উপর একটা উড়নি ছিল, সেটা খসে পড়েছে।

দেহটা তির তির করে কাঁপছে। এতক্ষণ শব্দ করে ফোঁপাচ্ছিল মা-তিন। এখন ফোঁপানিটা থেমে গেছে। অনেকক্ষণ পর পর জোরে জোরে এক একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সে। বড় অসহায় দেখাচ্ছে মেয়েমানুষটাকে।

দেখতে দেখতে বুকের মধ্যটা কেমন যেন করে উঠল। কণ্ঠার কাছে অসহ্য এক ব্যথা, অদ্ভুত এক কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। মা-তিনের জন্য জীবনে এই দ্বিতীয়বার কষ্ট বোধ হচেছ পালসাহাবের, কান্না পাচেছ।

মা তিনের জন্য আরো একবার কষ্ট হয়েছিল পালসাহাবের। কিন্তু সে সব পনের বছর আগের কথা।

আস্তে আস্তে পালসাহাব ডা ল, 'মা-তিন, এ মা-তিন—'

মা-তিন জবাব দিল না।

গভীর গলায় পালসাহাব আবার ডাকল, 'মা-তিন, এ শালী ঝাঁপটা খোল না। খুব যে গুস্‌সা।'

চুপচাপ পড়ে রইল মা-তিন। দেহটা কাঁপছিল। সেই কাঁপুনিটা হঠাৎ বেড়ে গেল। ফুলে ফুলে অনুচ্চ আবছা গলায় ফোঁপাতে লাগল মা-তিন।

পালসাহাব আর ডাকাডাকি করল না। বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসেই থাকল।

চারপাশে গাঢ় কুয়াশা আর অন্ধকার খাড়া খাড়া দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দেওয়ালগুলো ভেদ করে পালসাহাবের দৃষ্টিটা অনেক, অনেক দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

বুকের মধ্যে যে কষ্টটা হচ্ছে কণ্ঠার কাছে যে কান্নাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে, সেই কষ্ট আর কান্না পালসাহাবকে পনের বছর আগের কতকগুলি বেহিসাবী বেপরোয়া দিনের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

এতকাল পরও কিসমত খানকে অবিকল মনে করতে পারে পালসাহাব। ভারতবর্ষের মেনল্যাণ্ড থেকে একই জাহাজে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে তারা এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল।

সাত বছর সাজা খাটার পর সরকারী টিকিট (সেল্‌ফ সাপোর্টার্স টিকেট) পেল কিসমত খান। তারপর এক মঙ্গলবার মেয়ে কয়েদীদের কয়েদখানা রেণ্ডি-বারিক জেলে গিয়ে ম্যারেজ প্যারেডে দাঁড়াল। ম্যারেজ প্যারেড অদ্ভুত এক প্রথা। আন্দামান দ্বীপে পুরুষ কয়েদীদের জন্য যেমন সেলুলার জেল, মেয়ে কয়েদীদের জন্য তেমনি রেণ্ডিবারিক বা সাউথ পয়েণ্ট জেল। পুরুষ কয়েদীরা সরকারী সেলফ্ সাপোর্টার্স টিকেট পাবার পর বিয়ে করার অনুমতি

পেত।

সে আমলে মঙ্গলবার মঙ্গলবার জেলার এবং জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টদের তদারকিতে সাউথ পয়েণ্ট কয়েদখানায় ম্যারেজ প্যারেড হত। ম্যারেজ প্যারেড এক ধরনের বিচিত্র স্বয়ম্বর সভা। পুরুষ আর স্ত্রী কয়েদীরা কাতার দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াত। তারপর যে যার ইচ্ছা মত সাথী পছন্দ করত। বর এবং কনে পরস্পর রাজি হবার পর ডেপুটি কমিশনার বা চীফ্ কমিশনারের অফিসে ছাপানো কাগজে (ম্যরেজ রেজিস্ট্রেশন ফর্মে) টিপছাপ দিয়ে বিয়েটা রেজিস্ট্রি করিয়ে নেওয়া হত।

ম্যারেজ প্যারেডে এসে বর্মী জোয়ানী মা-তিনকে পছন্দ করে ফেলেছিল কিসমত খান। কিসমত খানের মাংসল গর্দান, খাড়া চোয়াল, মজবুত জোয়ান চেহারাটার দিকে তাকিয়ে মা-তিনের চাপা কুতকুতে চোখজোড়া মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মা-তিনকে বিয়ে করে শাদিপুরে চলে গেল কিসমত খান।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে একই সঙ্গে একই দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে পাল-সাহাব আর কিসমত খান এসেছিল। এত বছর এক সঙ্গে কয়েদ খেটে, হুইল ঘানি ঘুরিয়ে, রশবাস ছেঁচে, সড়কের পাথর ভেঙে, ফুসফুসে একই সমুদ্রের নোনা বাতাস টেনে দুজনের মধ্যে যা গড়ে উঠেছিল, তা হল পাকা দোস্তি।

শাদিপুরের কুঠিতে মা-তিনকেই শুধু তুলল না, পালসাহাবকেও জবরদস্তি করে নিয়ে গেল কিসমত খান।

পাঠান কিসমতের রক্তে খানিকটা আদিমতা ছিল। তার রুচি অদ্ভুত। বিশেষ করে স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার মনোভাব ছিল আশ্চর্য বন্য, হিংস্র। রাত্রে চুটিয়ে মদ গিলে শাদিপুরের কুঠিতে ফিরত। আর ফিরেই মা-তিনকে নিয়ে পড়ত।

কুঠিতে মার্বেল কাঠের নিরেট একটা ডাণ্ডা ছিল। সেটা দিয়ে মা-তিনকে উন্মাদের মত পিটত কিসমত। যতক্ষণ না তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত ছুটত, হাড় চুরচুর হয়ে যেত, যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ত, ততক্ষণ ছাড়ত না কিসমত খান।

পাশের ঝুপড়িতে দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকত পালসাহাব। এক একদিন অসহ্য হলে ছুটে আসত। কিসমতের গর্দান ধরে বাইরে বার করে চিল্লাত, 'শরাবী হারামী, আওরতটাকে পিটিয়ে পিটিয়েই এক রোজ খতম করে ফেলবে।'

'হাঁ-হাঁ জরুর, শালীকে একরোজ খতম করবই।' খ্যা খ্যা করে হেসে উঠত কিসমত খান! জড়ানো জড়ানো মাতাল গলায় বলত, 'ওটাকে কোতল করতে পারলে আমার দিল খুশ হবে।'

পালসাহাব ধমকে উঠত, 'চোপ শালে, বেদরদী দুশমন।'

পালসাহাবের খিস্তি গ্রাহ্যেই আনত না কিসমত খান। নিজের খেয়ালেই বলে যেত, 'আওরত লোগদের না পিটলে সজুত থাকে না। একরোজ দেখবি হাতের কব্জা থেকে ছুটে যাবে।'

যে সময় কিসমত খান নেশার ঘোরে থাকত না, সে সব সময় তাকে বোঝাত পালসাহাব, 'বেফায়দা মা-তিনের জান চুরচুর করিস কেন? আওরতটা তো বহুত আচ্ছা। বদমাস না, বেয়াদপ না, বেতাবিয়ত না। তোর জন্যে ওর দিলে বহুত পেয়ার।'

কিসমত জবাব দিত না। ডাইনে এবং বাঁয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে কি যে বোঝাত, সে-ই জানে।

পালসাহাব আবার বলত, 'শাদি করেছিস, আওরতটাকে থোড়া পেয়ার কর।'

পাঠান কিসমত অস্থির হয়ে উঠত, 'দ্যাখ ইয়ার, আমাদের পাঠান মুলুকে এক কানুন আছে। কানুনটা বহুত আচ্ছা'।

'কী কানুন?'

'জেনানা যতই পেয়ারী হোক, যতই খুবসুরতী হোক, যতই বেকসুর বেগুণাহ্ হোক, মরদরা তামাম দিন কাজের পর রাতে কুঠিতে ফিরে একবার পিটবেই।'

'কেন?'

কিসমত বলত, 'এতে জেনানার দিল কুঠিতে থাকে। না হলে শালীরা চিড়িয়ার মাফিক দুসরা মরদের পিছে উড়তে চায়।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করত। গলাটা তার সাংঘাতিক শোনাত তখন, 'দ্যাখ দোস্ত, মুলুকে থাকতে আমাদের কানুন তুড়ে আমার আওরতকে পেয়ার করেছিলাম। দিল মুচড়ে সবটুকু মহব্বত তাকে দিয়েছিলাম। অন্য মরদানার মাফিক রাতে ফিরে আমি তাকে পিটতাম না, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতাম। লেকিন—'

'লেকিন কী?'

'লেকিন শালী আমার দিল তুড়ে দিয়ে গেল। আমার পেয়ারের দাম কেমন করে পেয়েছিলাম, জানিস?'

'কেমন করে?'

'এক রোজ কাজ থেকে ফিরে দেখলাম কুঠি ফাঁকা। শুনলাম, শালী গাঁওয়ের ছট্টু খানের সাথ ভেগেছে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী? সাত রোজ তাদের খুঁজলাম। আমাদের গাঁওয়ের পর তিনটে পাহাড়, ছোট একটা নদী। তার পরে এক শহর। শহরে গিয়ে দুটোকে খুঁজে পেলাম। এক সাথ দুটোকেই কোতল করে দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে এই জাজিরাতে এলাম।'

পালসাহাব চুপচাপ শুনে গিয়েছিল। একটা কথাও বলে নি।

কিসমত খান থামে নি, 'বুঝলি দোস্ত, দুনিয়ার কোন আওরতকেই আমি বিশোয়াস করি না। এক মরদে কোন শালাই খোশ না। শালীরা শাদি করে এক মরদকে, আর বিশটা মরদ ছুপকে ছুপকে পোষে।'

'ঝুট।' পালসাহাব গর্জে উঠেছিল।

'না, সচ্।'

এর পর কিসমত খান যা বলেছিল, তার মধ্যে প্রচুর খিস্তি এবং খেউড় মিশে ছিল। সে সব বাদ দিলে যা দাঁড়ায় তা হল, দুনিয়ার তাবত স্ত্রীলোকের মধ্যে কেউই সৎ নয়, সবাই নষ্ট, বদ, দুশ্চরিত্র।

জীবনে একবার ঘা খেয়েই একটা অটুট সত্যে পেঁছে গেছে কিসমত খান। সেটা থেকে কোনমতেই তাকে সরানো যাবে না। সে সার বুঝেছে পৃথিবীর কোন মেয়েমানুষকেই বিশ্বাস করতে নেই।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ট্রান্সপোর্টের কাজ সেরে মদ খেয়ে প্রতি রাত্রে কুঠিতে ফিরত কিসমত খান। নিয়ম করে মার্বেল কাঠের ডাণ্ডটা দিয়ে মা-তিনকে পিটত, আর চিল্লাত, 'পিটিয়ে পিটিয়ে তোর জান লবেজান করে দেব। তোকে সাবাড় করে আর একটা শাদি করব। যতগুলো আওরত পাব, সবগুলোকে খতম করব। শালী হারামীর পাল।'

একটা মেয়েমানুষ তাকে ঠকিয়েছে। তাই দুনিয়ার সব মেয়েমানুষের উপর কিসমতের আক্রোশ।

অনেক বুঝিয়ে, ধমকে ধমকে, কোনমতেই পাঠান কিসমতের স্বভাবটা শোধরাতে পারে নি পালসাহাব। কিসমত যখন মা-তিনকে ঠেঙাত, পাশের কুঠরিতে হয় দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকত সে, নইলে বেরিয়ে যেত। মা-তিনের জন্য অদ্ভুত এক কষ্ট বিচিত্র এক দুঃখবোধ বুকের মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠত পাল সাহাবের।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল।

সেদিন মাত্রা ছাড়িয়ে মদ গিলে এসেছিল কিসমত খান। মারটাও এমন বেহিসাবী হয়েছিল, যার ফলে তিন দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল মা-তিন।

আজও হুবহু মনে করতে পারে পালসাহাব। সেদিন কিসমতের হাত থেকে ডাণ্ডাটা ছিনিয়ে নিয়ে কিল-ঘুষি-লাথি মারতে মারতে তাকে ঘরের বাইরে বার করে দিয়েছিল।

পাল সাহাবের মার খেতে খেতে কিসমত গোঙাচ্ছিল, 'আমার জেনানাকে আমি মারি, কাটি, কোতল করি, তোর কিরে শালা? কুত্তিটার জন্যে তোর যে বহুত দরদ, বহুত পেয়ার—'

'হাঁ রে কুত্তা,—দরদ—'

কিসমত খান খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'অতই যখন পেয়ার তখন কুত্তিটাকে নিয়ে

িনলেই পারিস। লে লেও শালীকো।'

ফস করে পালসাহাব বলে ফেলেছিল, 'জরুর লে লেগা। তোর মাফিক হারামীর কাছে মা-তিনকে আর রাখব না।'

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে সমস্ত কিছুই সৃষ্টিছাড়া।

সৎ সুস্থ ভদ্রমানুষের পৃথিবীতে যে নিয়মে জীবন বয়ে চলে, এখানে সে নিয়ম গ্রাহ্য নয়। এখানকার নিয়ম, কানুন—সব কিছুই আলাদা। যে রীতিতে ভদ্র মানুষ জীবনের কথা ভাবে, জীবনের মূল্য কষে, সেই রীতির সঙ্গে এই দ্বীপের বাসিন্দাদের রীতি আদৌ মেলে না, আদৌ খাপ খায় না।

সেদিন মদের ঘোরে মা-তিনকে পিটেছিল কিসমত খান, মদের ঘোরেই মা-তিনকে পালসাহাবের হাতে বিলিয়ে দিয়েছিল। পালসাহাবও নিজের নিয়মে তার ন্যায় এবং নীতি গড়ে তুলেছিল। যে মা-তিন এত মার খায়, সে কিসমতের বিয়ে-করা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিতে পালসাহাবের নীতিতে এতটুকু বাধে নি।

নেশার ঘোরেই মা-তিনকে তুলে দিয়েছিল কিসমত খান। নেশা ছুটবার পরও একই কথা বলেছে সে, 'শালীকে দিয়ে আমার পোষাবে না। তুই ওকে লিয়ে লে পালসাহাব। এবার দুসরা আওরাত আনব।'

হাসপাতালে তিন দিন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল মা-তিন। হুঁশ ফিরবার পর চোখ মেলেই যাকে সে দেখেছে সে পালসাহাব।

অস্থির, অবুঝ গলায় মা-তিন বলেছিল, 'তুমি পালসাহাব, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি ঐ দুশমন ডাকুটার কাছে আর যাব না। জরুর ও একরোজ আমাকে খতম করে ফেলবে। জরুর—'

গাঢ়, কাঁপা গলায় পালসাহাব বললেন, 'ওর কাছে তোকে যেতে হবে না। তোকে আমি বাঁচাব। কুত্তাটার হাত থেকে জরুর বাঁচাব। আমার জিন্দগীর কসম।'

পালসাহাবের স্বরে আশ্বাস ছিল, দৃঢ়তা ছিল। তার ওপর নির্ভর করা চলে। নিজের জীবনের নামে কসম খেয়ে সে মা-তিনকে বাঁচাবার ভার নিয়েছে।

মা-তিনের দ্বিধা ছিল না, সন্দেহ ছিল না। কোন দিকে নজর দেওয়া কি কোন কিছু ভাবার মত মনের অবস্থাও ছিল না। কিসমতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এক অন্ধ, উন্মাদ ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল।

পালসাহাব যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, চোখ বুজে সেটা চেপে ধরেছিল মা-তিন। সে বাঁচতে চায়।

'মেরিন ডিপার্টমেণ্টে' বার্জ চালাবার কাজ করত পালসাহাব। 'মেরিনে'র কাজ ছেড়ে 'ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে' চাকরি নিল সে। তারপর একদিন মা-তিনকে নিয়ে মিড্‌ল্ আন্দামানের লং আইল্যাণ্ডে চলে গেল। সেখানে যাবার আগে মা-তিন কতকগুলো শর্ত করিয়ে নিয়েছিল। পুরো হৃদয়টা তাকে দিতে

হবে। কিসমত খানের মত সে ঠেঙাতে পারবে না। অন্য স্ত্রীলোকের দিকে নজর দেওয়া চলবে না। মা-তিনকে নিয়েই তাকে সুখী থাকতে হবে। মা-তিনের দিল-মর্জি, জান-জিন্দগী, সব সময় খুশি রাখতে হবে। কিসমতের কাছে যা পায় নি, সেই অগাধ ভালবাসা এবং অঢেল সোহাগ পালসাহাবের কাছ থেকে আদায় করে নেবে মা-তিন।

এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল পাল সাহাব।

লং আইল্যাণ্ডে আসার পর পনেরটা বছর পার হয়ে গেছে।

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা গুঁজে ঝিম মেরে বসে ছিল পালসাহাব।

রাত আরো গাঢ় হয়েছে। বাতাসে হিম হিম ভাবটা আরো ঘন হয়েছে। সামনে কুয়াশা আর অন্ধকার দিয়ে গাঁথা দেওয়ালটা আরো নীরেট হয়েছে। সেই দেওয়ালটাকে আলোর ছুঁচের মত বিঁধে বিঁধে জোনাকি জ্বলছে।

পালসাহাব অন্ধকার দেখছিল না, কুয়াশা দেখছিল না, এমন কি জোনাকিও না। তার চোখ দুটো অনেক, অনেক দূরে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

ঝুপড়ির ভেতর মা-তিন বুঝি পাশ ফিরল। ক্যাঁচা বাঁশের পাটাতন মচ মচ করে উঠল।

হাঁটুর ফাঁক থেকে থুতনিটা তুলে খাড়া হয়ে বসল পালসাহাব।

এবার মা-তিনের অনুচ্চ বিষণ্ণ এবং কেমন এক ধরনের ভোঁতা কান্না মেশা দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কান পেতে মা-তিনের ফোঁপানি শুনল পালসাহাব।

হঠাৎ একসময় ঝুপড়ির মধ্যেকার সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

কখন যে পালসাহাবের ঘাড়টা হাঁটুর উপর কাত হয়ে পড়েছিল, কখন যে ঘুমের আঠায় চোখ জুড়ে এসেছিল, হুঁশ ছিল না।

মা-তিনের ঠেলাঠেলিতে ধড়মড় করে উঠল পালসাহাব। চোখ ডলতে ডলতে বলল, 'কৌন, কৌন রে ?'

মা-তিন খেঁকিয়ে উঠল, 'কৌন আবার ? এত রাতে কোন্ রিস্তাদার আসবে ? আমি—আমি—'

পালসাহাব কিছু বলল না। মাথা খাড়া রাখতে পারছে না সে। ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

এবার মা-তিন পালসাহাবের চুলের মুঠি পাকিয়ে ধরল। তারপর খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এ শয়তান, অন্দর চল। ঠাণ্ডায় বুখার (অসুখ) ধরলে আমাকেই তো ভুগতে হবে। না তোর শাদি-করা সাত জন্মের আওরত এসে ভুগবে ? চল—'। মা-তিন পালসাহাবের চুল ঝাকাতে লাগল।

মা-তিনের কাঁধে ভর দিয়ে ঝুপড়িতে ঢুকল পালসাহাব। ঢুকেই সরাসরি

বছানায় গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নাক থেকে ভোঁস ভোঁস আওয়াজ বেরুতে শুরু করল।

এক মুহূর্ত পাল সাহাবের রকম সকম দেখল মা-তিন। তার চাপা, কুত-কুতে চোখজোড়া ঝিক ঝিক করে জ্বলতে লাগল। চাপা তীব্র গলায় সে ডাকল, পালসাহাব, এ পালসাহাব—'

পালসাহাব সাড়া দিল না। সমানে তার নাক ডাকতে লাগল।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মা-তিন। তারপর হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঁচড়ে, কামড়ে, খিমচে, লাথি মেরে পালসাহাবকে ফালা ফালা করে ফেলল।

মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেল। লাফ মেরে উঠে বসল পালসাহাব। তাকে ফালা ফালা করে হাঁপাতে শুরু করেছে মা-তিন। বুকটা নিশ্বাসের তালে তালে জোরে জোরে ওঠানামা করছে। কপালে, থুতনিতে কণা কণা ঘাম দেখা দিয়েছে।

পালসাহাব তাজ্জব বনে গেছে। বিমূঢ়, কিছুটা বা ভীত। বিহ্বল গলায় সে বলল, 'এমন করছিস কেন?'

টেনে টেনে মা-তিন বলতে লাগল, 'তোকে কি ঘুমোবার জন্যে ঝুপড়ির ভেতর ঢুকিয়েছি? হারামজাদা কাঁহাকা—'

'তবে কী জন্যে?'

এবার এক কাণ্ডই করল মা-তিন। পালসাহাবের পাশে ঘন হয়ে বসল। ঢ় নরম গলায় বলল, 'কাছে আয়।'

'কি?'

'তুই আগের মত আমাকে আর পেয়ার করিস না।'

'ঝুট্।'

'সচ্।'

'কভী নেহী।'

অনেক সময় গলায় স্বরে আর মুখেচোখে মনের ছায়া পড়ে। পালসাহাবের রটা বুঝতে চেষ্টা করল মা-তিন। আড়চোখে তার মুখটা দেখতে লাগল।

পালসাহাবের মুখে কোন ছায়া পড়েছে? ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মা-তিন। সে বলল, 'সচ্ই যদি পেয়ার করিস, তবে তামাম দিন আমাকে ঝুপড়িতে ফেলে রেখে যাস কেন?'

'কোথায় রেখে যাব?'

'কোথাও রাখতে হবে না। আমাকে তোর সাথ নিয়ে যাবি।'

'তুই যাবি?' কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না পালসাহাব। অবাক হয়ে মা-তিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মা-তিন বলল, 'আমিও তোর সাথ যাব। তোর সাথ কাম করব।'

'সচ্!' পালসাহাবের চোখ দুটো অস্বাভাবিক চক চক করতে লাগল।

শান্ত গলায় মা-তিন বলল, 'সচ্, জরুর সচ্।'

উম্মাদের মত মা-তিনকে দু হাতে জাপটে ধরল পালসাহাব। চোখা চোখা দাড়িভরা মুখটা তার নরম গালে ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল, 'কালই তোকে কলোনিতে নিয়ে যাব।'

'ছাড়, ছাড়—'

মা-তিন চিল্লাতে থাকে। পালসাহাব ছাড়ে না। বরং তার দেহটা একপিণ্ড তলতলে নরম কাদার মত বুকের কাছে তুলে নিয়ে যেন ছানতে থাকে।

এক সময় মা-তিনের চিল্লানো থামে। অদ্ভুত এক সুখে চোখ দুটো তার বুজে আসে। চোখ বুজেই পালসাহাবের প্রবল প্রখর সাংঘাতিক সোহাগ ভোগ করতে থাকে মা-তিন।

এখন একবার যদি মা-তিনের মুখের দিকে তাকাত পালসাহাব—দেখতে পেত, মা-তিনের ঠোঁটে সূক্ষ্ম, ধূর্ত, দুর্বোধ্য এক হাসি ফুটে আছে।

১৪

তিলির স্বামী হরিপদ বারুই কিছুই আনতে পারে নি। না বলতে কিছুই না। না জমিজমা, না বিত্ত ব্যাসাদ, না সোনাদানা, কিছুই না। এমন কি নীরোগ একটি দেহ, উজ্জ্বল পরমায়ু কি সুস্থ একটি মন—তাও না। সব খুইয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে হরিপদ। সুখ আনন্দ খুশির স্বাদ কবেই ভুলে গেছে সে।

আজকাল ট্রানজিট ক্যাম্পের মাচানে শুয়ে শুয়ে দিনরাত হাঁপায় হরিপদ। হাঁপানির টানটা যখন বাড়ে, কাশতে কাশতে দেহটা ধনুকের মত বেঁকে দুমড়ে যায়। শুকনো জিরজিরে বুকের হাড়গুলো মট মট করতে থাকে; বুঝিবা ভেঙেই যাবে। চোখের ডেলা দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ে। হাজার চেষ্টা করেও কাশিটাকে দাবাতে পারে না হরিপদ।

কাশির দমকটা যখন কমে আসে, ক্লান্তিতে অবসাদে নির্জীব হয়ে পড়ে হরিপদ। চোখ দুটো আপনা থেকেই বুজে আসে। গলার মধ্য দিয়ে অনুচ্চ ঘড়ঘড়ে গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরুতে থাকে। তখন মাছের মত হাঁ করে শ্বাস নেয় হরিপদ। শ্বাস নেবার তালে তালে অশক্ত দুর্বল দেহটা তোলপাড় হতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের ওপারে সেই পদ্মা-মেঘনার দেশ থেকে কিছুই আনতে পারে নি, কিন্তু রুগ্ন বিষাক্ত ভয়ানক একটা মন নিয়ে এসেছে হরিপদ। আর সেই মনের ভেতর পুরে এনেছে একটা সাংঘাতিক বাতিক, যার নাম সন্দেহ। পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস করে না হরিপদ। বিশ্বাস করার মত মনের জোর এবং সাহস তার নেই।

হরিপদর সব চেয়ে বেশি সন্দেহ তিলির ওপর।

হাঁপানি আর নানা ধরনের আধিব্যাধি দেহের মতই তার মনটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। সহজ স্বাভাবিক সুস্থ—এমন কোন কিছুই সে ভাবতে পারে না। দিবারাত্রি শুয়ে শুয়ে বিড় বিড় করে। কি যে সে বকে যায়, কে তার হদিস দেবে। মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে কাঁদে। অসুস্থ, অস্বাভাবিক, ভাঙা ভাঙা এক ধরনের শব্দ বেরোয়।

এই দ্বীপে হরিপদকে কেউ কোনদিন হাসতে দেখে নি।

সেই বিকেল থেকে পাখিটা ডাকছে।

কখনও তীব্র অবুঝ, কখনও মৃদু অথচ তীক্ষ্ন। এক এক সময় ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলাতেও ডেকে উঠছে পাখিটা।

কী পাখি ওটা? একবার হরিপদর মনে হল, এই দ্বীপেরই কোন সাগর-পাখি, যার নাম সে জানে না। একবার মনে হল ভীমরাজ পাখি। অনেক-ক্ষণ ডাকটা শুনেও হরিপদ ঠিক করতে পারল না, পাখিটা কোন জাতের? কোন নামের?

মাচানের উপর উঠে বসল হরিপদ। ট্রানজিট ক্যাম্পের জানালায় চোখ রেখে আঁতিপাঁতি করে খুঁজল। কিন্তু না, পাখিটা দেখা গেল না। ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেটা কোথায় যে ডেকে সারা হচ্ছে, কে জানে।

পাখি খুঁজতে গিয়েই হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল হল হরিপদর। জঙ্গলের মাথার রোদ নিবু নিবু হয়ে গেছে। দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো আবছা হয়ে যাচ্ছে। সাগরপাখিরা সমুদ্রের দিক থেকে দ্বীপে ফিরতে শুরু করেছে।

এক সময় কেউ যেন রোদটুকু গুটিয়ে নিল। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে বিষণ্ণ, ছায়া ছায়া একটা পর্দা নেমে আসতে লাগল।

প্রথমে বিরক্ত, তারপর ক্ষেপে উঠল হরিপদ। সেই সকালে বেরিয়েছে তিলি, এখনও ফিরছে না। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটু পরেই পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

এখনও তিলি কেন ফিরল না? এই চিন্তায় অস্থির হয়ে রইল হরিপদ। তিলির ভাবনাটা ক্রমাগত তার মাথায় চোখা পেরেকের মত ঢুকে যেতে লাগল।

আবছা অন্ধকার গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে হরিপদ বকতে লাগল,

'ঘরে সোয়ামী হাঁপির টানে মরে। মাগীর সেদিকে মন নাই। তর মন যে কুনখানে, আমি জানি। এই ঘরে শুইয়া শুইয়া আমি হগল ট্যার পাই।' বকতে বকতে এক সময় হাঁপানির টান ওঠে। হরিপদ হাঁপায় আর কাশে। কাশতে কাশতে জিভটা আধ হাত খানেক বেরিয়ে পড়ে। কাশির দমকটা একটু কমলে আবার শুরু করে, 'নষ্ট দুষ্ট মাগী। মনে কী মতলব নিয়া এই দ্বীপে আইছস, আমি বুঝি কিছুই বুঝি না! সোয়ামী তর ব্যারামে ভোগে, আর তুই দিন দিন ফোলস (ফুলিস)। কোন্ সুখ তর মনে? সারা দিনে একবারও আমার কাছে আসস না। আমি বাচলাম না মরলাম—তর তাতে কি আহে যায়! সব্বনাশী—'

নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিড় বিড় করে হরিপদ, 'সব্বনাশী, আমারে ঘরের মধ্যে রাইখ্যা নাগর লইয়া ফুর্তি করে। আমি কিছুই বুঝি না, না? আমি আন্ধা হইয়া গেছি? কিছুই আমার চোখে পড়ে না। আমি কালা হইয়া গেছি? কিছুই আমার কানে আহে না? আমি হগল শুনি, হগল দেখি, হগল বুঝি। খালি মুখখান খুলি না। দিন আহুক। এমুন দিন এমুন যাইব না। চিরটা কাল এমুন ব্যারামে ভুগুম না লো মাগী। এট্টু ভাল হইতে দে, তরে আমি সজুত (সিধে) করুম।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'হে ভগবান, মাগীর এত নষ্টামি তুমি সইও না। হে ভগবান—'

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল হরিপদ, তার আগেই তিলি ঝুপড়িতে ঢুকল। তাকে দেখেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল হরিপদ। তিলি গায়ে মাখল না। আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়াল। হরিপদর একটা হাত ধরে বলল, 'কেমুন আছ? হাঁপির টানটা আইজ কম আছে?'

এক ঝটকায় তিলির হাত থেকে নিজের হাতটা ছুটিয়ে নিল হরিপদ। গোঁজ হয়ে বসে রইল সে।

তিলি আবার হাত ধরল। বলল, 'কী হইল? কথা কও না ক্যান?'

হরিপদ ভেংচে উঠল, 'অত সোহাগে কাম নাই।'

'কী কও!' অবাক হয়ে হরিপদর মুখের দিকে তাকাল তিলি।

'কী আবার কই! যা যা মাগী, চোখের সুমুখ থিকা যা। তরে দেখলে পাপ। তর নাম মুখে আনলে পাপ।'

'সোয়ামী হইয়া এমুন কথা কও!' তিলির গলায় বড় দুঃখের স্বর ফোটে।

'হ কই, এক শ' বার কই। যতবার পারি ততবার কই।' হরিপদ হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'অহন তুই যা।'

'কই যামু?'

'সারাটা দিন যে নাগরের লগে কাটাইয়া আইলি তার কাছে যা মাগী।

যা যা—'

তিলি এবার রুখে উঠল, 'মুখে যা আছে, তাই যে কও।'

'হ কই। কইলাম তো, আমার মাথা কাটবি?'

'সারাটা দিন আমি অন্য পুরুষ লইয়া কাটাই?'

'কি করস না করস, তর ধম্ম তর মন জানে। আমি ব্যারামে ভুগি, ঘর ছাইড়া বাইরে যাইতে পারি না। তর কত সুবিধা, কত সুযুগ।' হরিপদ তিলির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'পাচজনের মুখে পাচ কথা শুনি। মুখ বুইজা শুনতে হয়। ঈশ্বর আমারে মারিয়া রাখছে। হগলই কপালের দোষ।' হরিপদ জোরে জোরে কপাল চাপড়ায়।

সেই সকালে পালসাহাবের সঙ্গে জমি কোপাতে বেরিয়েছিল তিলি। দুপুরে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে নাকে মুখে দু চার দলাভাত গুঁজে আবার জমিতে ফিরে গিয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। তার আগেই আগাছা বেছে মাটি কুপিয়ে চৌরস করে রাখতে হবে। তাই সমস্ত দিন জমি তৈরির কাজ চলছে।

সারাটা দিন ক্ষেত কোপাবার পর শরীর আর বশে থাকে না। হাত দুটো যেন যন্ত্রণায় খসে পড়তে থাকে। কোমর খাড়া রেখে দাঁড়াতে পারে না তিলি। কোমরটা বুঝি ছিঁড়েই পড়বে।

সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু জিরোবার আশায় ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে আসে তিলি। এখন দেহটাকে বিছানায় সঁপে দিতে পারলে সে বাঁচে। একটু যে ঘুমোবে, তার কি উপায় আছে!

হরিপদ বলল, 'অখনও খাড়াইয়া আছস! যা যা কুচরিত্তির, মরদচাটা মাগী!

ভাঙা ভাঙা কাতর গলায় তিলি বলল, 'বড় সুখে রাখছ।' অতি দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে তার। সারা দিন পর ট্রানজিট ক্যাম্পে ফিরে হরিপদর গঞ্জনা আর সয় না।

হরিপদর জন্য কি না করেছে তিলি! ধর্ম বল, কর্ম বল, পুণ্য বল, স্বামীই হল সব। স্বামীর মধ্যেই সকল ধর্ম, সকল পুণ্যের সার। সে সারাৎসার। স্বামী ভজলে ভগবান তুষ্ট। স্বামী বিহনে জগৎ অন্ধকার। সকল ঈশ্বরের সেরা ঈশ্বর হল স্বামী। তার জন্য সতী নারী না পারে কী? না করে কী? জ্ঞান হবার পর থেকেই এই সব কথা শুনে আসছে তিলি। শুনতে শুনতে তার মনে একটা সংস্কার গড়ে উঠেছে। এই কারণে হরিপদর সব গঞ্জনা সয়েছে সে। অকাতরে সব দুঃখ মাথায় পেতে নিয়েছে।

হরিপদ কি আজই ভুগছে! হাঁপির টান নিয়েই তিলিকে সে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর একটা দিনও কি তিলির সুখে কেটেছে? সুখ দূরের কথা, একটু স্বস্তিও কি মিলেছে কোনদিন? হাজার চেষ্টা করেও সে কথা মনে করতে পারে না তিলি।

দেশে থাকতে তামাকের ব্যবসা করত হরিপদ। হাটে হাটে ঘুরে চট বিছিয়ে দোকান পাতত। মাখা তামাক, শুখা তামাক, গুড়ো তামাক, পাতা তামাক—হাজার জাতের তামাক বেচত।

তামাকই শুধু বেচত হরিপদ। কিন্তু কাঁচা তামাক শুকিয়ে দিত কে? তামাক দা-কাটা করত কে? তামাকে চিটে গুড় মাখাত কে? সব, সব কিছুই তিলি করত। হরিপদ যে করবে, সে সময় কোথায় তার? শরীরে সে সামর্থ্যই বা কোথায়? ঘরে যতক্ষণ থাকত, বসে বসে হাঁপাত আর কাশত। রোগা জিরজিরে অস্থিসার বুকটার তোলপাড় দেখে বড় মায়া হত তিলির।

হরিপদর মন পাবার জন্য কী না করেছে তিলি? তামাকের কাজ করেছে, তার রোগের সেবা করেছে, আবার সংসারের সব ঝামেলা মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিন্তু হরিপদর মন যে কোথায়, বিয়ের দশ বছর পরও তার খোঁজ পায় নি তিলি। যত দিন গেছে, রোগ যত বেড়েছে, হরিপদর সন্দেহ আর গঞ্জনাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

রোগে দিন দিন কাহিল হয়ে পড়েছে হরিপদ। শরীরটা আরো রোগা, আরো জীর্ণ, আরো কাবু হয়েছে। কিন্তু দিবারাত্রি এত খেটেও, হরিপদর এত কুকথা সয়েও দিনে দিনে অঢেল স্বাস্থ্যে, অফুরন্ত যৌবনে ভরে উঠেছে তিলি। তার সুছাঁদ মুখ, পুষ্ট বুক, কানায় কানায় ভরা দেহ দেখতে দেখতে ক্ষেপে উঠেছে হরিপদ।

তিলির শরীরটা হরিপদর আয়ত্তের বাইরে। হাঁপির টান ভিতরটা এত ঝাঁঝরা করে ফেলেছে যে তিলির অফুরন্ত শরীরের দিকে হতাশ চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া তার উপায়ই বা কী?

তিলির দিকে যখনই তাকায়, যখনই তার কথা ভাবে, হরিপদর মাথাটা গরম হয়ে ওঠে।

ট্রানজিট ক্যাম্পের এই ঝুপড়িটার বাইরে রাত্রি আরো গাঢ় হয়েছে। ফিকে ফিকে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে।

তিলির মত জমি থেকে আর সকলে ফিরে এসেছে। বাইরে তাদের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। সব গলা ছাপিয়ে পালসাহাবের গলাটাই বেশি শোনা যায়।

হরিপদ বিড় বিড় করতে থাকে, 'আমি না বুঝি কী? না দেখি কী না শুনি কী?'

'হ হ তুমি হগলই বোঝ। এইবার এট্টু থাম। আর পাগলামি করে না।'

একদৃষ্টে তিলির দিকে চেয়ে থাকে হরিপদ। সে ভেবেই পায় না, এত যে দুঃখ, এত যে কষ্ট, দেশভাগের পর ভাসতে ভাসতে এ ঘাটে ও ঘাটে ঘুরে

মরা, কোন দিন এক মুঠা জোটে, কোনদিন জোটেও না, তবু তো তিলি টসকায় না!' এত স্বাস্থ্য, এত অঢেল যৌবন সে পায় কোথায়?

হরিপদ ভাবতে থাকে, মনে ফুর্তি না থাকলে দেহ কি ভরে ওঠে? সে নিজে তো অশক্ত পঙ্গু ব্যারামী মানুষ। তার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়। নিশ্চয় অন্য কেউ আছে। অন্য কেউ তিলির মনে রসের যোগান, ফুর্তির যোগান দেয়। না হলে এই দ্বীপে এসে ভাল না খেতে পেয়েও এমন ভরন্ত সুঠাম সুছাঁদ দেহ কেমন করে পায় তিলি। এই ভাবনাটা হরিপদকে অস্থির করে তোলে।

ভাবতে ভাবতে হরিপদ ক্ষেপে উঠল, 'থামুম, ক্যান থামুম? আমার বুকে বইসা আমারই দাঁত ভাঙবি। আর আমি মুখ বুইজা সহ্য করুম। আমি জানি, সারাটা দিন তুই ক্যান বাইরে থাকস? তর হাজার নাগর। উই পালসাহাব, উই হারাণ, উই গুপী, হগলের লগে তর ঢলাঢলি, মাখামাখি। তর—'

জীবনভর অনেক সয়েছে তিলি। তবু চিরটা দিন হরিপদর মন যুগিয়ে চলেছে। আজ হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল তার। মাথার ভেতর হাজারটা চোখা চোখা শলা যেন ক্রমাগত বিঁধতে লাগল। মুহূর্তে সারা জীবনের একটা মোটা-মুটি হিসাব কষে নিল তিলি।

আজ পর্যন্ত হরিপদর কাছ থেকে কী সে পেয়েছে? না একটু সুখ, না সোহাগ, না একটু শান্তি। সারাটা জীবন মানুষটা তাকে জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে, উঠতে বসতে দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর সন্দেহ করেছে। অথচ তার জন্য কী না সে করেছে? দেহকে দেহ মানে নি। গতরকে গতর ভাবে নি। তবু অকৃতজ্ঞ নির্দয় মানুষটার কাছে কোনদিন সুখ পেল না তিলি। এ দুঃখ তার মরলেও ঘুচবে না।

তিলি রুখে দাঁড়াল। বলল, 'কী পাইছি তোমার কাছে? কোনদিন দুইটা মিঠা কথাও কও নাই। তমস্ত জনম খালি দিয়াই গেলাম, পাইলাম না কিছু। তুমি আবার কও নাগর নিয়া আমি ঢলাঢলি করি, পরপুরুষের লগে আমার মাখামাখি। বেশ কথা, ভাল কথা। তুমি সোয়ামী, তোমার মনে যদি এই সন্দ জাগে, আমি কী করতে পারি? কিছুই না।'

হরিপদ টেনে টেনে বলে, 'সন্দ জাগে! মানুষের মনে মিছাই বুঝি সন্দ জাগে? তুই নষ্ট, কুচরিত্তির। তুই কত বড় সতীর ঝি সতী, হগল জানি।'

তিলি হঠাৎ ক্ষেপে উঠল, 'আমার অঙ্গ, আমার গতর উড়াইয়া দিমু, পুড়াইয়া দিমু। যা পরানে চায় তাই করুম। নাই পাইলাম এট্টু সুখ, না পাইলাম একটা পোলা। কী নিয়া বাচুম, কী নিয়া দুঃখু ভুলুম, কিসের আশায় বুক বান্ধুম? সোয়ামী পাইলাম, কিন্তুক তার শরীল পাইলাম না, মন

পাইলাম না। ভরা শরীলে ভরা যৈবনে বুকের ভিতর যখন খা খা করে, এমন একটা বান্ধব পাইলাম না যারে মনের কথা শুনাইয়া জুড়ামু।' একটু থামল তিলি। উত্তেজনায় দুঃখে যন্ত্রণার বুকটা কাঁপিয়ে দ্রুত দীর্ঘ গরম নিশ্বাস পড়ছে। অন্ধকারে চোখ দুটো ধক ধক করছে।

তিলি আবার শুরু করল, 'এই অঙ্গ, এই জনম রাইখ্যা কী করুম? কারো ভোগে লাগলাম না, কামে লাগলাম না। তবু অমস্ত জীবন মানুষে সন্দই করল। সন্দ আর সন্দ থাকে ক্যান? এইবার সন্দ সত্য হউক। এই অঙ্গ নিয়া যখন জ্বালা, তখন এরে রাখুম না। লুটাইয়া দিমু, উড়াইয়া দিমু, বিলাইয়া দিমু।'

'তাই দে মাগী, তাই দে। তর পরাণে যা চায় তাই কর।' চিলের মত তীক্ষ্ন গলায় টেনে টেনে চেঁচায় হরিপদ। চেঁচায় আর হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে কেঁদে ফেলে।

১৫

বুঝি বা একটা চিত্রল হরিণ কিংবা একটা ময়ূর।

হারাণের মনে হঠাৎ কেন যে হরিণ আর ময়ূরের ভাবনা এল, তা সে-ই জানে। অবশ্য হারাণ দেশে থাকতে ময়ূর দেখেছে। এই দ্বীপে এসে হরিণ দেখেছে।

টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাকে দেখে হারাণ ময়ূর আর হরিণের কথা ভাবছে, আসলে সে কিন্তু ময়ূরও না, হরিণও না। সে কাপাসী।

বাঁ দিকে বিরাট একটা পাহাড়; নাম স্যাড্‌ল পীক। স্যাডল্ পীক থেকে মিঠে জলের একটা নদী পাক খেয়ে খেয়ে নীচে নেমে এসেছে। লোকে বলে কিলপণ্ড নদী। কিলপণ্ডের সরু নীল ধারা ওপর থেকে নিচে নামছে। পাথর নুড়ি আর গাছের শিকড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে নীল জল অবিরাম বেজে চলে। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে সোনার তীরের মত বিকেলের রোদ এসে কিলপণ্ড নদীটাকে বিঁধবে যেন।

হারাণ বিকেলের রোদ দেখছিল না, জলের বাজনা শুনছিল না। সে দেখছিল কাপাসীকে।

হয়ত কাপাসী জল দিতে এসেছে। কিন্তু জল তো সে তুলছে না। নদীর পারে চুপচাপ বসে বসে কি যে করছে, এত দূরের টিলার মাথা থেকে ঠিক বুঝতে পারে না হারাণ।

আজ জমি চৌরস করতে যায় নি হারাণ। সকালে কাঁপিয়ে জ্বর এসেছিল তার।

খিদিরপুর ডকে আন্দামানের জাহাজে উঠবার আগে সরকারী লোকেরা খান দুই পাটের কম্বল দিয়েছিল। কম্বল মুড়ি দিয়ে সারা দিন ট্রানজিট ক্যাম্পের মাচানে পড়ে ছিল হারাণ। জ্বরের দাপটে মাথা খাড়া করতে পারে নি। দুপুরের দিকে ঘাম ছুটিয়ে জ্বরটা ছেড়ে গেছে। তার পরও অনেকক্ষণ মাচান ছেড়ে উঠতে পারে নি হারাণ। শরীরটা খুব কাহিল লাগছিল।

দেশে থাকতে এমন জ্বরে মাঝে মাঝেই পড়ত হারাণ। মাধব কবিরাজ বলত পিত্তজ্বর।

দেশ থেকে কিছুই আনতে পারেনি হারাণ। কিন্তু পুরনো রোগটা হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে ঠিক ধাওয়া করে এসেছে।

কথায় কথায় বুড়ী বাসিনী বলে, 'সুতো আহে না, পিছে পিছে দিন রাইত কু'টাই ঘোরে।'

ভালটা না আসুক, মন্দটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বীপ পর্যন্ত এসে পড়েছে। হাজার বার একই রোগে ভুগে ভুগে তার নিদানটা জেনে ফেলেছে হারাণ। শুধু নিদানই না, ওষুধ-বিষুধ, টোটকা-টাটকাও তার জানা। বাসক পাতা ছেঁচে রস খেলে বেশ কিছুদিন পিত্তজ্বরটা মাথা চাড়া দিতে পারে না।

বিকেলের দিকে দুর্বলতা একটু কমলে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হারাণ। জঙ্গলে গাছ খুঁজতে খুঁজতে এই টিলার মাথায় এসে উঠেছে।

বাসক পাতার উগ্র গন্ধ ঠিকই নাকে আসছে। কিন্তু ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে সে খুঁজে বার করা সহজ কথা নয়। তা ছাড়া বাসক গাছের কথা এখন আর ভাবছে না হারাণ।

ঘুরে ঘুরে সেই ভাবনাটাই তার মাথায় আসছে। একটা চিত্রল হরিণ না একটা ময়ূর? কেন যে হরিণ আর ময়ূরের কথা ভাবছে, হারাণ নিজে ঠিক করে উঠতে পারে না।

অনেকক্ষণ টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল হারাণ। কিন্তু নদীর পারে ঠায় বসেই আছে কাপাসী, তার উঠবার নামগন্ধ নেই। অগত্যা আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল হারাণ।

এর নাম নদী।

তা যে দেশের যে রীতি। তা না হলে হাত তিরিশ চল্লিশ চওড়া একটা সোঁতা খালকে কেউ নদী বলে।

কিলপঙ নদী। খালের চেয়ে সরু একটা জলরেখার নাম নদী। অন্য

দিন তাজ্জবের কথাটা ভেবে খুব একচোট হাসে হারাণ। কিন্তু আজ চুপচাপ কাপাসীর পেছনে এসে দাঁড়াল।

খাটো গেরুয়া রঙের একটা জামা পরেছে কাপাসী। জামাটায় গোল গোল খয়েরী ফুটকি। শাড়িটার রঙ মেঘের মত। এতক্ষণে হরিণ আর ময়ূরের ভাবনাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

পিঠময় চুল ছড়িয়ে রয়েছে। নদীর দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে আছে কাপাসী। চোখ থেকে গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোটায় জল ঝরছে। নদীপারের শুকনো মাটি মুহূর্তে সেই জল শুষে নিচ্ছে।

হারাণ চমকে উঠল। আস্তে আস্তে ডাকল, 'কাপাসী—'

ডাকটা কাপাসীর কানে পৌঁছয় নি। আগের মতই বসে রইল সে।

হারাণ আবার ডাকল, 'কাপাসী—'

গলাটা ঘুরিয়ে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্য থেকে যেন কাপাসী তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। অস্ফুট গলায় বলল, 'তুমি—'

'হ—হ—আমি—'

গভীর উৎকণ্ঠায় কাছাকাছি এগিয়ে গেল হারাণ।

মুখ ঘুরিয়ে আবার নদীর দিকে তাকাল কাপাসী। আবার সে উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন হয়ে গেল। আগের মতই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল।

হারাণ মনে মনে ভাবে, আহা কাঁদুক, কাপাসী কাঁদুক। কাপাসীকে কাঁদতে দেখলে তার আশা হয়। সে ভরসা পায়। যে দুঃখে, যে ব্যথায় কাপাসীর বুক ফাটে, নোনা জল হয়ে চোখ ফেটে তা ঝরে যাক। আহা কেঁদে কেঁদে বুকটা হাল্কা হোক মেয়েটার। অনেক পুড়েছে, অনেক জ্বলেছে কাপাসী। এবার একটু জুড়োক। কাপাসীর বুকের মধ্যে যে কান্না জমাট বেঁধে আছে, এতদিনে বুঝি সেটা পথ পেয়েছে।

হারাণ ডাকে, 'কাপাসী—'

'কও—'

'কান্দো, যত পার কান্দো।'

'কত দিন কান্‌তে চাইছি, পারি নাই। ঈশ্বর এট্টু কান্‌তেও দ্যায় নাই। যখন কান্‌তে চাইছি, ঈশ্বর হাসাইছে। কত শাস্তি পাইলাম! ভগমান, তোমার মনে কি যে আছে—' বলতে বলতে থেমে যায় কাপাসী।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে হারাণ। ধরা ধরা গলায় কি যে বলে, বোঝা যায় না।

রোদের তেজ একসময় মরে আসে। জঙ্গলের মাথায় বিষণ্ণ একটু আলো আটকে রয়েছে। স্যাডল্ পীকের দিক থেকে ঠাণ্ডা মৌসুমী বাতাস ছুটে আসে। এই দ্বীপে আর একটা দিন ফুরিয়ে যেতে থাকে।

ফিস ফিস করে হারাণ বলল, 'সে কথা ভুইলা যাও কাপাসী—'

'ভুলতেই তো চাই পুরুষ। কিন্তুক পারি কই? পারি না, পারি না, পারি না। কিছুতেই যে পারি না। হা ঈশ্বর!' কাপাসী অস্থির হয়ে ওঠে। দু হাতে চুল ছেঁড়ে। জোরে জোরে মাথাটা ঝাঁকায় আর কাঁদে। তীব্র অবোধ কান্না। মুখের উপর গাঢ় যন্ত্রণার ছাপ পড়ে।

কেঁদে কেঁদে এক সময় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে যায় কাপাসী। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে সে। তার পিঠে একটা হাত রাখল হারাণ। বলল, 'ভুইলা যাও কাপাসী, ভুইলা যাও। না ভুললে দুঃখু তো ঘুচব না। সারা জনম কষ্ট পাইবা।'

'ভুলুম, ভুলুম। কিন্তুক ক্যামনে?' হাতের ফাঁক থেকে মুখ তোলে কাপাসী। ভেজা ভাঙা গলায় বলে, 'ক্যামনে ভুলুম পুরুষ?'

বঙ্গোপসাগরের ওপার থেকে কিছুই আনতে পারে নি কাপাসী। সে কুমারী মেয়ে। কুমারী মেয়ের থাকেই বা কী? একটি সুন্দর অনাঘ্রাত শরীর আর নিষ্পাপ মন। সম্বল বল, বিত্ত বল, বৈভব বল, এই দুটোই তার সব। এই শরীর আর এই মন।

কাপাসী যখন এসেছে, তখন তার শরীরও এসেছে, মনও এসেছে। কিন্তু এ শরীর, এ মন তো নিষ্পাপ কুমারী মেয়ের না।

নিজের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা, আকণ্ঠ এক দুঃখ পুরে এই দ্বীপে এসেছে কাপাসী। সেই দুঃখ কেমন করে ভুলবে সে? কেমন করে? এর উত্তর হারাণের জানা নেই।

কাপাসী এখনও বলছে, 'কইয়া দাও পুরুষ, ক্যামনে ভুলুম?'

হারাণ উত্তর দিল না। কাপাসীর দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারে যে ভোলার মন্ত্রটা তা তার জানা নেই।

অনেকটা সময় কেটে গেল। জঙ্গলের মাথা থেকে একসময় বিষন্ন আলোটুকু কে যেন মুছে নিল। কিলপঙ নদীর জল ছোট ছোট নুড়ি, পাথর আর গাছের শিকড়ে ঘা খেয়ে খেয়ে একটানা বেজে চলেছে। জলের শব্দ ছাড়া এখন আর কোন শব্দ নেই।

চৌকো তেলের টিন কেটে মোটা লোহার তার পরিয়ে বালতি বানানো হয়েছে। সেই বালতি নিয়ে জল তুলতে এসেছিল কাপাসী। সেটা এক পাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

হারাণ এক বালতি জল ভরল। কাপাসীর কাছে এসে বলল, 'ক্যাম্পে লও (চল)। সন্ধ্যা হইয়া আইল।'

কাপাসী উঠে দাঁড়াল। তারপর দুজনে পাশাপাশি টিলা বাইতে লাগল।

হারাণ বলল, 'আমাগো হগল গেছে। ঘর গেছে, বসত গেছে, জমি জমা গেছে। সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছাইড়া আমরা ভাইসা পড়ছি। কম দুঃখু, কম কষ্ট পাইলাম এই কয় বছরে! ভাবতে বইলে মাথার ঠিক থাকে না।' একটু

দম নিয়ে আবার শুরু করে, 'এই দ্বীপে আইয়া আমরা মাটি পাইছি। আশ্রয় পাইছি। পুরান ঘরবসত, পুরান ভিটামাটির দুঃখু ভুলতে বইছি। পুরান দুঃখু না ভুললে নূতন কইরা বাচুম ক্যামনে? আমাগো বাচতে হইব। যেমুন কইরা পারি আমরা বাচুম। ঐ যে পালসাহাব কয়, মনিষ্য হইয়া জন্মাইছি, বাচার লেইগা যুঝুম না?'

একবার কাপাসীর মুখের দিকে তাকাল হারাণ। আবছা আলোতে তার মুখটা ঠিক বোঝা যায় না। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই আবার বলল, 'ঠিক কি না?'

কাপাসী অস্ফুট একটা শব্দ করল।

হারাণ বলে, 'কুত্তাবিড়ালও বাচার লেইগ্যা কি না করে! আমরা মানুষ, আমরা বাচুম না? বাচ কাপাসী, তুমি ভাল হইয়া ওঠ। এইটুকু বোঝ না! তুমি বাচলে যে আমিও বাচি।'

খুব কাছে এসে গাঢ় গলায় সে বলতে থাকে, 'পুরান দুঃখু ভুইলা যাও কাপাসী, যেমনে পার ভোল! দেইখো এমুন দিন এমুন থাকব না। সুদিন আইব।'

'সুদিন আইব! কি যে কও পুরুষ, যত পরস্তাব (রূপকথা)!' বলতে বলতে হঠাৎ তীব্র অবুঝ অস্থির গলায় সেই হাসিটা হেসে উঠল কাপাসী।

হারাণ চমকে উঠল। কান্নার মধ্য দিয়ে অনেক কাছে এসে পড়েছিল কাপাসী। হাসি দিয়ে হারাণকে আবার অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই হাসিটাই আবার তাকে অস্বাভাবিক করে ফেলেছে।

হারাণ আর কিছু বলে না। অসহ্য আকণ্ঠ এক ব্যথায় সে বোবা হয়ে গেছে।

কাপাসী হাসতেই থাকে।

মুখ বুজে কাপাসীর হাসি শোনে হারাণ। এই হাসির অনেক পরত নিচে কত কান্নাই না জমে আছে! কখনও সখনও হাসিটা ঠেলে সরিয়ে কাপাসীর কান্না বেরিয়ে পড়ে।

একটু আগে সেই কান্নাটাই তো শুনেছে হারাণ।

উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ জুড়ে উৎসব শুরু হয়েছে। জীবনের উৎসব। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পারে পারে যে জীবন তারা ফেলে এসেছে, বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে তাকে নতুন করে ফিরে পাবার কাজে লেগেছে সবাই।

জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, বউ-ঝি—কেউ বসে নেই। কুড়াল কোদাল নিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সবাই নয়। একজন বাদ। কাপাসীর বাপ নিত্য ঢালীর এই দ্বীপের কোন ব্যাপারেই উৎসাহ নেই উদ্যম নেই। এমন কি লাভ-লোকসানের বোধটাই নেই। সব ব্যাপারেই সে উদাসীন, একেবারেই নির্বিকার।

জঙ্গলের তলা থেকে, সাপ-জোঁক-কানখাজুরা আর হাজার জাতের সরীসৃপের মুখ থেকে মানুষগুলো মাটি ছিনিয়ে নিয়েছে। কোদালের ফলায় ফলায় মাটি চৌরস করছে। মানুষের ঘাম রক্ত শ্রমে উপনিবেশ গড়ে উঠছে।

পালসাহাব বলেছে, জমি চৌরস হয়ে যাবার পর সরকার থেকে বাঁশ খুঁটি দড়ি বেতপাতা কাঠ—ঘর তৈরির সব রকম সরঞ্জাম পাওয়া যাবে। শুধু কি সরঞ্জামই, বসতের জন্য মাটিও মিলবে।

তখন আর ট্রানজিট ক্যাম্পে একসঙ্গে সবাইকে ডেলা পাকিয়ে থাকতে হবে না। সবারই নিজের নিজের মাথাগোঁজার বাড়িঘর হবে।

যে মাটি তারা হারিয়ে এসেছে, হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আবার তা ফিরে পেয়েছে। পায়ের নিচে মাটি পেয়ে সেই মাটিকে তারা বড় ভালবেসে ফেলেছে! প্রাণের সবটুকু উত্তাপ ঢেলে পরম মমতায় সেই মাটিকে তারা তৈরী করে নিচ্ছে।

মাটি! মাটি! নতুন মাটি। নোনা জলের মাঝখানে মিঠে মাটি। সেই মাটি পেয়ে মানুষগুলো মেতে উঠেছে ; বিভোর হয়ে আছে।

জমি কোপানো হয়েছে অনেকটা, জঙ্গলও সাফ হচ্ছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ঘরবসত উঠবে। প্রথম বৃষ্টির জল পেলে বীজদানা রোয়া হবে। দেখতে দেখতে উপনিবেশ জমে উঠবে।

কিন্তু কাপাসীর বাপ নিত্য ঢালীর তাতে কিছুই যায় আসে না। সে জমিও কোপায় না, জঙ্গলও কাটে না। ট্রানজিট ক্যাম্পের কোন কাজেই সে

নেই। এই দ্বীপের সঙ্গে নিত্যর কোন যোগ নেই। এই উপনিবেশের জন্য তার প্রাণের টান নেই, মাথাব্যথা নেই।

সাত পুরুষের ঘর ভদ্রাসন এবং ভিটামাটি ছেড়ে আসার শোকটা তার প্রাণে সব চেয়ে বেশি বেজেছে। এই শোকটা তাকে একবারে অথর্ব করে ফেলেছে।

মুখভরা কাঁচা পাকা নোংরা দাড়ি। মেরুদাঁড়াটা দুটো খাঁজ খেয়ে দুমড়ে আছে। খসখসে কালো চামড়া থেকে খই ওড়ে। বয়স এখনও পঞ্চাশ পেরোয় নি। এরই মধ্যে চুলগুলো পেকে কেমন একটা পাঁশুটে রঙ ধরেছে। খাওয়া-শোয়ার কিছু ঠিক নেই। ইচ্ছা হল খেল, ইচ্ছা হল ঘুমলো। টিকে থাকতে হলে সাধারণ যে জৈবিক নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়, সে সবের ধার ধারে না নিত্য। তার নগদ ফলও সে পাচ্ছে।

শরীরটা দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। মাংসহীন দেহের চওড়া চওড়া হাড়গুলি বেড়িয়ে পড়েছে। নাকের দু পাশে গোলাকার দুটো বড় গর্ত। সেই গর্তের ভেতর গরুর চোখের মত একজোড়া অবোধ অসহায় চোখ। ফুর্তি নেই, হাসি নেই, আনন্দ নেই। বেঁচে থাকতে হলে মানসিক যে উপকরণগুলির দরকার, তার ছিটেফোঁটাও নেই নিত্যর মধ্যে। অকালে সে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। দেশভাগ তাকে একেবারে বিকল করে ফেলেছে।

দিনরাত দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে ট্রানজিট ক্যাম্পের টিলায় চুপচাপ বসে থাকে নিত্য। কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। নিজের খেয়ালে বিড় বিড় করে কি যে বকে যায়, কে বলবে।

প্রথম প্রথম পালসাহাব ধমক ধামক দিয়েছে। কিছুই লাভ হয় নি। কোন কথাই বলে নি নিত্য। উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়েই থেকেছে। পালসাহাবের কোন কথাই যেন তার কানে ঢোকে নি বুঝি।

ধমক ধামক, চিল্লাচিল্লিতে যখন কিছুই হল না, তখন তার পিঠে একখানা হাত রেখে অনেক বুঝিয়েছে পালসাহাব, 'দ্যাখ শালে, দুঃখু করে আর কী করবি? তামাম জিন্দগী এমন করে চলবে না।'

ডাইনে-বাঁয়ে নিত্য মাথা ঝাঁকিয়েছে। এভাবে কি যে সে বোঝাতে চেয়েছে কে বলবে!

পালসাহাব আবার বলেছে, 'হাল এমন থাকবে না। নিত্য, জমানা এক রোজই বদলাবেই। জমিন পেয়েছিস, ফসল ফলা। মাটি পেয়েছিস, কুঠি বানা। অ্যায়সা জমানা অ্যায়সা থাকবে না রে, কভী অ্যায়সা থাকবে না।' পালসাহাবের স্বরটা আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে উঠেছে।

হাজার বুঝিয়েও নিত্য ঢালীকে বশে আনতে পারে নি পালসাহাব। যে জিদ ধরেছে বুঝ মানবে না, তাকে বুঝ মানানো কি সহজ কথা! অবশ্য পাল-সাহাব হার মানে নি, হাল ছাড়ে নি।

প্রায় রোজই সকালে ট্রানজিট ক্যাম্পে এসে নিত্যকে নিয়ে পড়ে পালসাহাব। আবার জমির কাজ সেরে সন্ধ্যার পর আর এক দফা বোঝায়।

কিন্তু আজকাল পালসাহাব আসার আগেই ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়ে নিত্য ঢালী। বয়স তার পঞ্চাশ পেরুতে চলল। জীবনে তো কম দেখে নি, কম শোনে নি, কম বোঝে নি সে। অভিজ্ঞতাও তার কম হয় নি। পালসাহাব নতুন কি আর বোঝাবে? এ সব কি আর সে জানে না? সবই সে জানে, সবই বোঝে। কিন্তু আশায় বুক বাঁধতে পারে কই?

পালসাহাব বলে, জমানা বদলে যাবে, এমন দিন আর এমন থাকবে না। নিত্য জানে, সবই বদলে যাবে, কিছুই এমন থাকবে না। তবু তার মন বুঝ মানে না। তার সামনে আশা নেই, পেছনে ভরসা নেই।

জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এরিয়াল উপসাগরে যাওয়ার পথটা খুঁজে বার করেছে নিত্য ঢালী। সকালে পালসাহাব ট্রানজিট ক্যাম্পে আসার আগে সে উপসাগরের পারে চলে যায়। সারাটা দিন এবং রাতের অনেকটা সময় কাটিয়ে যখন ক্যাম্পে ফেরে, অন্ধকার আর গাঢ় কুয়াশায় সমস্ত দ্বীপ তখন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সে আসার আগেই পালসাহাব তার ঝুপড়িতে চলে যায়।

আজও এরিয়াল উপসাগরের পারে এসে পড়ল নিত্য ঢালী।

উপসাগরের এক কিনারে বিরাট এক চাঁই পাথর। নোনাজলে পাথরটার অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে কচ্ছপের আকৃতি ধারণ করেছে। রোজ এই পাথরটার ওপর এসে বসে নিত্য।

বেশ খানিকটা আগেই রোদ উঠে গেছে।

সামনের দিকে নাম-না-জানা ছোট্ট একটা দ্বীপ। সকাল হলেও কুয়াশা পুরোপুরি ঘোচে নি, হাল্কা একটা পর্দার মত দ্বীপটাকে জড়িয়ে আছে।

ফিনফিনে রুপালী ডানায় সোনালী রোদ গায়ে মেখে উড়ুক্কু মাছেরা উড়ছে। সাগরপাখিগুলো ছোঁ মেরে মেরে উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সামনে যতদূর তাকানো যায়, ছোট ছোট দ্বীপ। সেগুলোকে ঘিরে আছে অথৈ অগাধ জলে।

সমুদ্র থেকে ঢেউ আসে উপসাগরে, বিপুল আক্রোশে পারের ভাঙা ভাঙা ক্ষয়িত পাথরে আছাড় খায়। নোনা জল অবিরাম গর্জায়।

উড়ুক্কু মাছ, কুয়াশা, দূরের ছোট ছোট দ্বীপ, সাগরপাখি—কিছুই দেখছিল না নিত্য ঢালী। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের কথাই ভাবছিল সে। কী মানুষ ছিল সে, আর কী হয়ে গেল।

পালসাহাব যখন বলে, 'জমিন পেয়েছিস, ফসল ফলা। মাটি পেয়েছিস, বসত বানা,' তখন মনে মনে হাসে নিত্য ঢালী। আপন মনে বলে 'জমিনের কি দেখছস পালসাহাব! ফসলের কি দেখছস! আমারে ফসলের কথা শুনায় হালার পালসাহাব!'

তাজ্জবের কথাই।

যে লোকটা দেশে থাকতে অসুরের মত খাটতে পারত, এক হাতে পঁচিশ কানি তিন-ফসলী জমি চষত ; আউশ আমন আর রবি শস্য, বছরে তিনবার ফসল তুলত, তাকে চাষের কথা শোনায় পালসাহাব! যে লোকের সাতাশের বন্দের আটচালা ঘর ছিল তিনখানা, ডোল ছিল আটখানা, তাকে ঘর বসতের কথা শোনায় পালসাহাব!

সবই ছিল। কিন্তু আজ আর কিছুই নেই। ঘর না, ভদ্রাসন না, জমি-জিরাত, হাল হালুটি কিছুই না। এমন যে বংশের মান ইজ্জত, তাও না। শুধুমাত্র প্রাণটুকু ধিকি ধিকি করে টিকে আছে। ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে নিত্য ঢালীর। মানই যখন বাঁচল না, তখন আর প্রাণের মায়া সে করে না।

এক এক সময় নিত্য ভাবে, আবার সে দেশে ফিরে যাবে। শরীর আর মন এমন ভেঙে পড়েছে, যাতে নতুন করে এই দ্বীপে আর জীবন গড়ে তোলা সম্ভব না। সব উদ্যম, সব উৎসাহ, প্রাণশক্তির সবটুকুই তো তার নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু একমাত্র ভাবনা তার কাপাসীকে নিয়ে। ভাবনা! কাপাসীকে নিয়ে আবার ভাবনা কিসের? কাপাসী সব ভাবাভাবির বাইরে। বাপ হয়ে সে কাপাসীকে বাঁচাতে পারল কই? যে বেড়া আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য উধর্বশ্বাসে এই দ্বীপে পালিয়ে এসেছে তাকে ঠেকাতে পারল কই? কাপাসীকে যখন বাঁচাতেই পারল না, তখন আর এখানে থেকে কি হবে? কপালে যা আছে হোক, দেশেই ফিরে যাবে নিত্য ঢালী।

কাপাসীর কথা মনে হতেই অবোধ শিশুর মত শব্দ করে অনেকক্ষণ কাঁদল নিত্য। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়লে একসময় ঝিম মেরে বসে রইল। কোঁচ-কানো তোবড়ানো গালে চোখের নোনা জলের দাগ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে লাগল তার।

ভট্—ভট্—ভট্। হঠাৎ এরিয়াল উপসাগরে মোটর বোটের শব্দ উঠল।

নিত্য ঢালী চমকে ওঠে, কিন্তু চমকটা বেশিক্ষণ থাকে না, আস্তে আস্তে থিতিয়ে যায়।

রোজই ঠিক এই সময়ে মোটর বোটটা এরিয়াল উপসাগরে আসে। একটা লোক, তার নাকটা থ্যাবড়া, চোখদুটো কুতকুতে, লাফ মেরে জলে নামে। তারপর ডুব দিয়ে দিয়ে জল থেকে কি যেন তুলে আনে। আর একটা লোক মোটর বোটে বসে থাকে।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত, যতক্ষণ আলো থাকে যতক্ষণ উপসাগরের তলাটা অস্পষ্ট হয়ে না যায়, ততক্ষণ জলেই থাকে থ্যাবড়া-নাক লোকটা।

এই লোকদুটো আর এই মোটর বোটটা কোথা থেকে আসে, কেনই বা আসে, উপসাগর থেকে কী-ই বা তোলে, কিছুই জানে না নিত্য ঢালী।

প্রথম প্রথম খেয়াল করত না নিত্য। নিজের চিন্তায় যে অস্থির তার অন্য দিকে মন দেবার সময় কোথায়?

কিন্তু ধীরে ধীরে তার কৌতূহল হতে লাগল। আজকাল মোটর বোটের শব্দ শুনলেই নিত্য কান খাড়া করে। যতক্ষণ বোটটা উপসাগরে ঘোরাঘুরি করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। থ্যাবড়া-নাক কুতকুতে-চোখ লোকটা জল থেকে কি তোলে, তা লক্ষ্য করে।

কৌতূহল তার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

১৭

যুবতীর সাধের কি শেষ আছে?

তার সমস্ত মন আর সর্বাঙ্গ জুড়ে শুধু সাধ আর সাধ। অফুরন্ত অনন্ত সাধ। স্বামীর সাধ, সন্তানের সাধ, ঘরের সাধ।

সাধ তো কত! তবু একটা সাধও মিটল না তিলির। একটা আশাও তার পুরল না। স্বামী পেয়েছে ঠিকই। বাপ-মা গুরু-পুরুত আগুন সাক্ষী রেখে যার হাতে সঁপে দিয়েছে সে স্বামী বৈ কি।

স্বামী! আজকাল হরিপদর কথা ভাবলেই ঠোঁট দুটো বিদ্রূপে বেঁকে যায় তিলির। ফিস ফিস করে সে বলে, 'সোয়ামী! সাত জন্মের ভাতার!' অবজ্ঞায় নাকের ডগাটা তির তির করে কাঁপে তার।

সারা জীবনে হরিপদ তাকে দিয়েছে কী? অরণ্যের তলা থেকে, সাপ-জোঁকের মুখ থেকে এই দ্বীপের মাটি ছিনিয়ে নিতে নিতে নিজের জীবনের হিসাব কষে তিলি। এতকাল মুখ বুজে হরিপদর মন যুগিয়ে চলেছে সে। আজকাল ভাবে সারা জীবনে কি পেল, কতটুকু পেল!

হরিপদ তাকে কিছুই দেয় নি। না বলতে কিছুই না। একটা ছেলে না, মনের মত একটা ঘর না। এমন কি নীরোগ তাজা একটা দেহ পর্যন্ত না।

তিলির যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সে বারো বছরের কিশোরী। দেখতে দেখতে সে ভরে উঠল। প্রচুর স্বাস্থ্যে, অফুরন্ত যৌবনে যুবতী হয়ে গেল।

কোন দিন হরিপদ কি তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে? দেখবে কি? আজন্ম তার বুকে হাঁপির টান, অস্থিসার রোগা জিরজিরে দেহ, লিকলিকে হাত-পা।

বুকে হাত চেপে হিক্কা আর হাঁপানি সামলাবে, না তিলির ভরন্ত-পুরন্ত যৌবনের দিকে তাকাবে? সময় কোথায় হরিপদর? সামর্থ্য কোথায়?

অধর্ম বল, পাপ বল, যুবতীর শরীর তো তার নিজের বশে নয়। রাত যখন গাঢ় হয়েছে, তিলির নিশ্বাস দ্রুত তালে পড়েছে, চোখ দুটো সাপের মত জ্বলছে। নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠেছে। তিলির মনে হয়েছে, রক্তের মধ্যে তার আগুন ধরে গেছে। ভেতরের তাপ চামড়ায় ফুটে বেরিয়েছে। গায়ে জল ঢেলেও সে তাপ জুড়োতে পারে নি তিলি।

ওপরে জল ঢেলে চামড়া ঠাণ্ডা করা যায় কিন্তু রক্তের তাপ কি তাতে জুড়োয়? ভেতরের আগুন কি এত সহজে নেভে? বনের আগুন তো সবাই দেখে, মনের আগুন দেখার চোখ ক'জনের? আর যারই থাক, অন্তত হরিপদর সে চোখ নেই। যদি থাকত? থাকলেই বা কী হত? কিছুই না। কিছুই আসান হ'ত না তিলির।

নিয়ত রোগে ভোগে যে হরিপদ, দিবারাত্রি হাঁপির টানে যে কাবু হয়ে থাকে থাকে, সাধ্য কি তার তিলির মনের আগুন দেহের আগুন নেবায়?

ভরা শরীর আর ভরা যৌবন নিয়ে সারাটা জীবন শুধু জ্বলছেই তিলি। তবু দেহের জ্বালার কথা সে ভাবে নি। মনের পোড়াকে সে মানে নি। হরিপদর মন যুগিয়েই সে চলে এসেছে এতকাল।

তবু তার মন পেয়েছে কই তিলি? রোগা জিরজিরে অস্থিসার দেহটার মধ্যে হরিপদর মনটা যে কোথায়, দশ বছর এক সঙ্গে ঘর করেও খুঁজে পেল না তিলি।

কিন্তু কত আর সয়।

- এখন কত রাত কে বলবে! ট্রানজিট ক্যাম্পটা নিঝুম হয়ে গেছে।

কুয়াশা অন্ধকার আর গাঢ় একটি ঘুমের মধ্যে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটা তলিয়ে গেছে। টিলার পাশ থেকে বন তুলসীর ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে। থেকে থেকে একটা রাত-অন্ধ বুনো পাখি কঁকিয়ে উঠছে। এলোপাথাড়ি হাওয়া ছুটছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে।

পাখির ককানি আর হাওয়ার শনশনানি ছাড়া এই দ্বীপে এখন কোন শব্দ নেই।

ট্রানজিট ক্যাম্পের সামনে টিলার মাথায় একা চুপচাপ বসে রয়েছে তিলি। দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনিটা গেঁথে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো ধক ধক করছে।

মুহূর্তে খুন চেপে গেল তিলির মাথায়। শুধু কি খুন, মাথার ভিতর আগুনও ধরে গেছে। কিছু একটা সর্বনাশ না ঘটিয়ে সে ছাড়বে না।

অসহ্য উত্তেজনায় কাঁপছে তিলি। প্রবল বেগে শিরায় শিরায় কী এক স্রোত ছুটে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই তা থামানো যাচ্ছে না। থামাতে চায়ও না তিলি।

এই কুয়াশা, এই অন্ধকার আর শরীরের এই থরথরানির মধ্যে তিলি ঠিক করে ফেলল, সর্বনাশেই সে গা ভাসাবে। পাপপুণ্য, মান-ইজ্জতের কথা সে ভাববে না। স্বামীর কথা সে ভাববে না। যে স্বামী থেকেও নেই, তার কথা ভেবেই বা কি হবে? লজ্জা-নিন্দা-ভয়—তিলি আজ সব কিছুর বাইরে।

লোকে কি বলবে, সে কথাও তিলি ভাবে না। লোক না পোক! না না, পৃথিবীর কাউকে ডরায় না সে। ভয়-ডর কিছুই তাকে আজ বেঁধে রাখতে পারবে না। মাথায় যে খুন চেপেছে, যে আগুন ধরেছে, সেই খুন আর আগুন তিলির সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

অনেক সয়েছে তিলি। আর না।

এতকাল হরিপদর খালি সন্দেহই ছিল। সেই সন্দেহের সঙ্গে কোন রকমে আপোষ করে তার ঘর করেছে তিলি। সন্দেহটা তবু সইত। আজ ঝুপড়ি থেকে লাথি মেরে তাকে বার করে দিয়েছে হরিপদ। এক টুকরো পাথর ছুঁড়ে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ দর দর করে রক্ত ঝরছিল। রক্তটা অবশ্য এখন থেমেছে।

টিলার মাথায় বসে তিলি আজ প্রথম ভাবল সুখ থাক, শান্তি থাক, সোহাগ থাক দু মুঠো ভাত যে বউকে দিতে পারে না সে আবার কিসের স্বামী?

এখন কী করবে তিলি? কী করতে পারে?

কী না পারে সে? হরিপদর সন্দেহ সত্য করে দিতে পারে। হরিপদর মুখে চুনকালি লেপে দিতে পারে। নিজের মন, নিজের অঙ্গ লুটিয়ে দিতে পারে, উড়িয়ে দিতে পারে, পুড়িয়ে দিতে পারে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল তিলি। সামনের ট্রানজিট ক্যাম্পটা নিঃসাড় হয়ে রয়েছে।

এক পা এক পা করে এগুতে এগুতে ক্যাম্পের শেষ মাথায় এসে পড়ল তিলি। এখানে ছোট একটা বেত পাতার ঝুপড়ি। ঝুপড়িটার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল তিলি। এদিক সেদিক একবার দেখে নিল। একটু দ্বিধা, একটু ভয়, তারপরেই মনঃস্থির করে ফেলল সে। ঝুপড়ির বেড়ায় আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগল। একটা দুটো তিনটে—অনেকগুলো টোকা দিল তিলি।

প্রথমে আস্তে আস্তে দিচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ঝুপড়ির বেড়া ঝাঁকাতে লাগল। চাপা তীব্র গলায় সে ডাকল, 'জামাই, জামাই—'। তিলির গলার আওয়াজটা সাপের হিসহিসানির মত শোনাতে লাগল।

ঝুপড়ির ভিতর মচ মচ শব্দ হল। কেউ যেন বাঁশের মাচানে ধড়মড় করে উঠে বসেছে।

তিলি আবার ডাকল, 'জামাই, জামাই—'

ঝুপড়ির মধ্য থেকে ঘুমজড়ানো আবছা স্বর ভেসে এল, 'কে কে?'

'আমি, আমি—'কাঁপা গলায় তিলি বলল, 'আমি, আমি জামাই। তরাতরি (তাড়াতাড়ি) বাইরে আস।'

একটু পরেই কাঁচা বাঁশের ঝাঁপ খুলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপড়ির ভিতর থেকে একটা লোক গুঁড়ি মেরে বাইরে বেরিয়ে এল।

গাঢ় কুয়াশা চুঁইয়ে আবছা অনুজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে পড়েছে। এ এমন একটা আলো যাতে মানুষের চোখ দেখা যায়, কিন্তু চোখের কথা পড়া যায় না। মাটি দেখা যায় কিন্তু মাটির রং বোঝা যায় না।

লোকটা এগিয়ে এসে তিলির মুখোমুখি খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

কাঁপা কাঁপা গলায় তিলি বলল, 'জামাই, তুমি আইছ!' লোকটা যে বেরিয়ে এসেছে, নিজের চোখে দেখেও ঠিকমত যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তিলি।

ট্রানজিট ক্যাম্পের সবাই তাকে 'জামাই' বলে ডাকে। আসলে আর দশ জনের মত বাপ-মায়ের দেওয়া নাম একটা আছে তার। কিন্তু 'জামাই' শব্দটার নিচে সে নামটা হারিয়ে গেছে

তার আদত নাম যোগেন—যোগেন করাতি। কিন্তু কি সুবাদে ট্রানজিট ক্যাম্পের সবাই যে তাকে জামাই বলে ডাকে, কে বলবে!

চাপা ফিসফিস গলায় তিলি বলল, 'আমি আইলাম—'

'ব্যাপারখান কী? কিছুই যে বুঝি না!' কিছুটা ভয়, কিছুটা উত্তেজনা কিছুটা বিস্ময়ে যোগেনের গলা অল্প অল্প কাঁপে।

তিলি এবার ডুকরে উঠল, 'আমার আর কেউ নাই! কিছু নাই। বাচার উপায় নাই।'

তিলির একটা হাত ধরল যোগেন। বলল, 'অমুন কইরো না, অমুন করতে নাই। গলার আওয়াজে কেউ বাইর হইয়া পড়ব। দেইখা ফেলব—' ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল যোগেন।

'দেখুক, দেখুক। আইজ কোন কিছুতে আমার ডর নাই। সরম-ভরমের মাথা খাইয়া আমি পুরীর বাইর হইছি।'

'চুপ কর, চুপ কর। কেও শুনব।'

'শুনুক; শুনাইতেই তো চাই। পিরথিমীর সগলে শুনুক। লাজ-নিন্দা —আমার কিছুই নাই। ক্যান থাকব?' তিলি যেন রুখে ওঠে।

'অবুঝ হইও না তিলি। বুঝ মান, ধৈয্য ধর—'তিলির একটা হাত ধরেছিল যোগেন। এবার অন্য হাতটা ধরল। বলল, 'বুঝি, মনটা তোমার বশে নাই। দুঃখু পাইছ। কিন্তুক অত অবুঝ হইলে কি চলে!' তিলিকে বোঝাতে থাকে যোগেন। কিন্তু যে জেদ ধরেছে বুঝ মানবে না, তাকে বোঝানো কি এতই সহজ! মুখের কথায় কি সে বুঝ মানে!

তিলি ক্ষেপে উঠল, 'জনমভর খালি বুঝই মানলাম, খালি ধৈর্য্যই ধরলাম। কিন্তুক পাইলাম কী? কী পাইছি? তুমিই কও পুরুষ—'

'আমি কী কমু?' বিমূঢ় মুখে তিলির দিকে তাকিয়ে রইল যোগেন।

'ভাল ভাল। বড় সুখের কথা শুনাইলা পুরুষ, বড় শান্তি দিলা।' মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে তিলি বলতে থাকে, 'তমস্ত জীবন তোমার কথায় ভরসা কইরা আছি। তুমি যেমুন কইছ, হেই মত চলছি। মনেরে বুঝ মানাইছি, ধৈর্য্য ধরছি। কিন্তুক আর পারি না—' কথাটা শেষ না করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল তিলি।

'কান্দে না, কান্দে না—' গাঢ় সস্নেহ গলায় যোগেন বলতে থাকে, 'থির হও, থির হও। মাথা ঠিক কর।'

তিলির কান্না তাতে থামে না, ফোঁপানি বাড়তেই থাকে। এদিকে কি বিপাকেই না পড়েছে যোগেন! কেউ যদি এখন ঝুপড়ি থেকে বেরোয় তা হলে উপায় থাকবে না। দুর্নাম রটে যাবে। পাঁচ মুখে পাঁচ কথা রটবে। কেউ তাকে বুঝবে না। কোন কিছু বিচার করে দেখবে না। দুর্নাম যখন রটে, বিচার বিবেচনা না করেই রটে। তখন দু হাতে ক'টা মুখ চাপা দেবে যোগান?

ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে, টিলার মাথাটা যেখানে সবচেয়ে উঁচু, কুয়াশা চোঁয়ানো চাঁদের আলোয় জায়গাটা কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। তিলির হাত ধরে নিয়ে সেখানে এল যোগেন। পাশাপাশি বসল।

সামনের জঙ্গলের মাথায় চাপ চাপ অন্ধকার জমে রয়েছে। অন্ধকারের ওপর সাদা কুয়াশা ফেনার মত ভাসছে। চারদিকের গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ে লক্ষকোটি জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে।

মানুষের চামড়ার স্বাদ পেয়ে বাড়িয়া পোকারা হন্যে হয়ে উঠেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে তিলি আর যোগেনের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কামড়ে কামড়ে চামড়া ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। কিন্তু তিলির হুঁশ নেই। বাড়িয়া পোকার কামড় তার গায়ে যেন বিঁধছে না। অস্থির গলায় সে বলছে, 'পিছনের হগল কিছু মুইছা পুরীর বাইর হুইলাম। অখন তুমিই ভরসা—'

'কী কও!' যোগেন চমকে উঠল।

'ঠিকই কই।' তিলি অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল, 'মনে আছে হেই কথা?'

'কোন্ কথা?'

'একদিন তুমি কইছিলা যেইদিন আর সোয়ামীর লগে মানাইতে পারুম না, যেইদিন হ্যায় (সে) আমারে পুরীর বাইর কইরা দিব, হেইদিন তুমি আমারে আশ্যয় দিবা। মনে পড়ে পুরুষ?'

'পড়ে। কিছুই ভুলি নাই।'

'শোন পুরুষ—'

'কও—' তিলির মুখের দিকে তাকাল যোগেন।

'হ, কমু। কওনের লেইগাই নিশি রাইতে তোমার ঘুম ভাঙ্গাইছি।' বলে একটু থামল তিলি। বুকের ভিতর আটকানো বাতাসটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল। আবার শ্বাস টানল। তারপর বলতে লাগল, 'মায়ের কাছে শুনছি, বাপের মুখে শুনছি, পিরথিমীর হগল মনিষ্যের মুখে শুনছি, সোয়ামী হইল হগল গুরুর গুরু। মাথার মণি। তমস্ত জনম তারে মাথাতেই রাখছি, তার মন যুগাইয়া চলছি। ভরা শরীলে ভরা যৈবনে পুড়ছি, জ্বলছি, খাক হইছি। তবু নিজের কথা ভাবি নাই। যৈবনের দিকে তাকাইয়া নিজের ভরা শরীলের দিকে তাকাইয়া বুক কাপছে। যুবতীর যৈবন কি তার নিজের বশে! ডরে অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া রাখছি। তবু সোয়ামী আমারে ফিরাও দেখল না।' এক মুহূর্ত উদাস হয়ে রইল তিলি। আবার শুরু করল, 'ফিরা ফিরা তুমার কাছে আইছি। তুমি সোয়ামীর কাছে ফিরাইয়া দিছ। সোয়ামীর লেইগা কি করছি আর কি না করছি, তুমি তো হগলই জান!'

'জানি।'

'কিন্তুক আর পারি না। আর পারুম না।' তিলি ক্ষেপে উঠল, 'আমারে নিয়া সোয়ামী আর ঘর করব না। আমারে বাইর কইরা দিছে।' বলতে বলতে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল তিলি। যোগেনের হাঁটুর উপর কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল, 'আমি আর ফিরুম না, ফিরুম না, ফিরুম না। তুমি আমারে নাও জামাই—'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল যোগেন। খানিকটা পর ধাতস্থ হয়ে দু হাতে তিলির মুখটা তুলে ধরল। বলল, 'অবুঝ হইও না—'

'না না, অনেক সইছি। আর পারি না, আর পারি না। হা ভগমান!' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল তিলি।

কান পেতে তিলির একটানা ফোঁপানি শুনতে লাগল যোগেন।

এক সময় কান্না থামল। মাঝে মাঝে থেমে থেমে কেমন এক ধরনের হেঁচকির মত শব্দ করতে লাগল তিলি। তার শরীরটা থির থির করে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ তার পিঠে একখানা হাত রাখল যোগেন। আস্তে আস্তে বলল, 'চল, তুমারে ঘরে দিয়া আহি—'

ধাঁ করে মুখ তুলল তিলি। রুক্ষ চুল ভেঙে মুখময় ছড়িয়ে রয়েছে। চোখের জলে মুখ ভিজে গেছে। চোখের পাতা ফুলে উঠেছে।

তিলির গলা চিরে তীক্ষ্ন ধারাল শব্দ বেরুল, 'কী কইলা?'

গাঢ় কুয়াশা চুঁইয়ে যেটুকু চাঁদের আলো এসেছে তাতে তিলির মুখটা ঠিকমত বোঝা যায় না। যেটুকু বোঝা যায়, তাতেই চমকে উঠল যোগেন। ভয়ে ভয়ে বলল, 'চল, তুমারে ঘরে দিয়া আহি—' তিলির সম্বন্ধে সে মনঃস্থির করে উঠতে পারছে না। আসলে সংসার সমাজ লোকনিন্দা—এ সবই তার ভাবনাকে ঘিরে আছে।

'ঘর !' আচমকা শব্দ করে হেসে উঠল তিলি। হাসির দাপটে তার দেহটা ভেঙেচুরে যেন একটা ডেলা পাকিয়ে যাবে। হাসতে হাসতেই সে বলল, 'ঘর তুমি কারে কও! চাইর পাশে চাইর খান বেড়া আর উপ্‌রে একখান চাল থাকলেই ঘর হয়! আ গো প্‌রুষ—'

বিব্রত গলায় যোগেন বলল, 'তোমার সোম্‌সার—'

'সোম্‌সার! হ, আমারই সোম্‌সার!' বলেই চুপ করে গেল তিলি।

জঙ্গলের মাথায় সাগর পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। একসময় মনে হল, চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। রাত আর বেশি নেই। একটু পরেই ভোর হয়ে যাবে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রানজিট ক্যাম্পটা জেগে উঠবে। চেইনম্যান, পাটোয়ারী, রাঁচী কুলী এবং নানা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পালসাহাব এসে পড়বে।

নিজেকে শক্ত করে নিল যোগেন। রুক্ষ গলায় বলল, 'ওঠ—'

'ক্যান ?'

'তাতাতারি ওঠ। লষ্ট মাগী!'

যোগেনের গলার আওয়াজ শুনে তিলি চমকে উঠল। কিন্তু উঠল না।

এবার একটা হাত ধরে টান মেরে তিলিকে দাঁড় করিয়ে দিল যোগেন। বলল, 'ঘর-সোম্‌সার-সোয়ামী ছাইড়া নিশি রাইতে লাগরের কাছে আইছ! কুচরিত্তির, ডাকাবুকা মাগী!'

তিলি থতমত খেয়ে গেছে। সেই সুযোগে তাকে টানতে টানতে ট্রানজিট ক্যাম্পটার দিকে নিয়ে চলল যোগেন।

যে মেয়েমানুষ লজ্জা-নিন্দা-ভয় আর শরম-ভরমের মাথা খেয়ে ঘরের বার হয়েছে তার থতমত ভাব কতক্ষণ থাকে! যোগেনের হাত থেকে নিজের হাতটা ছুটিয়ে নিয়ে তিলি বলল, 'তুমার মতলবখান কী ?'

'কী আবার মতলব ?' যোগেন রুখে উঠল।

'আমারে কই নিয়া চললা ?'

যোগেন জবাব দিল না। হাত বাড়িয়ে তিলির হাতটা আবার ধরে ফেলল।

তিলি বলল, 'কথা কও না যে ?'

'কী কমু ?'

'আমারে কই নিয়া চললা ?'

'যেইখানে থাকলে তোমারে সব থিকা বেশি মানায় হেইখানে।'

'অ!' বলে একটু চুপ করে রইল তিলি। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'চল।'

তিলির হাত ছেড়ে দিল যোগেন। দু'জনে পাশাপাশি ট্রানজিট ক্যাম্পের ঝুপড়িগুলোর দিকে এগুতে লাগল।

তিলি ডাকল, 'জামাই—'

'কও।'

'আমি আবার আহ্নম। দেখ্নম, কয়বার তুমি আমারে ফিরাইতে পার। আমি জানি, বেশিদিন তুমি আমারে ঠেকাইয়া রাখতে পারবা না। হ গো প্নর্নষ—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল তিলি। অল্প একটু হাসল। তারপর সামনের ঝুপড়িতে ঢুকে গেল।

কিছ্নক্ষণ বিম্নঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল যোগেন। অস্ফুট গলায় বলল, 'মাইয়ামান্নষ, তোমার মনে কী আছে তুমিই জান!'

১৮

চারপাশে সম্নদ্র, মাঝখানে দ্বীপ। চারপাশে নোনা জল, মাঝখানে মিঠে মাটি। একদিন মাটি কোপানো, আগাছা বাছা শেষ হল। এখন শ্নধ্ন অঝোর ধারায় কয়েক পশলা বৃষ্টির অপেক্ষা।

বীজদানা বোনার পক্ষে এটা স্নদিনও নয়, মরসুমও নয়। কিন্তু স্নদিন বা মরস্নম না হলে কি হবে, পালসাহাবের তর আর সয় না। পাগলা সেই যে স্বপ্ন দেখেছে, উত্তর আন্দামানের কুমারী মাটি ফসলে ফসলে ভরে যাবে, তাতেই সে বিভোর হয়ে আছে। চোখ থেকে সেই স্বপ্নটা কিছ্নতেই ম্নছে যাচ্ছে না।

শীতের এক মধ্য দ্নপ্নরে মান্নষগ্নলো বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে এসেছিল। এখন চৈত্র মাস যায় যায়। প্নরো তিনটে মাস তারা এখানে কাটিয়ে দিল।

আসল বর্ষা শ্নর্ন হবে সেই আষাঢ়ে।

কিন্তু এখন, এই চৈত্রে সমস্ত আন্দামান দ্বীপ জ্নড়ে একটা অসময়ের বর্ষার মহড়া চলে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আচমকা একটা মৌসুমী বাতাস ওঠে। সেই বাতাসটা পোড়া তামারঙের টুকরো টুকরো অসংখ্য মেঘকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে এই দ্বীপের মাথায় এনে তোলে। এখানে এসে মেঘগ্নলো জমাট বেঁধে যায়। আকাশটা আড়াআড়ি ফেঁড়ে বিদ্নৎ চমকায়। আকাশ-জোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় যেন গ্নর্ন গ্নর্ন ঘা পড়ে।

আকাশের সাজসজ্জা শেষ হলে এক সময় বৃষ্টি শ্নর্ন হয়ে যায়। সীসার ফলার মত অজস্র ধারায় বর্ষা নামে।

পালসাহাবের ইচ্ছা, অসময়ের বর্ষার জল পেয়ে মাটি নরম হলেই বীজদানা প্নঁতবে। ফসল ফল্নক আর নাই ফল্নক, জঙ্গলের ম্নখ থেকে যে মাটি পাওয়া গেল তার গর্ভিণী হওয়ার ক্ষমতা কতখানি অন্তত তা পরখ করা যাবে।

নৈর্ঋত কোণের মৌসুমী বাতাস যদিও উঠল, মেঘ আর আসে না। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে উঠল পালসাহাব। খুব একচোট খিস্তি করল, 'শালে, হারামীর বাচ্ছা—'

কিন্তু আন্দামানের মেঘ তার খাস তালুকের প্রজা নয় যে তার হুমকিতে ছুটে আসবে।

জমি চৌরস হয়ে গেছে। এখন মানুষগুলোর হাতে কোন কাজ নেই। অগত্যা বাঁশ খুঁটি বেতপাতা কাঠ পেরেক—ঘর তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম মানুষগুলোকে বাটোয়ারা করে দিল পালসাহাব। ঘর তোলার জন্য জমি মাপ-জোখ করে দিল। বলল, 'এবার আপনা আপনা কোঠি বানিয়ে নে। বিশ রোজের মধ্যে কোঠি বানানো শেষ করা চাই।'

বিশ দিনের মধ্যেই ঘর উঠে গেল। ট্রানজিট ক্যাম্প ছেড়ে সবাই যে যার ঘরে গিয়ে উঠল।

কুড়ি দিন পরও আকাশের অবস্থা যেমনকে তেমন। এখনও মেঘের দেখা নেই।

আজকাল ফেল্ট হ্যাটটা খুলে ভুরু কুঁচকে প্রায়ই আকাশের দিকে তাকায় পালসাহাব। বিরক্ত গলায় গজ গজ করে, 'আশমানের মর্জি বোঝা যায় না। শালে আওরতের দিলের মাফিক বেতবির্য়ৎ। কোন বার বারিষ (বর্ষা) আগে আসে, কোন বার মাঙলেও আসে না।'

আজ 'ক্যাশ ডোল' দেওয়ার তারিখ।

'ডোল' অর্থাৎ সরকারী খয়রাত। উদ্বাস্তুরা আন্দামানে আসার পর থেকে পূর্ণ বয়স্কদের জন্য মাসিক মাথা পিছু পনের টাকা আর চোদ্দ বছরের নীচের বাচ্চাদের জন্য দশটাকা হিসাবে 'ডোল' বরাদ্দ আছে।

ব্যবস্থা আছে, যতদিন না আন্দামানের মাটিতে ফসল ফলবে, পুনর্বাসন ঠিকমত হবে, যতদিন না উপনিবেশ গড়ে উঠবে, ততদিন এই মানুষগুলো সরকারী সাহায্য পাবে।

পালসাহাবের ঝুপড়ির সামনে মানুষগুলো 'ডোল' নেবার জন্য জমায়েত হয়েছে।

এখন দুপুর।

মাথার ওপরে নির্মেঘ নীল আকাশ ঝকমক করছে। যতদূর যেদিকে খুশি তাকানো যাক, কোথাও এক টুকরো মেঘের চিহ্ন নেই।

এক ঝাঁক সাগরপাখি অনেক উঁচুতে ডানা ছড়িয়ে ঝিম মেরে আছে। তাদের ডানা নড়ে কি নড়ে না। আকাশ থেকে আগুনের আঁচ এসে এই দ্বীপের ওপর পড়েছে। বসে বসে মানুষগুলো ঘামছে।

নীচু একটা বাঁশের মাচানে বসে আছে পালসাহাব। তার সামনে একটা

উ'চু বাঁশের টেবিল। টেবিলের উপর থাকে থাকে এক টাকা, দু টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট আর রেজগি সাজানো।

পালসাহাব নাম ডাকছে, 'রসিক শীল—'

ভিড়ের ভিতর থেকে রসিক শীল উঠে এল।

পালসাহাবের এ পাশে পাটোয়ারী আতমন সিং, আর এক পাশে মা-তিন। মা-তিনও পালসাহাবের সঙ্গে কাজে নেমে পড়েছে।

আতমন সিং খাতায় রসিক শীলের টিপসই নিল। মা-তিন তাকে হিসাব করে গুনে ডোলের টাকা দিল।

পালসাহাব আবার হাঁকল, 'চন্দর করাতি—'

ভিড়ের মধ্য থেকে আর একজন উঠে দাঁড়াল।

সবাইকে ক্যাশ ডোল বুঝিয়ে দিতে দিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

তুলোর মত সাদা মিহি কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে এখন। সমুদ্রের দিক থেকে সব পাখি সারা দিন পর দ্বীপে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

রাঁচী কুলী ধানোয়ার চারপাশে চারটে পাটের মশাল জ্বালিয়ে দিল।

দুপুরে রসিক শীলেরা যখন ক্যাশ ডোল নিতে এসেছিল, তখনই পালসাহাব বলে রেখেছিল, 'শালে লোগ, ডোলের রুপেয়া পেলেই ভাগবি না। তোদের সাথ বহুত বাত আছে।'

কাজে কাজেই সরকারী খয়রাত বুঝে পেয়েও কেউ উঠে যায় নি।

ডোল দেওয়ার পর যে টাকা বে'চেছে সেগুলো একটা বেতের বাক্সে পুরে তালা আঁটল পালসাহাব। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'এ রসিক শীল, এ যুগেন, এ বুড্ঢী, এ বুড্ঢা এ জওয়ান, এ জওয়ানী—'

তিনটে মাস এক সঙ্গে এই দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে মানুষগুলো বুঝে ফেলেছে, চিল্লাচিল্লি করাটা পালসাহাবের স্বভাব। কথায় কথায় সে বলে, 'শালে লোগ'। শব্দটা তার কথার মাত্রা। খিস্তি করাটা তার অভ্যাস।

পালসাহাবের চিল্লানিতে মানুষগুলো খাড়া হয়ে বসল।

পালসাহাব বলতে লাগল, অন্য সব সালে এর আগেই বারিষ নামে। লেকিন এবছর আশমান যে কি মতলব করেছে—'কথাটা পুরো না করেই সে থেমে গেল।

জটলার ভিতর থেকে হারাণ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'একটা কথা কমু পালসাহাব?'

'কী কথা?' ফেল্ট হ্যাটটা কপালের ওপর তুলে পালসাহাব জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'মাটি তো কুপাইলাম, ঘর বানাইলাম। জল তো নামে না। বীজদানা রুইতে পারি না। অখন কী করুম? বিষ্টির আশায় কয়দিন বইসা থাকুম?'

'আরে হারামী—ইধর আয়—'

ভয়ে ভয়ে সাহাবের কাছে এসে দাঁড়াল হারাণ।

হারাণের একটা হাত ধরে সস্নেহে পালসাহাব বলল, 'আমিও তো একই বাত ভাবছিলাম। তোদের সাথ একটা পরামর্শ করব। আমার মাথায় এক মতলব এসেছে।'

'কী মতলব?' সামনের লোকগুলো বলে উঠল।

'সবুর শালেরা, সবুর—' পালসাহাব ধমকে উঠল। পরক্ষণেই নরম গলায় শুরু করল, 'তামাম জিন্দগী ডোলের ওপর ভরসা করে বাঁচা যায় না। সরকারী ভিক্ষের ওপর দো রোজ, দশ রোজ, বড় জোর এক সাল দো সাল চলে। কী বলিস তোরা?'

'হ। হে তো ঠিক কথাই।' একসঙ্গে সকলে সায় দিল।

'হাত আছে, পা আছে, মগজ আছে, বুদ্ধি আছে, খাটবার তাগদ আছে, তবে ভিক্ষে করে জিন্দগী চালাবি কেন?'

'ঠিক কথা।' মানুষগুলো মাথা নাড়ে।

'মানুষ হয়ে জন্মেছিস, মানুষের মাফিক বাঁচবি।' বলে একটুক্ষণ কি যেন ভেবে নিল পালসাহাব। তারপর বলতে লাগল, 'কিসমতের দোষেই হোক আর যাতেই হোক, তোরা ঘরবাস্তু হারিয়েছিস। এই জাজিরাতে এসে আবার ফিরেও পেয়েছিস। কেমন কিনা?'

'হ পালসাহাব—'

'এখানেই তোদের জিন্দগী বানিয়ে নিতে হবে।' সবার মুখের উপর দিয়ে, চোখদুটো একবার ঘুরিয়ে নিয়ে গেল পালসাহাব। বলতে লাগল, 'শোন শালেরা আমার মাথায় এক মতলব এসেছে।'

'কন—'

'মাহিনা খতম হলেই তোরা ক্যাশ ডোল পাস। পাস কি না?'

'হ, পাই।'

'আসছে মাহিনা থেকে ক্যাশ ডোল আর পাবি না।'

মানুষগুলো আঁতকে উঠল, 'ক্যাশ ডোল না পাইলে খামু কী? অহনও জল নামল না, বীজ রুইলাম না, ফসল ফলল না। খামু কী?'

পালসাহাব জবাব দিল না। তার চোখ দুটো সামনের মানুষ, দূরের কুয়াশা, আরো দূরের আবছা জঙ্গল পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

মাস যেই কাবার হয়, কানুন অনুযায়ী এই মানুষগুলো সরকারী ডোল পায়। পালসাহাব লক্ষ্য করে দেখেছে, সেটেলমেণ্টের বেশির ভাগ লোকই এই খয়রাতের উপর নির্ভর করে থাকে। ডোল পাওয়ার নির্ভরতা আছে বলেই তার মনে হয়, মানুষগুলো যতটা দরকার ততটা খাটে না। কিন্তু ভাঙাচোরা বিকল জীবনকে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে এই মানুষগুলোকে আরো খাটতে হবে। এই মানুষগুলো মাটি কুপিয়েছে, জমি

বানিয়েছে, ঘর তুলছে, সবই ঠিক। কিন্তু এ তো সবে শুরু। আরো চাই। আরো ঘাম, আরো শ্রম।

শুধু শ্রম আর ঘামই কী? আরো অনেক কিছুই চাই। পদ্মা-মেঘনা পারের মাটি খুইয়ে এসে মানুষগুলো এই দ্বীপটাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। পালসাহাব তা জানে। কিন্তু মাটির প্রতি ভালবাসাই তো শেষ কথা নয়। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসে পায়ের তলায় যে আশ্রয় তারা পেয়েছে, বাঁচার জন্য সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তা আঁকড়ে ধরতে হবে।

অনেক দুঃখে তারা এই দ্বীপ পেয়েছে। অনেক নোনা জল ঠেলে এসে এই মাটি মিলেছে। এই মাটির জন্য আরো তাপ, আরো মমতা চাই। পালসাহাব ভেবেছে। এই মানুষগুলোর মন আরো দ্বীপমুখী করে দিতে হবে।

শুধু কি দ্বীপমুখী? এদের জীবনমুখী না করা পর্যন্ত যে তার শান্তি নেই, তার থামা চলবে না। তার সব স্বপ্ন, সব আয়োজনই যে তা হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পালসাহাব জানে, এই মানুষগুলো তার ইচ্ছায় চলে ফেরে ওঠে বসে। তার ধমকে খায়, ঘুমোয়। দু চার জন ছাড়া বাকি সকলেই কেমন যেন ঠাণ্ডা নির্জীব বিকল। কিন্তু এমন করে, এই পঙ্গু মানুষগুলোকে সম্বল করে তো এই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপে জীবন গড়া যায় না।

পালসাহাবের মনের গঠনটা অদ্ভুত। নিজের নিয়মে সে এই মানুষগুলো সম্বন্ধে অনেক কথা ভেবেছে।

দেশভাগ এই মানুষগুলোকে সাতপুরুষের ভিটেমাটি, জমিজিরেত থেকেই শুধু উৎখাত করে নি, সুস্থ সহজ স্বাভাবিক জীবন থেকেও উন্মূল করে ফেলেছে। দেশভাগের পর ভাসতে ভাসতে তারা সরকারী উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এসে মাথা গুঁজেছিল। ন' দশ বছর ক্যাশ ডোল আর সরকারী খয়রাতের ওপর তারা বেঁচে ছিল।

দেশভাগ তাদের ঘরছাড়া করেছে। উদ্বাস্তু ক্যাম্পের ন' দশ বছরের জীবনে তারা সব খুইয়েছে। মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে মোটামুটি জীবনের যে ধর্মগুলো মেনে চলতে হয়, ক্যাম্পে এসে সেগুলোও তারা হারিয়ে ফেলেছে। ক্যাম্প তাদের ক্যাশ ডোল, খয়রাত এবং ভিক্ষের উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছে। নিজের খাদ্য যে নিজেকে জুটিয়ে নিতে হয়, নিজের জীবন যে নিজের নিয়মে গড়ে তুলতে হয়, মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে সব কিছুই যে নিজেকে অর্জন করতে হয়, জীবনের এই সোজা, মোটা দাগের কথাটা ক্যাম্পে এসে তারা ভুলে গেছে। খয়রাতের উপর নির্ভর করাটা এদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

পালসাহাব লক্ষ করে দেখেছে, জমি কোপানো, মাটি চৌরস করা, ঘর বানানো হোক আর না হোক, তাতে বিশেষ কিছুই যায় আসে না। মাস কাবার

হলে ক্যাশ ডোল তো মিলবেই এমন একটা মনোভাব মানুষগুলোর মধ্যে কাজ করে।

পালসাহাব ভেবেছে, এদের ঘা দিতে হবে। সরকারী খয়রাতের ওপর এদের নির্ভরতা, নিশ্চিন্ততা ঘুচিয়ে দিতে হবে।

ক্যাশ ডোল বন্ধ করে দেবে পালসাহাব। অবশ্য তেমন দরকার হলে ডোল দিতেই হবে। ভিক্ষের ওপর এই মানুষগুলো বেঁচে থাকুক, পালসাহাব তা চায় না।

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল পালসাহাব। হঠাৎ সেটা ছুটে গেল।

মশাল চারটে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে জ্বলছে। কুয়াশা আর অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হচ্ছে। আবছা আলোতে মানুষগুলো এখনও বসে রয়েছে। ঠিক বসে নেই, অনুচ্চ ভোঁতা চাপা গলায় তারা কাঁদছে।

ফেল্ট হ্যাটটা মাথায় ঠিক করে বসাল পালসাহাব। মোটা ভুরু দুটো কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। চোখের বাদামী রঙের ঘোলাটে মণি দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। নাকের মাথাটা ফুলতে লাগল। নাকের ফুটো থেকে পাঁশুটে রঙের রোঁয়া বেরিয়ে পড়েছে। সেগুলো নড়তে লাগল। পাল-সাহাব উত্তেজিত হলে রোঁয়াগুলো নড়তে থাকে। রোমশ চওড়া বুকের উপর বিরাট এক থাপ্পড় মেরে পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'এ শালে ভেড়ীর বাচ্চারা, কাঁদছিস কেন?'

মুহূর্তে কান্নার শব্দটা থেমে গেল।

পালসাহাব গজ গজ করতে থাকে, 'শালে লোগদের খালি কান্না আর কান্না। পয়দা হবার পর কুত্তাগুলো খালি কাঁদতেই শিখেছে।'

কান্নাটা থেমে এসেছিল। কিন্তু আবার শোর তুলে সবাই কাঁদতে শুরু করল।

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল পালসাহাব। সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে চিল্লাল, 'আবার, আবার! যে শালে কাঁদবে, তাকে কোতল করে ফেলব।'

ভিড়ের মধ্য থেকে রসিক শীল উঠে দাঁড়ায়। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, "কান্দুম না তো কী করুম? আমাগো কপালই হইল কান্দনের। হা ভগমান—'

'এ কুত্তা, যা বলবি সিধা করে বল। অত ভ্যাজর ভ্যাজর আমি শুনতে চাই না। বল্—' বলতে বলতে রসিক শীলের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

পালসাহাবের মারমুখী চেহারা দেখে রসিক শীল ভয় পেয়ে গেল। যা বলতে চেয়েছিল, বলতে পারল না। গোরুর মত অবোধ, ভয়-ভয় চোখে পালসাহাবের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এবার আর পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল না। রসিক শীলের পিঠে একটা হাত রেখে নরম গলায় আস্তে আস্তে বলল, 'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? ডর নেই।'

ডাইনে বাঁয়ে দু পাশে মাথাটা ঝাঁকিয়ে সে বলতে লাগল, 'না, কোন ডর নেই। যা বলতে চাস বলে ফ্যাল।'

রসিক শীল ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, বলবে কিনা। কথাটা শুনে পালসাহাব যদি ক্ষেপে ওঠে? বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এক সঙ্গে এতগুলো দিন কাটিয়েও তারা এই লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কখন কোন কথায় যে পালসাহাব রেগে উঠবে, কোন ব্যাপারে যে তার মেজাজ খুশি থাকবে, আগে থেকে তার হদিস মেলে না।

রসিক শীলের মনের কথাটা বুঝি পড়েই ফেলল পালসাহাব। তার দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ফুটল। সে বলল, 'মেজাজটা আমার বহুত বেতমিয়ৎ। সে জন্যে ঘাবড়াবি না—সমঝাচ্ছিস?'

বিড় বিড় করে রসিক শীল কি যেন বলল, ঠিক বোঝা গেল না। তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না।

পালসাহাব বলল, 'বলে ফ্যাল, বলে ফ্যাল—জলদি কর—'

কাঁপা কাঁপা গলায় রসিক শীল শুরু করল, 'সাহাব বাবা, আমি কই কি ক্যাশ ডোল বন্ধ হইয়া গেলে খামু কী?'

'খাবি কী!' পালসাহাব যতই ভেবেছিল, মেজাজ খারাপ করবে না, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। ভেংচে ভেংচে সে বলল, 'কী আর খাবি। আশমানের হাওয়া আর কিলপণ্ড নদীর পানি গিলে জান বাঁচাবি। আর কুছু মিলবে না। শালে লোগদের সিরফ খাওয়ার কথা! দুনিয়ায় খাওয়া ছাড়া আর কোন বাতই যেন নেই। কুত্তা কাঁহাকা, হারামী কাঁহাকা—' এক দমে বিশ পঁচিশটা খিস্তি আউড়ে যায় পালসাহাব।

সামনের মানুষগুলো এক একবার শোর তুলে কেঁদে ওঠে। আবার তাদের কান্নাটা ঝিমিয়ে পড়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কান্নার শব্দ শুনল পালসাহাব। জোরে জোরে বাতাস টেনে ফুসফুস ভরিয়ে তুলল। তারপর বলল, 'কাঁদিস না, কাঁদিস না—বাত শোন্। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। হাঁ হাঁ, তোদের গেলা যাতে বন্ধ না হয়, তার মতলব—'

মানুষগুলো কান খাড়া করে বসল। পালসাহাব বলতে লাগল, এই জাজিরার জঙ্গলে হরিণ আর শুয়োর আছে। মেরে মেরে খাবি। খাবার পর যে গোস্ত বাঁচবে, মায়া বন্দরে আমি বেচে দেব। হরিণের ছাল আর শিং পুট বিলাসে (পোর্ট ব্লেয়ার) নিয়ে বেচব। তাতে তোদের রোজগার হবে। হবে কি না?'

মানুষগুলো ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

"আরো ধান্দা আছে।' পালসাহাব রোজগারের অনেক উপায় বাতলে দেয়।

ধানের জমির পাশ দিয়ে সরু একটা খাল এঁকে বেঁকে পাক খেতে খেতে সোজা এরিয়াল উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। ডিগলিপুরের খাল।

বছরের সব ঋতুতে ডিগলিপুরের খালে মাছ মেলে। নানা জাতের সামুদ্রিক মাছ। পার্শে, সুরমাই, তারিণী, মায়া, লাল ভেটকি, পমফ্রেট—নোনা জলের মিঠে মাছ।

ব্যবস্থা হল, জঙ্গল থেকে প্যাডক গাছ কেটে তক্তা বানিয়ে নৌকা তৈরি করবে মানুষগুলো। পালসাহাব মায়া বন্দর থেকে সুতো কিনে আনবে। সেই সুতোয় ক্ষ্যাপলা জাল বুনে তারা ডিগলিপুরের খালে নৌকা ভাসাবে। মাছ মারবে। খাওয়ার পর যে মাছ বাঁচবে, সে সব মায়া বন্দরে বেচে আসবে পালসাহাব। এই দ্বীপের যেখানে যেটুকু পাওয়া যায়,—কাঠ, মাছ, হরিণ, শুয়োর—সব কিছুই নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে কাজে লাগাক তারা, পালসাহাবের এটাই ইচ্ছা।

শুধু কি হরিণ শুয়োর আর মাছ মারা, জীবিকার অন্য ফিকিরও পালসাহাবের মাথায় এসেছে। হঠাৎ সে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকল, 'এ বিন্দ্রাবন (বৃন্দাবন) শীল, মুলুকে থাকতে কোন্ কাম করতি ?'

'নাপিতের কাম।' ভিড়ের মধ্য থেকে একটা লোক উঠে দাঁড়াল।

এবার আর একটা লোককে ডাকল পালসাহাব, 'এ মহিন্দর, তুই কী করতি ?'

'সাহেব বাবা, আমি ছুতোর মিস্তিরি আছিলাম।'

একে একে সকলের খবর জেনে নিল পালসাহাব। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসার আগে কেউ ছিল ছুতোর, কেউ সোনারু, কেউ কামার, কেউ নাপিত, কেউ জেলে, কেউ মালাকার। নানান বৃত্তি নানান পেশার সব মানুষ।

পালসাহাব মনে মনে একবার ভাবল, আপাতত এত পেশার কাজ এই দ্বীপে মিলবে না। কিন্তু যাদের কাজ মিলবে, তাদের কিছুতেই সে বসিয়ে রাখবে না।

পালসাহাব বলল, 'আসল বারিষ আসতে বহুত দেরী। এত রোজ বসে থাকলে চলবে না। তা ছাড়া খালি মিট্টির ওপর ভরসা করলেই তো চলবে না, রুজির অন্য সব ফন্দি দেখতে হবে।'

পালসাহাব সব বন্দোবস্ত করে দিল। যতদিন এই দ্বীপে বর্ষা না নামে, ততদিন একদল মাছ মারবে, হরিণ-শুয়োর মারবে। আর এক দলকে নিয়ে শহর পোর্ট ব্লেয়ার যাবে পালসাহাব। সেখানে সুবিধামত কাজে তাদের লাগিয়ে দেবে। আসল কথা, সকলকে নিজের নিজের রুজি রোজগার করে নিতে হবে।

ক্যাশ ডোল বন্ধের নাম' শুনে মানুষগুলো সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল। পালসাহাবের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে তারা আবার বাঁচার ভরসা পেয়েছে। আশা পেয়ে ভরসা পেয়ে তাদের চোখগুলো চকচক করতে থাকে।

পালসাহাব বলে, 'কি রে, সবাই কাম করবি তো ? রাজীবাজী ?'

মাথা নেড়ে সবাই সায় দেয়—তারা রাজী।

১৯

এখন আর ট্রানজিট ক্যাম্পে নয়। ঘর তুলে মানুষগুলো গৃহী জীবন ফিরে পেয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে পুরোদস্তুর ঘর-সংসার পাতার উৎসব শুরু হয়ে গেছে।

হারাণ আর হারাণের ঠাকুমা উজানী বুড়ী—এই দু'জনকে নিয়ে একটা আস্ত সংসার।

দু'জনের সংসারের নানা টুকিটাকি কাজ সেরে দুটি ভাত ফোটাতেই দিন কাবার করে ফেলে উজানী বুড়ী।

হাত আর তার চলতেই চায় না। চলবেই বা কেমন করে? বয়স কি কম হল? তিন কুড়ি পুরিয়েও দু তিন বছর বুঝি পার হতে চলল। বয়সের সঠিক হিসাব উজানী বুড়ী রাখে না।

কাঠ বাঁশ পেরেক দাঁড়—সরকারী সরঞ্জাম পেয়ে হারাণ একখানা মাঝারি আকারের দোচালা ঘর তুলেছে।

বেতপাতার পুরু ছাউনি, চারপাশে ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া, নীচে মাটি থেকে হাত দুই উঁচু বাঁশের পাটাতন। পাটাতন না করে উপাই নেই। রাজ্যের পোকামাকড়, সাপ-বিছে-জোঁক তা হলে ঘরে ঢুকে পড়বে।

ঘরটার সামনের দিকে এক টুকরো সমতল জমি। সেখানে বুক সমান উঁচু চেঁচা ঘাস গজিয়ে ছিল। ঘাস সাফ করে ফেলেছে হারাণ। মাটি নিকিয়ে উঠোন তকতকে করে তুলেছে উজানী বুড়ী।

উঠোনের এক ধারে শুকনো পাতা, গাছের ডাল আর কাঠ ডাঁই করা। আর এক ধারে একটা দো-আখা (দু মুখো উনুন) বানানো হয়েছে।

সে দুপুরে ভাত চাপিয়েছে উজানী বুড়ী। ভাত আর ফোটে না এদিকে বেলা প্রায় হেলতে চলেছে।

এবার ক্যাশ ডোল পেয়ে লাল লাল মোটা মোটা কি চালই যে এনেছে হারাণ! সহজে আর সেদ্ধ হতে চায় না।

আখার মুখে শুকনো পাতা, সরু সরু ডাল গুঁজে দিচ্ছে উজানী বুড়ী আর বিড় বিড় করে কি যেন বকছে।

গায়ের ঢিলে চামড়া কুঁচকে কুঁচকে গেছে তার। গাল ভেঙে তুবড়ে রয়েছে হনুর হাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। পাটের ফেঁসোর মত এক মাথা চুল। দু মাড়িতে গোটা সাতেক কালো কালো ভাঙা দাঁত। সব সময় মাথাটা অল্প অল্প

কাঁপে। পিঠটা বেঁকে কুঁজের মত দেখায়। যত সে কথা বলে, তার চেয়ে ঠোঁট দুটো অনেক বেশি নড়ে।

ভাত ফুটতে ফুটতেই হারাণ এসে পড়ল।

জল-কাদা মেখে হারাণের মূর্তি যা খুলেছে! গোঁজের খোঁচা খেয়ে গায়ের চামড়া অনেক জায়গায় কেটে গেছে। ফলে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ঘাড়ের কাছে দুটো জোঁক লেগে রয়েছে। হারাণের ভ্রুক্ষেপ নেই।

উঠোনের এক কোণে জাল আর একটা ছোট সুরমাই মাছ নামিয়ে রাখল হারাণ।

পালসাহাবের ব্যবস্থা অনুযায়ী জন কয়েক পোর্ট ব্লেয়ারে রোজগারের খোঁজে গেছে। হারাণ এই দ্বীপেই আছে। মাছ মারাই এখন তার কাজ।

সেই সকালে ডিগলিপুরের খালে গিয়েছিল হারাণ। দুপুর পর্যন্ত জাল বেয়ে বেয়ে বিস্তর মাছ মেরেছে। খাওয়ার মত ছোট একটা সুরমাই মাছ হারাণকে দিয়ে বাকি সব মাছ নিয়ে মায়া বন্দরে বেচতে চলে গেছে পালসাহাব।

চোখে মাছের আঁশের মত পুরু ছানি। ভুরুর ওপর একটা হাত রেখে চোখ আড়াল করে উজানী বুড়ী বলল, 'কে রে, হারাইণা আইলি?'

'হ, ঠাউরমা—'

'কি চাউল যে এইবার কিনা আনছস!—সেই কুন দুফারে আখার বহাইছি, ফুটতেই আর চায় না।'

হারাণ কিছুই বলল না। বাঁশের খুঁটিতে জাল টাঙিয়ে শুকোতে দিল।

রোদের তেজ মরে আসছে। জঙ্গলের দিক থেকে ঠাণ্ডা মৌসুমী বাতাস ছুটেছে। উজানী বুড়ীর কেমন যেন শীত শীত লাগে। বুড়ো বয়সে গায়ে শীতটা এমনিতেই বেশি বেঁধে। এই বয়সে রক্তের আগুন জুড়িয়ে যায়। ভেতর থেকে তাপ না পেলে শরীর কি গরম রাখা যায়! সিঁটানো হাত-পা আখার পাশে রাখে উজানী বুড়ী। গনগনে আগুনের তাপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেঁকতে সেঁকতে বিড় বিড় করতে থাকে, 'আর পারি না। কুন সময় ভাত ফুটব, কুন সময় মাছ রান্ধুম আর কুন সময় যে হারাইণারে খাইতে দিমু—'

উঠোনের আরেক ধারে বসে ডলে ডলে গায়ের কাদা তুলছিল হারাণ।

উজানী বুড়ী ডাকল, 'হারাইণা—'

'কী ক'স ঠাউরমা?'

'এহানে আয় দেখি—'

উঠে এসে উজানী বুড়ীর পাশে বসল হারাণ।

ছানিপড়া ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ হারাণের দিকে তাকিয়ে রইল উজানী বুড়ী। নাতির মুখটা দেখে নিল। কথাটা বলবে কি বলবে না, একবার ভাবল।

হারাণ বলল, 'কিছু কইতে চাস ঠাউরমা?'

'হ।' কীভাবে শুরু করবে, মনে মনে একবার তা ভেঁজে নিল উজানী বুড়ী। তারপর বলল, 'বুঝলি সোনা ভাই, এই আন্ধারমান দ্বীপে আইসা আমরা মাটি পাইলাম।'

হারাণ আস্তে একটা শব্দ করল, 'হে তো পাইলাম।'

'ঘর পাইলাম।'

'হ। তাতে হইছে কী?'

'আগে শোন্। জমিনে এইবার ধান ফলব। ধান হইলে আর ভাবনা নাই। আমরা না খাইয়া মরুম না।'

হারাণ বিরক্ত হয়ে উঠল, 'এই কথা তো দুই বছরের একটা ছাও জানে।'

'হ-হ, এই কথা হগলে জানে।' বলে একটু থামে উজানী বুড়ী। শুকনো ফোগলা মুখে অল্প হাসে। কালচে মাড়ি দুটো বেরিয়ে পড়ে। সে বলতে থাকে, 'আর একখান কথা আছে রে দাদা—'

'তরাতরি কইয়া ফালা—'

'হ, কই।' উজানী বুড়ী বলল, 'ঘর বসত, জমি জিরাত—হগলই যহন ফিরা পাইলাম, এইবার আমার মনের সাধখানা মিটাইয়া দে ভাই। কয়দিন আর বাচুম! বুড়া হইছি, কোনদিন দেখবি, উজানী বুড়ী চোখ বুজছে।'

'তর মতলবখানা কী ঠাউরমা?' চোখ কুঁচকে উজানী বুড়ীর দিকে তাকাল হারাণ।

'একা একা আর কতদিন থাকুম? এইবার আমারে এট্টা সতীন আইনা দে। দুই সতীনে মনের সুখে চুলাচুলি করি।'

'কী কস ঠাকুরমা—তর মাথাখান কি খারাপ হইল!'

'ক্যান রে ভাই?' হারাণের পাশে আরো ঘন হয়ে বসল উজানী বুড়ী। বলল, 'আমার মাথা খারাপ হইব ক্যান? মাথা আমার ঠিকই আছে। তুই এট্টা বিয়া কর হারাণ। বুড়া বয়সে নাতিন বউ লইয়া এট্টু লাড়াচাড়া করি।' বলতে বলতে হঠাৎ দু হাতে চোখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল উজানী বুড়ী।

হারাণ ভয় পেল। বুড়ীর কান্না একবার শুরু হলে সহজে থামতে চায় না। নরম গলায় সে বলল, 'কান্দিস না ঠাকুরমা—'

চোখ থেকে হাত সরিয়ে এবার কপাল চাপড়ায় উজানী বুড়ী। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে আর বলে, 'কী আছে আমার? স্বজন নাই, বান্ধব নাই, পুত নাই, পুতের বৌ নাই—হগলেরে খাইয়া বইছি। আমি শুগীতাপী (শোকতাপ পাওয়া) মানুষ। পিরথিমীতে কেউ নেই আমার। থাকার ভিতর তুই এট্টা মাত্তর নাতি। তুই যদি আমার সাধটা না মিটাস, কে মিটাইব? আর কে আছে?'

'অবুঝ হইস না ঠাকুরমা, উতলা হইস না—' উজানী বুড়ীর একটা হাত ধরে হারাণ। তারপর উদাস গলায় বলে, 'অহনও ধান ফলল না, প্যাটের চিন্তা ঘুচল না। পালসাহাব ক্যাশ ডোল বন্ধ কইরা দিব পরের মাস থিকা। দুইটা

প্যাটই ভরাইতে পারি না। এইর মধ্যে আর একখান প্যাট আইয়া জুটলে উপাস দিয়া মরতে লাগব।'

হঠাৎই কান্না থামাল উজানী বুড়ী। বলল, 'আ আমার কপাল, তুই প্যাটের চিন্তা করস নিহি (নাকি)! ভগবান যখন প্যাট দিছে, হেই প্যাট ভরানের ব্যবস্থাও কইরা দিব।'

হারাণকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সে বলল, 'কি ভাবস রে সোনা? কার কথা?'

'কিছুই না, কারো কথা না।' বলেই চুপ করল হারাণ।

উজানী বুড়ী এবার আসল কথাটা পাড়ল, 'বুঝলি ভাই, আমি তর কুনো আপত্তি শুনুম না। বৈশাখ মাসে তর বিয়া লাগাইয়া দিমু। শোন্ ভাই—'

'কও—'

'চন্দর আইছিল।'

'কুন চন্দর?'

'চন্দর জয়ধর। হেই যে গোয়ালন্দ থিকা এক গাড়িতে আমরা কইলকাতায় গাইছিলাম। এক লগে কেম্পে নয় দশ বচ্ছর কাটাইলাম। এক জাহাজে আন্ধারমান দ্বীপে আইলাম। মনে নাই?'

'আছে।'

'চন্দরের মাইয়া পাখি—' খাকারি দিয়ে ঘড়ঘড়ে গলাটা সাফ করে নিল উজানী বুড়ী। এক নাগাড়ে বলতে লাগল, 'পাখি তো বড়সড়, বিয়ার যুগ্যি হইয়া উঠছে। বড় ভাল মাইয়া—সোন্দর মাইয়া—'

'ভাল তো ভাল! সোন্দর তো সোন্দর! আমারে শুনাইয়া কি হইব?'

'তরে শুনামু না তো শুনামু কারে? তেমুন বান্ধব পামু কই? পাখিরে আমি সতীন করুম।'

'থাম্ বুড়ী—' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হারাণ। চেঁচাতে লাগল, 'আমি উই পাখি পুখিরে বিয়া করুম না।'

'তবে কারে বিয়া করবি রে শুয়োরের ছাও, উই রাইক্ষসীরে—' উত্তেজিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল উজানী বুড়ী।

খানিকক্ষণ থ মেরে দাঁড়িয়ে রইল হারাণ। কাপাসীর কথাটা তবে কি জেনে ফেলেছে ঠাকুমা!

উজানী বুড়ী চিলের মত চেঁচাতে লাগল। গলার শিরগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে উঠেছে। তীক্ষ্ণ, খ্যা খ্যাসে শব্দ করে সে বলতে লাগল, 'শুয়োরের ছাও, কথা কস না ক্যান? মনে করছস, আমার কান নাই, কিছুই শুনি না। মনে করছস, আমার চোখ নাই, কিছুই দেখি না। আমার মন নাই, কিছুই বুঝি না। বয়স হইছে তাই মনে করলি, আমি হগল খুয়াইছি। কিছুই খুয়াই নাই। হ রে বান্দর, কিছুই খুয়াই নাই।' পাটের ফেঁসোর

মত রুক্ষ চুল উজানী বুড়ীর। সেই চুল উড়ে এসে মুখটা ঢেকে ফেলেছে। ছানিপড়া ঘোলাটে চোখ দুটো ধক ধক করছে। বুক থেকে কাপড় খসে পড়েছে। শুকনো ঢিলে স্তন দুটো দুলছে। উত্তেজনায় বাঁকা দুমড়নো ছোট শরীরটা থর থর কাঁপছে।

উজানী বুড়ীর উগ্র ভয়ানক মূর্তির দিকে তাকিয়ে হারাণ তিন পা পিছিয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, 'কী জানস তুই ?'

'হগল জানি—' উজানী বুড়ী বলতে থাকে, 'আমি ক্যান, এই আন্ধারমান দ্বীপের হগলে জানে। উই লষ্ট কুচরিত্তির মাগীটার লগে তর ঢলাঢলি—'

ঠাকুমার কথা শেষ হবার আগেই হারাণ রুখে উঠল, 'চুপ মার মাগী। না হইলে তরে শ্যাষ কইরা ফালামু। লষ্ট কুচরিত্তির তুই কারে কস ?'

'কারে আবার রে ড্যাকরা! তর পরাণের বান্ধবরে। উই নিত্য ঢালীর মাইয়া কাপাসীরে। নাম তো কইলাম, এইবার জোকের মুখে লবণ পড়ল। কথা কস না ক্যান রে যমের অরুচি ? মাথায় কি ঠাটা (বাজ) পড়ল।'

'তুই তারে লষ্ট কস ঠাকুরমা, কুচরিত্তির কস!' বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকে হারাণ। উজানী বুড়ী যে কাপাসী সম্পর্কে এ ভাবে বলবে, শুনেও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না সে।

'যার শরীল লষ্ট হইয়া গেছে তারে কুচরিত্তির কমু না ? একশ' বার কমু। কী করবি তুই ? যার মুখ আছে হে এই কথা কইব। ঐ মাগী লষ্ট দুষ্ট কুচরিত্তির—' একটু থেমে কি যেন ভেবে নিল উজানী বুড়ী। তারপর হঠাৎ দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল, 'আমার সোনা দাদা, লক্ষ্মী ভাই, তুই উই রাইক্ষসীর কথা ভুইলা যা। ও তর মাথা খাইছে। আমার সব্বনাশ করছে। সব্বনাশী মাগী।'

উজানী বুড়ীর কান্নার শব্দ হারাণের কানে ঢুকছিল না। বিমর্ষ গলায় বলে, 'শরীলটা তার নষ্ট হইছে ঠিকই, কিন্তুক হেইতে তার দোষ কই ?'

হঠাৎই ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল উজানী বুড়ী, হঠাৎই আবার কান্নাটা থামিয়ে দিল। একদৃষ্টে হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝে নিল। তার পর টেনে টেনে বলতে লাগল, 'পরাণের বন্ধুরে লষ্ট কইলে কুচরিত্তির কইলে বড় লাগে, বুকে জ্বালা ধইরা যায়!'

হারাণ এবার আর কিছু বলল না।

উজানী বুড়ী গলা চিরে চেঁচাতে লাগল; 'কিন্তুক তা হইব না। পরাণ থাকতে আমি তা হইতে দিমু না।'

চিৎকার করে উঠল হারাণ, 'হইব, হইব, এক শ' বার হইব। আমার মনে যা আছে হেয়া করুম। পারলে তুই আমারে ঠেকাইস মাগী—'

'ওরে বিয়া করবি ? তা হইলে তর মনের সাধই মিটাবি ? উই লষ্ট পাগল মাগীটারে ঘরে আনবি ?' উজানী বুড়ীর চোখ দুটো ধক ধক করতে লাগল।

হারাণ সমানে চেঁচায়, 'হ—হ, কাপাসীরেই আমি বিয়া করুম। তারে এট্টু ভাল হইতে দে—'

হারাণের কথা শেষ হবার আগেই মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল উজানী বুড়ী। উপুড় হয়ে শুয়ে দু হাতে চুল ছিঁড়তে, মাটিতে মুখ ঘষতে আর কপাল ঠুকতে লাগল। বলতে লাগল, 'তর মনে যা আছে, কর। তর সাধই মিটারে শয়তানের ছাও। তার আগে আমারে মার, আমারে শ্যাষ কর। হেইর পর উই মাগীর কাছে যা। ভগবান গো, তুমার মনে এই আছিল! সব্বনাশী আমার সব্বনাশ কইরা ছাড়ল!'

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল উজানী বুড়ী।

২০

বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে পালসাহাব যেন জীবন-রসিক হয়ে উঠেছে।

এখন দুপুর।

এতদিনে আন্দামানের আকাশে মেঘ আসতে শুরু করেছে। নৈঋত কোণ থেকে মৌসুমী বাতাসের তাড়া খেয়ে পোড়া তামা রঙের টুকরো টুকরো মেঘ এই দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে।

সেটেলমেণ্টের মধ্যে দিয়ে অলস লক্ষ্যহীন গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পাল-সাহাব। মনটা আজ ভারি হাল্কা হয়ে রয়েছে। এই দুপুর, উজ্জ্বল রুপালী রোদ, চারপাশের ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গল—আজ সব কিছুই ভালো লাগছে।

অকারণে, নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়েও এক এক সময় মনটা বড় খুশি হয়ে ওঠে। চলতে চলতে মুখ তুলে একবার আকাশের মেঘ দেখে নিল পালসাহাব। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কয়েক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে।

অন্য সময় হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে মেতে উঠত পালসাহাব। কিন্তু এই মুহূর্তে মেঘের ভাবনাটা মনের মধ্যে বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। আর একটা ভাবনা পালসাহাবের মনটাকে পুরোপুরি দখল করে বসল।

মা-তিনকে নিয়ে সেই পোর্ট ব্লেয়ার থেকে লং অ্যাইল্যাণ্ড এসেছিল পাল-সাহাব, তারপর পনেরটা বছর পার হয়ে গেছে। এই পনের বছরের মধ্যে মাত্র বার কয়েক পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছে সে। জঙ্গলে থেকে থেকে শহর-বন্দরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে গেছে।

এতকাল এই অরণ্যের বাইরে সভ্য মানুষের জগতে কোথায় কি ঘটছে, সে সব সম্বন্ধে আদৌ মাথাব্যথা ছিল না পালসাহাবের। শহর বন্দরের কোন

খবরই রাখত না সে। আসলে জগতের বাইরের কোন ব্যাপারে এতটুকু কৌতূহল ছিল না তার।

পালসাহাবের স্বভাব অমার্জিত হলেও তাতে প্রচুর নিরাসক্তি মিশে আছে। এই নিরাসক্তি আর জঙ্গলের আদিম জৈবিক নিয়মের খাত বেয়ে জীবনটাকে সে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে ছিল আন্দামানের আদিম অরণ্য। ঝুপড়িতে ছিল মা-তিন। অরণ্য তাকে দিয়েছে আদিমতা, মা-তিন দিয়েছে স্থূল আর জৈবিক জীবনের আস্বাদ। মা-তিন আর এই দ্বীপের বনভূমিকে নিয়ে এক ফুৎকারে জীবনের এতগুলি বছর উড়িয়ে দিয়েছে পালসাহাব। এক আদিম নারী আর এক আদিম অরণ্য পালসাহাবকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল।

হয়ত মা-তিন আর অরণ্যকে নিয়ে মসৃণ নিয়মেই সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারত সে। কিন্তু একদিন তাল কাটল। বছর কয়েক আগে একবার পোর্ট ব্লেয়ার গিয়েছিল পালসাহাব। পুরনো আমলের দোস্ত, ইদ্রিস-রোশনলাল-সাহা-হামিদ, যাদের সঙ্গে সেলুলার জেলে কয়েদ খেটেছে, তাদের জনকতকের সঙ্গে জাহাজ ঘাটেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাদের একসঙ্গে ওখানে দেখে পাল-সাহাবের কেমন যেন ধন্দ লেগেছিল। কথাবার্তা বলে মনে হয়েছিল, ইদ্রিসরা কেমন যেন বদলে গিয়েছে। তাদের হালচালের সঙ্গে তার যেন খাপ খায় না।

শহর ঘুরে এসে পালসাহাব বুঝেছিল, সেই আগের শহরটা আর আগের মত নেই। একেবারে নতুন আনকোরা অদ্ভুত হয়ে গেছে।

পুরনো শহরে এখানে ওখানে জঙ্গল ছিল। জঙ্গল সাফ হয়ে গেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে পাক খেয়ে আঁকা বাঁকা নতুন নতুন সড়ক নানা দিকে ছুটেছে। নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। এবারডীন বাজারে, ফুংগি চাউংগে, ডিলানিপুরে, হ্যাডো আর চোলদাইতে জমজমাট বসতি গড়ে উঠেছে। একা জটিল ধাঁধার মধ্যে যেন গিয়ে পড়েছিল পালসাহাব।

শুধু কি শহরটাই, সেখানকার হালচাল, জমানা, কেতা, মানুষ সবই যেন বদলে গেছে।

হঠাৎই পালসাহাবের মনে হয়েছে এই শহর আর মা-তিন এবং জঙ্গলকে নিয়ে তার যে জীবন—এই দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। দুয়ের মধ্যে কোন মিল নেই। মনে হয়েছিল, শহরটা কারসাজি করে তাকে অনেক পেছনে ফেলে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

এই শহরটা যেমন আজব এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, এখানকার খবরগুলোও ঠিক তেমনি। অন্য বন্ধুরা, যারা একদিন তাকে দেখলে মেতে উঠত, প্রচুর কথা কইত, প্রচুর খিস্তি করত, তামাশা আর হল্লায় মশগুল হয়ে পড়ত, তারা পাল-সাহাবের সংগে দু কথা বলেই সরে পড়ল। তাদের নাকি হরেক কাজ, হরেক হুজ্জুত, বহু ঝামেলা। পুরনো দিনের সেই তাপ আর নেই। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

শুধু ইদ্রিসই পুরনো দোস্তের সংগে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল। তার হাল হকিকতের খবর নিয়েছিল আর অদ্ভুত অদ্ভুত খবর দিয়েছিল, 'বুঝলি ইয়ার, তুই তো জঙ্গলে জিন্দগী খতম করছিস—এদিকে কী হচ্ছে শুনেছিস ?'

'কী ?' সভ্য দুনিয়ার কোন খবরই জানে না পালসাহাব। কেউ প্রশ্ন করলে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আজাদী আসছে।' ইদ্রিস বলেছিল।

'আজাদী কোন চীজ ? কোন জাহাজে আসছে ?'

'আ রে নালায়েক বুদ্ধু, তুই কিছু জানিস না। বাতাচ্ছিস, আজাদী কোন চীজ ? আ রে হারামী!' পালসাহাবের অজ্ঞতায় খ্যা খ্যা করে কর্কশ খ্যাসখ্যাসে গলায় হেসে উঠেছিল ইদ্রিস।

ইদ্রিস কেন যে হাসছে, এই কথাটা সঠিক বুঝতে না পেরে মুখ কাঁচুমাচু করে বসেছিল পালসাহাব।

তারপর থেকেই আজব শহরটা তার দুর্জ্ঞেয় হালচাল, জমানা, কেতা নিয়ে বার বার পালসাহাবকে হাতছানি দিতে লাগল। শহর যেন জাদু করল তাকে। জংগলে আর মন বসতে চায় না। ন মাস ছ মাসে কি বছরে এক আধ বার যখনই ফুরসত পায়, পোর্ট ব্লেয়ার আসতে লাগল পালসাহাব। এখানে এসেই সরাসরি এবারডীন বস্তিতে চলে যেত সে। ইদ্রিসের কুঠিতে গিয়ে উঠত।

অনেক খবর রাখত ইদ্রিস। শহর বন্দরের মানুষ ইদ্রিস। তার খবরের জাতই আলাদা।

একবার পোর্ট ব্লেয়ার এসে পালসাহাব শুনল, ইণ্ডিয়া মুলুক নাকি আজাদ হয়ে গিয়েছে।

মোপলা ইদ্রিস পালসাহাবের পিঠে এক থাপ্পড় মেরে বলেছিল, 'বুঝলি নালায়েক, মুলুক তো আজাদ হয়ে গেল। এবার থেকে খুদ আপনা রাজ!'

মুলুক কোথাদিয়ে কেমন করে আজাদ হয়ে গেল, ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি পালসাহাব। না বুঝেই খুব একচোট মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলেছিল, 'হাঁ—'

আর একবার পোর্ট ব্লেয়ার এসে পালসাহাব মজাদার এক খবর শুনল। এবার ইদ্রিস বলেছিল, 'জানিস শালে, এংরাজবালারা ইণ্ডিয়া মুলুক ছেড়ে ভেগে যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছে ?'

'তাদের মুল্লুকে। এবার থেকে আমরাই আপনা মুল্লুকের রাজা বনলাম।'

ইংরেজ সম্বন্ধে পালসাহাবের অদ্ভুত এক মনোভাব আছে। তারা বংগোপসাগরের এই দ্বীপে সেলুলার কয়েদখানা বানিয়েছে। হাজার মাইল কালাপানি পাড়ি দিয়ে এখানে তাকে কয়েদ খাটতে এনেছে। রুশবাস ছেঁচা, হুইল ঘানি টানা, সড়ক বানানো, পাথর পেষা—এমনি সব কাজে সামান্য গাফিলতি হলেই পেটি অফিসার টিণ্ডালদের দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে জান লবে-

জান করে ফেলত।

শুধু কি তাই? সেই ধু-ধু গ্রামটা। সেই মুগ্ধ কৃষাণ বউ, সেই তকতকে করে নিকানো আঙিনা, সেই ঘুঘুর ডাক, কৃষাণ বউর কোলে নাদুস নুদুস একটি ছেলে, সব মিলিয়ে এই স্বপ্নময় ছবিটিকে ইংরেজবালারা একটু একটু করে পালসাহাবের জীবন থেকে অনেক, অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

ইংরেজ সম্পর্কে পালসাহাবের মনে অদ্ভুত এক আক্রোশ ছিল। ইদ্রিস যখন জানাল ইংরেজরা ইণ্ডিয়া মুলুক ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন খুশিতে মনটা ভরে গিয়েছিল পালসাহাবের।

সেটা কোন তারিখ কোন সাল, আদৌ মনে করতে পারে না পালসাহাব। অবশ্য মনে করার দায়ও নেই তার। সেদিন ইদ্রিস বলেছিল, 'শুনেছিস ইয়ার, এই জাজিরাতে নয়া নয়া মানুষ আসছে।'

'কোথা থেকে আসছে?'

'মেরিন ডিপার্টমেণ্টের মুন্সীজীর কাছে শুনলাম, বঙ্গাল মুলুক থেকেই নাকি নয়া আদমীরা আসছে। বহুত বহুত আদমী—'

'কী মতলব?'

'এখানে নয়া সেটেলমেণ্ট হবে। রিফুজী সেটেলমেণ্ট।' বলে একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়েছিল ইদ্রিস। আবার শুরু করেছিল, 'এই জাজিরাতে রিফুজীরা নয়া বসত গড়বে।'

'রিফুজী কোন চীজ রে?' যে পালসাহাবের কোন ব্যাপারেই মাথা ব্যথা নেই, হঠাৎ রিফুজী সম্পর্কে তার আগ্রহ দেখা দিল।

রিফুজী যে ঠিক কী, ইদ্রিসও জানে না। ভাসা ভাসা, আবছা আবছা, যেটুকু সে শুনেছে, তাতে রিফুজী সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট নয়। শুধু এটুকুই সে জানে, একদল নতুন মানুষ বাঙলা দেশ থেকে খুব শিগগিরই এখানে এসে পড়বে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে নতুন বসতি গড়বে।

ইদ্রিস বলেছিল, 'তুই আর এক দফে যখন আসবি, তখন বলব রিফুজী কি চীজ। সমঝালি?'

'আচ্ছা।'

এর পরের বার পোর্ট ব্লেয়ার এসে রিফুজীদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিল পালসাহাব।

ইণ্ডিয়া মুলুক নাকি দুভাগ হয়ে গেছে। হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান। বাঙলা মুলুক দু' টুকরো হয়েছে। পুব দিক পাকিস্তানে, পশ্চিম হিন্দুস্তানে। পুব বাঙলার হিন্দুরা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে এই আন্দামান দ্বীপে আসছে। তাদের কুঠি নেই, ডেরা নেই, মাটি নেই। বাঁচার আশায়, ঘরের আশায়, মাটির আশায় কালা পানি পাড়ি দিয়ে সেটেলমেণ্ট গড়তে আসছে তারা।

গাঢ় গলায় ইদ্রিস বলেছিল, 'আদমীগুলো ইণ্ডিয়ার আজাদীর জন্যে বহুত

কিমত (দাম) দিল। বাপ-নানার কোঠি ছাড়ল, মিট্টি ছাড়ল। ইণ্ডিয়ার আজাদীর জন্যে তাদের জান তুড়ল, জমানা তুড়ল, জিন্দগী তুড়ল।' দীর্ঘ মন্থর একটা শ্বাস ফেলেছিল ইদ্রিস।

রিফুজীদের কথা ভাবতে ভাবতে সেই ছবিটাই বার বার মনে পড়ছিল পালসাহাবের। সেই কৃষাণ বউ, তার কোলে নাদুস নুদুস ছেলে, তকতকে নিকানো আঙিনা, জাম গাছের ছায়া—একদিন সেই স্বপ্নময় সুন্দর পৃথিবীটা থেকে পালসাহাবও উৎখাত হয়ে এই দ্বীপে কয়েদ খাটতে এসেছিল।

এই দ্বীপে সাতপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে যারা নতুন সেটেলমেণ্ট গড়তে আসছে তাদের সঙ্গে তার নিজের কোথায় যেন একটা বিচিত্র মিল খুঁজে পেয়েছে পালসাহাব। রিফুজীদের জন্য সহানুভূতিতে তার মন ভরে গিয়েছিল।

এর পর থেকে তো নিজের চোখেই সব দেখছে পালসাহাব।

কয়েক বছর ধরে জাহাজ ভরে ভরে উদ্বাস্তুরা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আসছে। প্রথমে তারা দক্ষিণ আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ারের আশে পাশে সেটেলমেণ্ট গড়ল। তারপর হ্যাভলক দ্বীপ এবং মধ্য আন্দামানে জীবনের সীমানাকে বাড়াল। এখন যারা আসছে তাদের বসতি হচ্ছে উত্তর আন্দামানে।

উত্তর আন্দামানের উপনিবেশ গড়তে গড়তে পালসাহাব যেন জীবন-রসিক হয়ে উঠেছে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ ইণ্ডিয়া মুলুকের আজাদীর জন্য সাত পুরুষের ভূমি ছেড়ে আসছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক মূল্য দিয়েছে তারা। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ধুঁকে ধুঁকে, এ ঘাটে ও ঘাটে ঘুরে ঘুরে, বাজারে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে, কলকাতার ফুটপাতে, গাছতলায় কত মানুষ যে শেষ হয়ে গেল, কে তার হিসাব রাখে। কতখানি মনুষ্যত্বের যে অপচয় ঘটল, কে তার হদিস দেবে।

প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে কত যুবতী মেয়ে যে নষ্ট হয়ে গেল, কত যুবতী মেয়ের দেহ যে বিকিয়ে গেল, কত ঘরের বউ যে ঘর-সংসার-স্বামী-সন্তান ছেড়ে শহর বাজারের খাপরা ছাওয়া রংমহলে গিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, চোখে সুর্মা টেনে দাঁড়াল, তার লেখা-জোখা নেই। পুব বাঙলার কত কুমারী মেয়ে আড়কাঠির কারসাজিতে রাত্রির অন্ধকারে কোথায় কোথায় যে পাচার হয়ে গেল, কে তা বলে দেবে।

রিফুজীদের মুখে অনেক কথাই শুনেছে পালসাহাব। দেশভাগের পর মানুষগুলো ভাসতে ভাসতে এখানে সেখানে এসে উঠল। বাছল না, বিচার করল না, বাছা বা বিচার করার মত সময়ই বা কোথায়? যে হাত তারা সামনে পেল, সেটা ধরেই উঠতে চাইল, বাঁচতে চাইল। কিন্তু সেই হাতটা ধাক্কা মেরে কোথায় কত দূরে নামিয়ে দিল, সেটা যখন তারা বুঝল, ভয়ে-আতঙ্কে-বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল।

কত শত বছর লেগেছিল পদ্মা-মেঘনা পারের সেই জীবনটাকে মানুষের প্রাণের তাপে সুন্দর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে। কিন্তু দেশভাগ এক ধাক্কায় তাকে লক্ষ লক্ষ বছর পেছনে হটিয়ে দিয়েছে। এ জীবন এখন পেটের তাড়নায় বর্বর, হিংসায় হিংস্র এবং স্বার্থে আদিম হয়ে উঠেছে। দেশভাগ একটা জাতিকে পঙ্গু বিকল এবং অথর্ব করে দিল।

এ দেশে মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান, এত বিরাট অপচয় কোনদিন আর হয় নি।

লক্ষ লক্ষ মানুষ কিংবা বিশাল বিপর্যস্ত একটা জাতির কথা পালসাহাব ভাবে না। অত বড় ভাবনার মত মানসিক ব্যাপ্তিও তার নেই।

তবে যে ক'টি ভাঙাচোরা পঙ্গু মানুষ সে হাতের কাছে পেয়েছে, তাদের নিয়েই উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপে নতুন করে নিজের নিয়মে জীবন গড়তে শুরু করেছে পালসাহাব।

আহা, পাগলা পালসাহাব জীবন-রসিক হয়ে গেল।

সেটেলমেণ্টের মধ্য দিয়ে ভাবতে ভাবতে এবং দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে পালসাহাব। হঠাৎ সেই তীব্র অবুঝ অস্বাভাবিক হাসির শব্দটা তার কানে এল। হাসিটা যথারীতি মেতে উঠতে লাগল।

পালসাহাব চমকে উঠল। ঘুরে ঘুরে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। একটু পরেই তার নজর পড়ল, বাঁ দিকের ছোট একটা টিলার মাথায় নিত্য ঢালীর ঘর। সেখান থেকেই শব্দটা আসছে।

হাসির তীব্র অবুঝ শব্দটা বুঝিয়ে দিল, কে হাসছে।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল পালসাহাব। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে টিলা বাইতে শুরু করল।

২১

ঘরটার সামনে খানিকটা ঘাসের জমি। জমিটার এক কোণে দুই হাঁটুর ফাঁকে ঘাড় গুঁজে চুপচাপ বসে আছে নিত্য ঢালী। আজ আর সে এরিয়াল উপসাগরে যায় নি। পালসাহাব সেটেলমেণ্টে আসার আগেই সে এরিয়াল উপসাগরে পালিয়ে যায়। পালসাহাব চলে যাবার পর অনেক রাত্রে ফিরে আসে।

আজ নিত্য ঢালী ধরা পড়ে গেল।

ঘরের ভেতর থেকে কাপাসীর হাসির শব্দটা আসছে। আস্তে আস্তে নিত্য ঢালীর পিছনে এসে দাঁড়াল পালসাহাব। নরম গলায় ডাকল, 'এ নিত্য—'

নিত্য ঢালী বুঝি ডাকটা শুনতে পায় নি। অনড় হয়ে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি বসে রইল।

পালসাহাব আবার ডাকল, 'এ নিত্য—'

এবার হাঁটুর ফাঁক থেকে ঘাড় তুলল নিত্য ঢালী। ঈষৎ রক্তাভ, ঘোলা ঘোলা চোখ। ঘোর ঘোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। অন্য সময় হলে পালসাহাবকে দেখে নিত্য ঢালী ভয় পেয়ে চমকে উঠত। কিন্তু আজ কিছুই করল না। আচ্ছন্নের মত তাকিয়েই রইল।

আশ্চর্য! যে পালসাহাবের মুখ থেকে খেঁকানি আর খিস্তি ছাড়া কিছুই বার হয় না তার আজ হল কি! নিত্য ঢালীর পাশে ঘন হয়ে বসল সে। পিঠে একটা হাত রেখে আস্তে করে বলল, 'এ নিত্য, কী হয়েছে রে? এমন করে বসে আছিস?'

নিত্য ঢালী এতক্ষণে কথা বলল। নিজের কপালটা দেখিয়ে ভাঙা ভাঙা, ফ্যাসফ্যাসে শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল, 'কী আর হইব সাহাব বাবা, হইছে আমার কপাল! হা ভগমান—' ভাঙা তোবড়ানো মুখ, কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঘোর ঘোর চোখ, দোমড়ানো কুঁজো পিঠ। নিত্য ঢালীকে দেখতে দেখতে কেমন যেন দুঃখ হয় পালসাহাবের। বুকের মধ্যটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বলে, 'কী হয়েছে বলবি তো। অমন করে বসে থাকলে সব দুখ তোর ঘুচবে!'

পালসাহাবের কথার মধ্যে প্রাণের তাপ রয়েছে। নিত্য ঢালী বলল, 'কান পাতেন সাহাব বাবা, হগল শুনতে পাইবেন।'

'শুনেছি, কাপাসীর হাসি তো?'

'হ সাহাব বাবা—'

দীর্ঘ মন্থর একটা শ্বাস ফেলল নিত্য ঢালী। বলল, 'এই হাসিটা শুনলেই পরাণটা আমার খাক হইয়া যায়। এ আমি সইতে পারি না, কিছুতেই যে সইতে পারি না। হা ভগমান—'

দু হাতে সমানে বুক থাপড়ায় নিত্য ঢালী।

মৌসুমী বাতাস নৈঋর্ত কোণ থেকে টুকরো টুকরো তামারঙের মেঘকে আন্দামানের আকাশে নিয়ে আসছে। এতক্ষণ তীব্র ধারাল রোদ ছিল। মেঘ সেই রোদকে ম্যাড়মেড়ে, নিবু নিবু এবং কাবু করে ফেলেছে। আন্দামানের আকাশে মেঘ আসছে। বৃষ্টি নামার আয়োজন শুরু হয়েছে।

ঘরের মধ্যে কাপাসীর অবুঝ হাসিটা কলকল করে মাতছে। আজ যেন একটু বাড়াবাড়িই করছে সে। থেকে থেকে দমকে দমকে, কখনও বা ফুলে ফুলে হেসে উঠছে মেয়েটা।

পালসাহাব বলল, 'আজ এ্যায়সা হাসছে কেন কাপাসী?'

'জানি না বাবা, বুঝি না। পাগলের মাথায় কুনদিন কি চাপে, কেমনে কমু সাহাব বাবা!'

গাঢ় গলায় পালসাহাব বলল, 'আচ্ছা নিত্য, একটা কথার জবাব দিবি ?'
'কী কথা বাবা ?'
'লেড়কী কি সচ্ই পাগল হয়েছে ?'
'হ সাহাব বাবা—' নিত্য ঢালী একেবারে ভেঙে পড়ে।
কি একটু যেন ভেবে নিল পালসাহাব। তারপর বলল, 'ইয়াদ আছে, একরোজ বলেছিলি, লেড়কীর কথা বলবি—'
'হ সাহাবা বাবা, সত্যই আপনে শুনবেন ?'
'হাঁ রে শালে, শুনবার জন্যেই তো এলাম। এই কলোনির সব আদমীর সুখ দুখ—সব কথাই তো আমার শুনতে হবে, বুঝতে হবে। আমি তোদের কথা না শুনলে কে শুনবে ? কে আছে তোদের ?' গলাটা কেমন যেন অদ্ভুত শোনায় পালসাহাবের।
একবার পালসাহাবের মুখের দিকে তাকাল নিত্য ঢালী। কেন যেন তার মনে হল এই মানুষটার মধ্যে অফুরন্ত শান্তি আছে। মনে হল সব কথা, সব দুঃখ, দশ বছর ধরে যে অসহ্য আকণ্ঠ যন্ত্রণায় সে বিকল হয়ে আছে, তার কথা বলে সে একটু জুড়োতে পারবে, একটু শান্তি পাবে। একটু হাল্কা হবে। এই মানুষটাকে বিশ্বাস করা চলে। হয়ত বা নিজের দুঃখ যন্ত্রণার শরিক করে নেওয়া যায়। নিত্য ঢালী শুরু করল।
পূব বাঙলার আর দশটা কৃষাণ গ্রামের মতই ছিল নিত্য ঢালীদের গ্রামটি। সামনে ছোট একটি নদী। শান্ত স্নিগ্ধ ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম হীরাকুপী। নদীর নাম মাতানি। পৃথিবীর হট্টগোল থেকে অনেক দূরে এই গ্রাম পড়েছিল। এই গ্রামের বাইরে কোথায় কি ঘটছে, ওখানকার মানুষেরা তার খবর রাখত না। কোন ব্যাপারের কড়িই তারা ধারে না। হাজার বছরের অতল ঘুমে হীরাকুপী গ্রামটা তলিয়ে ছিল।
মাস গেছে, বছর ঘুরেছে, ঋতুচক্রে সময় পাক খেয়ে ফিরেছে। পৃথিবীতে কত পরিবর্তন ঘটল, কত ওলট পালট হল, কত কিছু তোলপাড় হয়ে গেল। রাজ্যপাট থেকে কত রাজা গেল, কত রাজা এল। কোথায় বিপ্লব হল, কোথায় গণবাসুকী ফণা তুলল। মাটির নীচের ভারকেন্দ্রে কোথায় আলোড়ন শুরু হল। কিন্তু হীরাকুপী গ্রাম সেই যে অতল অখণ্ড ঘুমে তলিয়ে ছিল, সে ঘুম আর ভাঙে নি। এখানে সময়ের ওঠাপড়ার কোন ইতিহাস নেই। সময় এই গ্রামটাকে অতি সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে।
জোয়ার আর ভাটার ঠিক মাঝামাঝি সময় নদী যেমন স্থির, এখানকার জীবনও ঠিক তেমনি। এখানে উজানের মাতামাতি নেই, ভাটার টান নেই।
নিজেদের চারপাশে লম্বা লম্বা দেওয়াল খাড়া করে মানুষগুলো পরম নিশ্চিন্তে খায় দায়, ঘুমায় আর উর্বরা নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়। পৃথিবীর কাছে জীবনের কাছে এমন করেই তারা দায় সারে, জন্মের ঋণ শোধ

করে। পৃথিবীর সব ঢেউ চারপাশের দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে যায়।

এখানে উদ্দীপনা নেই, উত্তেজনা নেই। মিঠে নদী মাতানির পারে নিতান্তই ঘুমন্ত শান্ত নিরুদ্বেগ নিরুৎসব একটি গ্রাম।

হীরাকুপী গ্রামে ঢালীদের বাস। রাজা বাদশার আমলে ঢালীরা ছিল পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল। কিন্তু সে আমল আর নেই। থাকবেই বা কেমন করে! রাজা বাদশাই যখন নেই, তাদের কাল আর থাকে কেমন করে!

ঢালী পাড়ার সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ কুঞ্জ ঢালী। সে বলত, 'ঢালীরা কি যে সে জাইত, পাইক-লাইঠাল—বীরের জাইত।'

কিন্তু রাজা-বাদশাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢালীদের বীরত্ব গেল, হাতের লাঠি গেল। লাঠি হারিয়ে ঢালীদের কেউ কেউ মাছমারা হল, কেউ কৃষাণ হল, কেউ মাঝিগিরি ধরল। আবার কেউ কেউ নানান উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

নিত্য ঢালী পঁচিশ কানি তে-ফসলা জমি রাখত। আউশ ফলত, আমন ফলত, রবি ফসল ফলত। তিন জনের সংসার তার। বউ দামিনী, মেয়ে কাপাসী আর সে নিজে। ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ, অফুরন্ত শান্তি আর অপরিমেয় সুখে বিভোর হয়েছিল তারা।

কিন্তু মাতানি নদীর পারে সেই ঘুমন্ত হীরাকুপী গ্রামটা একটা ঝাঁকানি খেয়ে হঠাৎ একদিন জেগে উঠল।

নিত্য ঢালী হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে, 'সব্বনাশ আইল সাহাব বাবা, চাইর পাশ থিকা বেড়া আগুন গেরামটারে ঘিরা ধরল।'

একটু থামে নিত্য ঢালী। খুব একচোট হাঁপায়। টেনে টেনে দম নেয়। বুকটা হাপরের মত হাঁস হাঁস শব্দ করতে থাকে। আবার সে শুরু করে, 'বাবা পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না হেই আগুনেরে ঠেকাইতে। আমার সব্বস্ব পুড়াইয়া, জ্বালাইয়া, খাক কইরা দিয়া গেল। কপালে যা লিখা ছিল, তাই হইল।'

মাঝে মাঝে থেমে, কেঁদে, হাঁপিয়ে, বুক আর কপাল থাপড়ে, চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে অনেক কথাই বলে যায় নিত্য ঢালী।

দামিনী বউ তাকে বার বার বলেছিল, এইখানে আর বেশি দিন থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঘরে সোনাদানা না থাক, বিত্ত-ব্যাসাদ না থাক, প্রাণটা তো আছে। বিয়ের যোগ্য মেয়ে আছে।

পঁচিশ কানি তে-ফসলা জমি, সাতপুরুষের ভিটেমাটি বাগবাগিচা ঘর ভদ্রাসন—বিষয়ী মানুষের মনে এসবের জন্য বড় কঠিন মায়া। এসব ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে মন ঠিক সায় দেয় না। নিত্য ঢালী বলত, আর ক'টা দিন দেখাই যাক।

দামিনী বউ চেঁচাত, চুল ছিঁড়ত, দু হাতে নিত্য ঢালীকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে

বলত, 'ড্যাকরা, যমের অরুচি— তুই আমার সব্বনাশ করবি। মাইয়ার যদি কিছু হয়—হে ভগবান—'মাটিতে আছড়ে পড়ে জোরে জোরে কপাল ঠুকত দামিনী বউ।

হীরাকুপী গ্রামে ভাঙন ধরল একদিন। কুঞ্জ ঢালী, মাধব ঢালী, রাজেন ঢালীরা আসাম চলে গেল। একদল কুচবিহার রওনা হল। একদল গেল কলকাতা। একে একে সবাই গ্রাম ছাড়ল।

দামিনী বউ বলত, 'হগলে গেরাম ছাড়ল, ভিটামাটি ছাড়ল। তোমারই খালি বিষয়ের লেইগা যত মায়া। অহনও বাচনের পথ আছে। লও, হগলের লগে আমরাও যাই।'

'যাবি তো, খাবি কী? এই গেরামের বাইরে কে আমাগো লেইগা ভোগ সাজাইয়া রাখছে? এই গেরামের বাইরে আমরা চিনি কী? জানি কী? হেখানে গিয়া কী করুম।

'হগলের যা হইব, আমাগোও হেয়াই হইব। এইখানে আমার বুক কাঁপে। কেউ নাই, হগলে গেছে। গেরামটা যেন শ্মশান।

নির্জীব স্বরে নিত্য ঢালী বলত, 'দেখি আর কয়টা দিন—'

আর ক'টা দিন দেখতে গিয়েই যা হবার তা হয়ে গেল। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটা যেন নিশুতিপুর। কোথাও সাড়া নেই, শব্দ নেই। চারিদিক নিশ্চুপ, নিঝুম।

যে দু'চার ঘর তখনও গ্রাম ছাড়ে নি তারা ফিস ফিস করে কথা বলে। দিন থাকতেই নাকেমুখে চাট্টি গুঁজে দুয়ারে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে। হীরাকুপী গ্রাম থেকে জীবনের অস্তিত্ব মুছে গেছে। কে বলবে এটা ঢালীদের গ্রাম! কে বলবে ঢালীরা একদিন রাজা বাদশার পাইক-বরকন্দাজ ছিল।

সেটা কোন তারিখ, কি বার, হুবহু মনে আছে নিত্য ঢালীর। সর্বনাশের দিনের কথা কেউ কি ভোলে! কৃষ্ণপক্ষের রাত ছিল সেটা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকার ফেঁড়ে ফেঁড়ে মাতানি নদীতে অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠল। হীরাকুপী গ্রামের অন্তরাত্মাটাকে ভয়ানক চমকে দিয়ে হল্লা উঠল,'হো-ও-ও-ও—'

'হো-ও-ও ও—'

হল্লা আর মশাল এক সময় হীরাকুপী গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘরে ঘরে আগুন লাগল। ঘরপোড়া আগুন কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে কি যে বোঝাতে চাইল, কে জানে!

রাত্রির আত্মাকে তীরের মত বিঁধে চারদিকে প্রাণফাটা চিৎকার উঠল। সেই সঙ্গে হল্লা। শেষ পর্যন্ত আগুন আর হল্লা নিত্য ঢালীর ঘরের সামনে এসে পড়ল।

চালে আগুন জ্বলছে, কপাট ভাঙা হয়ে গেছে। গরীব ঢালীর ঘরে সোনা-দানা নেই, বিত্ত-ব্যাসাদ নেই, একমাত্র বিয়ের যোগ্য যুবতী মেয়ে ছাড়া লুঠ

করার মত কিছুই নেই।

এখনও সেই সর্বনাশা দুর্ভাগ্যের রাতটা নিত্য ঢালীর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। নিত্য ঢালী শব্দ করে ফুলে ফুলে কাঁদে। ভাঙা ভাঙা ধরা-গলায় বলে, 'চোখের উপুর যা দেখলাম, পারি না, কুনো দিন ভুলতে পারি না। হা ঈশ্বর, এমন সোন্দর পিরথিমী বানাইছ, এমুন সোন্দর মানুষ বানাইছ, কিন্তুক তার মনে এত পাপ দিলা ক্যান?'

হাতের পিঠে চোখ মুছতে মুছতে নিত্য ঢালী আবার বলে, 'শয়তানেরা কাপাসীর দিকে আগাইয়া আইল। ঠেকাইতে গেলাম, ল্যাঠির একখান ঘাই খাইয়া পড়লাম। পারলাম না, আমি পারলাম না। বাপ হইয়া যা পারলাম না, মা হইয়া হেয়া করতে গেল দামিনী বউ। শয়তানগো মুখোমুখি রুইখা খাড়াইল। মাইয়ার মান বাচানের লেইগা কি না করলে সে! সে কইল, 'আমারে আগে মার, মাইরা ফালা। তবে মাইয়ার গায়ে হাত দিতে পারবি। তার আগে না রে শয়তানেরা।' দুই হাতে কাপাসীরে আবডাল কইরা রাখল দামিনী বউ। মা-পংখী যেমুন তার ছাওরে আবডাল করে। বার বার লাঠির ঘাই খায়, বার বার পড়ে। পড়ে আর ওঠে। শ্যাষে তারা সড়কি মারল, এক হাত ফলাটা কাপাসীর মায়ের বুকে বিন্ধা গেল। সেই যে পড়ল, আর উঠল না।'

এবার আর নিত্য ঢালী কাঁদল না। অদ্ভুত চোখে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইল। এ সেই চোখ নিরন্ত ব্যথায় যা উদাস, সীমাহীন দুঃখে যা ঝাপসা।

চুপচাপ পাশে বসে রয়েছে পালসাহাব। আবছা গলায় সে বলল, তারপর কি হল?'

'দামিনী বউ মরল। কাপাসীরে ছিনাইয়া নিয়া মাতানি নদী পার হইয়া কুত্তারা চইলা গেল সাহাব বাবা। সাত দিন পর তারে আবার ফিরা পাইলাম। কিন্তুক এ কোন কাপাসী! হা ভগবান—' বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল নিত্য ঢালী। পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'সাহাব বাবা, বাপ হইয়া কই, কাপাসী যদি মরত, আর যদি সে না ফিরত তা হইলে আমি বাচতাম। মনেরে বুঝাইতে পারতাম। কিন্তুক কাপাসী ফিরল। তারে নিয়া কইলকাতায় আইলাম। সেইখান থিকা এই আন্ধারমান আইছি। কিন্তুক সাহাব বাবা—'

'বল্—'

'কাপাসী ফিরল। তার মাথাটা খারাপ হইয়া গেল। দিন রাইত খালি হাসে। হাসন আর থামে না। তার হাসন শুনলে বুক আমার কাপে। সাহাব বাবা, এর থিকা যদি কাপাসী মরত—'

ধরা ধরা ভারী গলায় পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'থাম্—'

এমন যে দুর্দান্ত পালসাহাব, দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে যে এখানে কয়েদ খাটতে এসেছিল, নিত্য ঢালীর দুঃখের কথা শুনতে শুনতে সে তার দুর্ভাগ্যের শরিক

হয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা জ্বালা জ্বালা করছে, কণ্ঠার কাছে বিচিত্র এক কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। চোখ দুটো নোনা জলে বুঝি ভরেই গেছে। চোখ ঢাকবার জন্য ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল পালসাহাব। তারপর উঠে দাঁড়াল।

অদ্ভুত একটু হাসল নিত্য ঢালী। বলল, 'খালি দুঃখুর কথা শুইনাই আপনের মনটা খারাপ হইয়া গেল সাহাব বাবা?'

'হাঁ রে কুত্তা—'

'আমি যে দশ বছর ধইরা এই দুঃখুরে বুকের ভিতর পুষতে আছি। এই দুঃখু যে আমারে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক কইরা ফালাইল। আমার কথাটা এট্টু ভাবেন সাহাব বাবা, এট্টু ভাবেন। এই দুঃখু বুকে নিয়া কিছুই যে করতে পারি না। কোন কামেই যে মন বশ খায় না। এই দ্বীপে আইসা হগলে মাটি কুপায়, ঘর বানায়, মাছ মারে—আমিই খালি পলাইয়া থাকি।'

পালসাহাব কিছুই বলল না। টলতে টলতে টিলা বেয়ে নীচে নামতে লাগল। আর পেছনে নিত্য ঢালীর ঘরে কাপাসীর হাসি কল কল করে বাজতে লাগল।

২২

যে মেঘের জন্য পালসাহাব উন্মুখ হয়ে ছিল তা অনেক আগেই এসে পড়েছিল। এবার বৃষ্টি শুরু হল। সীসার রঙের মত দীর্ঘ ধারাল ফলায় বৃষ্টি নামছে। উত্তর আন্দামানের আকাশ পাহাড় জঙ্গল—সব কিছু বৃষ্টির রঙে আবছা হয়ে গেছে।

পোর্ট ব্লেয়ার নিয়ে গিয়ে বিনোদ ভুঁইমালীকে ছুতোরের কাজে, অনন্ত শীলকে নাপিতের কাজে, রাখুকে গুরুস্বামীর দোকানের কাজে—এমনি প্রায় জন পনেরকে নানা কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছিল পালসাহাব। আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখেই তাদের আবার ডিগলিপুর ফিরিয়ে এনেছে।

বৃষ্টি পড়ছে। এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলোকে নিয়ে যে মাটি কুপিয়ে চৌরস করে রেখেছিল পালসাহাব তা নরম সরস হয়ে যাচ্ছে।

আবাদের পক্ষে এখন সুদিনও না, মরসুমও না। তবু নোনা জলের মাঝখানে যে মিঠে মাটি পাওয়া গেল তার গর্ভ ধারণের ক্ষমতা কতখানি তা দেখবার জন্য বীজ ছড়াবে পালসাহাব।

দিন তিনেক বৃষ্টি হল। কিন্তু তাতে বীজ বোনা চলে না।

তবু সবাইকে নিয়ে জমিতে এল পালসাহাব। মাটি বেশ নরম হয়েছে।

পালসাহাব বলল, 'কি রে, এই জলে বীজ ফেলা যাবে?'

বুড়ো রসিক শীল সারাটা জীবন আবাদ করে করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে। মাটির মেজাজ সে বোঝে। মাটি কতখানি জল পেলে গর্ভিণী হয়ে ফসলের জন্ম দিতে পারে তা তার জানা। মাটি আর জল সম্বন্ধে তার অনেক কালের অভিজ্ঞতা। পালসাহাব তাকেই আবার বলল, 'কি রে বুড়ো, তোর কি মনে হয়?'

এক ডেলা মাটি হাতে তুলে ছেনে ছেনে পরখ করল রসিক শীল। মাথা নেড়ে বলল, 'না সাহাব বাবা—'

'কী না?'

'জমিন অহনও বীজ রুয়ার যুগ্যি হয় নাই। মাটি আর কয়টা দিন জল খাউক। হের পরে দেখা যাইব।'

'আচ্ছা।'

এর পর দিন সাতেক আকাশ বিমুখ হয়ে রইল। তার কৃপণ মুঠি বেয়ে এক ফোঁটা জলও ঝরল না। মাটি সরস হয়েছিল, কিন্তু তেজী রোদে আবার শুকিয়ে যেতে লাগল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষগুলো বলল, 'হায় ভগমান তুমি এমুন বৈমুখ হইলা!'

সাত দিনের পর আরো দশ দিন গেল।

আকাশে টুকরো টুকরো তামারঙের অসংখ্য মেঘ। সেই মেঘ নিঙড়ে এক ফোঁটাও জল ঝরল না। আন্দামানের মেঘ এবারের মত আর কোন বার এত নির্দয় হয় নি। এত কৃপণতা করে নি।

অনেক দিন পর মানুষগুলোকে নিয়ে আবার জমিতে এল পালসাহাব। ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তার চোখ স্থির হয়ে গেল। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

এই ক'দিনের তেজী রোদে মাটি শুকিয়ে রয়েছে। আর সেই শুকনো মাটি ফুঁড়ে অসংখ্য সবুজ অঙ্কুর মাথা তুলেছে। যতদূর তাকানো যায়, সবুজে সবুজে জমি ছেয়ে আছে।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'বীজ রুইলাম না তভো (তবু) জমিন এ কুন ফসলে ভইরা গেল সাহাব বাবা?'

পালসাহাব চিৎকার করে উঠল, 'সব্বনাশ হয়ে গেছে, বিলকুল সব্বনাশ—'

পালসাহাবের চিৎকারে রসিক শীলেরা ভয় পেয়ে গেল। ফিস ফিস করে তারা বলল, 'কী হইছে সাহাব বাবা?'

'জঙ্গল, জঙ্গল—হুই দ্যাখ, মুথিয়া লতা, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটি গজিয়ে রয়েছে।' চিল্লাতে চিল্লাতে আরো অনেক কথা বলল পালসাহাব।

অরণ্য কি এত সহজে নির্মূল করা যায় ? এই দ্বীপের মাটিতে হাজার হাজার বছর ধরে জঙ্গলের বীজ মিশে আছে। মুথিয়া লতার বীজ, জলডেঙ্গুয়া আর হাওয়াই বুটির বীজ, প্যাডক আর চুগলুম গাছের বীজ। নানা জাতের গাছ আর আগাছার বীজ।

মাটির ওপরের জংগল হয়ত সাফ করা যায়। কিন্তু তার অস্তিত্বের সঙ্গে, তিন পরল নীচে তার গর্ভকোষে যে জঙ্গল রয়েছে, তাকে কেমন করে নিশ্চিহ্ন করা যাবে ? যেই জল পড়েছে সংগে সংগে মাটি ফুঁড়ে জংগলে মাথা তুলেছে। পালসাহাব হতভম্ব হয়ে গেছে। জংগলকে নির্মূল করতে না পারলে ফসল কিছুতেই ফলানো যাবে না। মাটিতে জল পড়লেই যদি জংগল মাথা তোলে তাহলে বীজদানা কেমন করে রুইবে ?

পালসাহাব বিড় বিড় করতে লাগল, 'সর্বনাশ, বিলকুল সর্বনাশ। এ মিট্টিতে তো ফসল ফলানো যাবে না।

এই মাটিটুকুর আশায় হাজার মাইল নোনা জল ঠেলে এই দ্বীপে এসেছে মানুষগুলো। কিন্তু জল পড়লেই যদি জংগল মাথা তোলে তা হলে ফসল কেমন করে ফলবে ? আর ফসল না ফললে তারা কিসের ভরসায় এই দ্বীপে থাকবে ? আন্দামানের এই মাটিই ছিল তাদের বাঁচার শেষ উপায়। কিন্তু জংগল তার দখল ছাড়তে রাজি নয়। বাঁচার আর আশা নেই। নির্ঘাত তারা মরে যাবে। আচমকা উত্তর আন্দামানের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাকে চমকে দিয়ে মানুষগুলো শোর তুলে কান্না জুড়ে দিল। হতাশায় দুঃখে তারা একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

অন্য সময় হলে এক ধমকে তাদের কান্না থামিয়ে দিত পালসাহাব। কিন্তু এই মুহূর্তে কি যে সে বলবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারল না। তার গলার ধমকও যেমন ফুটল না, একটা সান্ত্বনার কথাও তেমনি জোগাল না। বিব্রত বিমূঢ় পালসাহাব দাঁড়িয়ে রইল।

সকলের সংগে বুড়ী বাসিনীও এসেছিল। সে কাঁদছিল না। এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষগুলোর কান্না শুনছিল। পুরুষ মানুষের কান্না অসহ লাগে বুড়ী বাসিনীর। হঠাৎ সে সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'কান্দস ক্যান ; কান্দনের হইল কী ?'

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'কান্দুম না, কও কী তুমি খুড়ী! যে মাটির ভরসায় কালাপানি পাড়ি দিয়া এত দূরে আইলাম, হেই মাটি এমুন বিশ্বাসঘাতী হইল! হা ঈশ্বর বাচুম ক্যামনে ? বাচার আর যে পথ নাই—'

'ভাসুর পুত, তারা কী হগল ভুললি। আট দশ বছর আমরা রিফুজী হইছি, কিন্তুক তার আগে তো ঘরবসত, জমিন-জমা—বেবাকই আছিল। আছিল কিনা ?' বুড়ী বাসিনী রসিক শীলকে 'ভাসুর পুত' ডাকে। কখনও

কখনও নাম ধরেও ডাকে। রসিক শীল তার ডাকের ভাসুর পো। নইলে এমনি কোন সম্পর্ক নেই।

তিন কুলে কেউ নেই বাসিনীর। বাপ না, ভাই না, স্বামী না, সন্তান না। না বলতে কেউ না। সবাইকে খেয়ে বসে আছে সে।

দেশভাগের পর ফরিদপুর জেলার ছোট্ট গ্রাম ছিপাতিপুর থেকে ভাসতে ভাসতে কলকাতায় এসেছিল বাসিনী। শিয়ালদা স্টেশনে রসিক শীলের সঙ্গে তার আলাপ। প্রথম আলাপেই সে তার সঙ্গে খুড়ী-ভাসুর পো সম্পর্ক পাতিয়ে নিল। সম্পর্কই শুধু পাতানো হল না, রসিকের সংসারে গিয়ে উঠল বাসিনী।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধুবুলিয়া ক্যাম্প। ধুবুলিয়া ক্যাম্প থেকে উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপ। ন' দশ বছর রসিকদের সঙ্গে কাটিয়ে দিল বাসিনী।

বাসিনী আগের কথাটা আবার বলল, 'তরা কী হগল ভুললি ভাসুর পুত ?'

'কী ভুললাম খুড়ী ?'

'চাষের কাম।'

'ভুলুম ক্যান ? চাষ আবাদের কথা কেও নি ভোলে।'

'হ, ভুলছস। না হইলে শুধাশুধি কান্দস ?' বলে একটু থামে বাসিনী। এক ডেলা মাটি হাতে নিয়ে ফের শুরু করে, 'এই মাটি সোনার মাটি, বাহারের মাটি। এই মাটিতে সোনা ফলব। কিন্তুক কোদাল দিয়া মাটি চষলে হইব না রসিক।'

'তবু ক্যায়সা ?' পাশে দাঁড়িয়ে বাসিনীর কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিল পালসাহাব। সে বলল, 'তবু ক্যায়সা রে বুড্ঢী। মাটি চষা হবে কেমন করে ?'

'খালি কোদালের কাম না সাহাব বাবা। লাঙ্গল লাগব। হালহালুটি আর বলদ লাগব। পরল পরল মাটি তুইলা জঙ্গলেরে সাফ কইরা ফালাইতে হইব। অবে নি মাটি ফসল ফলাইব। হগল কি এমনে এমনে ?'

'ঠিক বাত বুড্ঢী, হাল-বলদের বন্দোবস্ত করছি। আজ সোমবার, পরশু বুধবার। বুধবার তো জাহাজ আসবে, তাই নারে শালে লোগ ?'

মানুষগুলো সায় দিল, 'হ।'

প্রতি বুধবার অর্থাৎ সপ্তাহে একবার মাত্র পোর্ট ব্লেয়ার থেকে জাহাজ আসে উত্তর আন্দামানের এই উপনিবেশে। যে জাহাজটা আসে তার নাম 'চলুঙ্গা।'

অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে উত্তর আন্দামানের এই ডিগলিপুর কলোনি। 'চলুঙ্গা' জাহাজই বাইরের পৃথিবী আর এই কলোনির মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র।

ঠিক হল, বুধবার পোর্ট ব্লেয়ার যাবে পালসাহাব। সে জানালো, বড় অফসরদের (অফিসারদের) সঙ্গে দেখা করে হাল-বলদের ব্যবস্থা করে আসবে।

উম্ধব বৈরাগীর মনটা বড় সরস, বড় সজীব। খুশির রসে সব সময় তার মুখখানা টসটস করে। দেশভাগের পর আট দশটা বছর তার জীবন থেকে সব সুর, সব গান, সব আনন্দ মুছে গিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসে পায়ের নীচে মাটি পেয়ে আবার সব ফিরে পেয়েছে সে। সেই সুর, সেই গান, সেই আনন্দ।

এখন বিকেল। উপসাগরের দিক থেকে সাগরপাখিরা দ্বীপে ফিরে আসে নি। জঙ্গলের মাথায় হলুদ রঙের উজ্জ্বল ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে রয়েছে।

উম্ধব বৈরাগী এই দ্বীপে এসে একটা দোতারা বানিয়ে নিয়েছে।

দোতারার তারে আঙুলের গুঁতো মেরে সুর তুলতে থাকে সে। তিড়িং-টুঙ, তিড়িং-টুঙ বাজাতে বাজাতে একসময় গানও ধরে। রসের গান :

সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।
তর সোনার অঙ্গ জরজর,
তর বুকের ভিতর থরথর,
তুই কি করিতে কি যে কর,
মরলাম ভেবে সেই ভাবনা।
সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।

উম্ধবের প্রাণটা আজ অকারণ খুশিতে ভরে আছে। না হলে কি সে এই রসের গান ধরত!

গাইতে গাইতে কিলপঙ নদীর পারে এসে পড়ে উম্ধব।

সোনার বল্লমের মত কয়েকটা রোদের রেখা কিলপঙ নদীটাকে বিঁধে রেখেছে।

কয়েকটি যুবতী মেয়ে জল নিতে এসেছিল। উম্ধবকে দেখে তারা চঞ্চল হল।

কিলপঙ নদীর পারে গুঞ্জন উঠল, 'আইছে লো, বৈরাগী ভাই আইছে। মুখখান তার যা আলগা, কিছুই বাধে না।'

বাউল বৈরাগী মানুষ উম্ধব। মাপজোখ করে কথা বলা তার স্বভাবেই নেই। যা তার প্রাণে আসে, তাই সে বলে ফেলে। তার রাখ রাখ ঢাক ঢাক নেই, বাছ-বিচার নেই। মনের কথা সে মনের মধ্যে গোপন করে রাখতে জানে না। জিভের আগায় যা আসে তাই বলে বসে সে। কি বলতে কি যে

বলবে উদ্ধব, আগে ভাগে তার হদিস মেলে না। যুবতীরা শুধু এটুকু জানে, উদ্ধবের মুখে কিছুই আটকায় না। এটুকু জেনেই তারা কাঁটা হয়ে থাকে।

কিলপণ্ড নদীর পারে দাঁড়িয়ে রঙ্গ শুরু করল উদ্ধব। গানের প্রথম পদ দুটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেনে টেনে গাইতে লাগল :

সোনাদিদি লো,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা—

গায় আর নাচে উদ্ধব। একসময় গান থামিয়ে সে বলল, 'সোনাদিদিরা, জল নিতে আইছ বুঝি ?'

'হ।' যুবতীরা সংক্ষেপে জবাব সারে।

এত যে দুঃখ, এত যে কষ্ট, বাঁচার জন্য এই যে অন্তহীন লড়াই তবু মানুষের প্রাণ তো মরে না। প্রাণের সেই আনন্দ মরে না। অন্তত উদ্ধব বরাগীর মত মানুষ প্রাণের সেই আনন্দটাকে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেও মরতে দেয় না। তাজা সজীব সরস করে রাখে।

উদ্ধবদের জন্যই মানুষ বার বার মরেও বার বার বাঁচে। তারা যে দুঃখ এবং যন্ত্রণাকে নিঙড়ে নিঙড়ে ফোঁটা ফোঁটা আনন্দ বার করতে জানে।

উদ্ধব বলে, 'জল নিতে আইছ না জল সইতে আইছ দিদিরা ?'

একটি মেয়ে বলে, 'বিয়া লাগল কার যে জল সইতে আসুম ?'

'ক্যান তোমাগো হগলের।'

মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফিক করে একটু হাসে মেয়েটি। অন্য মেয়েদের মুখ লাল হয়ে ওঠে।

মেয়েটি বড় মুখরা। সে বলে, 'কার লগে বিয়া ?'

'আমার লগে।'

বলেই গেয়ে ওঠে উদ্ধব :

সোনাদিদিরা,
পরাণে লাগাইয়া দিলি ভাবনা।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। খিল খিল, ফিক ফিক হাসি। জলের টিন নিয়ে তর তর করে টিলা বেয়ে বেয়ে যুবতীরা চলে যায়।

যুবতীদের কাণ্ড দেখে ফোগলা মুখে হাসে উদ্ধব বৈরাগী। প্রাণখোলা উদার হাসি।

যুবতীদের পেছন পেছন উদ্ধবও চলে যেত ; কিন্তু হঠাৎ তার চোখে পড়ল, নদীর পারে তিলি বসে আছে। কোনদিকে তার লক্ষ্য নেই। উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কি যেন ভাবছে। কী ভাবছে তিলি ?

উদ্ধব নিজের মনেই বলল, 'আমি তো অরে অন্তরযামী না, তিলি কি ভাবে, কমনে জানুম ?'

টিলা থেকে নীচে নেমে এল উদ্ধব। তিলির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

এক একদিন বয়সটা অনেক কমে যায় তার। অশ্ভুত এক ছেলেমানুষিতে তখন তাকে পেয়ে বসে। উম্ধব ডাকল, 'তিলি—'

তিলি জবাব দিল না। যেমন বসে ছিল তেমনি রইল।

একদৃষ্টে তিলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে উম্ধব। মেয়েটার কপালে মেটে সিঁদুরের মস্ত এক টিপ। সেটা দেখতে দেখতে গান শুরু করল সে :

তুমি কি দিয়া ভুলাইলা
শ্যামচান্দের মন রে—
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত (অবাক) আমি।
তোমার কপালের সিন্দুরে
ঝলমল ঝলমল করতাছে
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত আমি।
তুমি কি দিয়া—

তিলি হঠাৎ ক্ষেপে উঠল, 'তুমি থাম দেখি বৈরাগী দাদা—'

'ক্যান, থামুম ক্যান? থামনের হইল কী?'

'রসের কথা কি সব্বক্ষণ ভাল লাগে?'

'আমার তো লাগে।'

'তোমার কথা ছাড়ান দাও।'

'ক্যান, আমার কথা ছাড়ান দিমু ক্যান? আমি কি পিরথিমী ছাড়া?'

বিষণ্ণ একটু হাসল তিলি। বলল, 'হ গো, তাই। তুমি বাউল বৈরাগী মানুষ। তোমার কথাই ভিন্ন। তোমার সব্ব অঙ্গে রস, তোমার পরাণভরা রস। হইত যদি সোংসারী মানুষ, বুঝতা জ্বালা কারে কয়! বুঝতা সোংসারের তাপে রস কেমনে শুকাইয়া যায়!'

উম্ধব কিছুই বুঝতে চায় না। অবুঝ গলায় গেয়ে ওঠে :

তোমার কপালের সিন্দুরে
ঝলমল ঝলমল করতাছে,
দেখিয়া, দেখিয়া আচম্বিত আমি—

তিলি এবার ক্ষেপে উঠল, 'খুব তো সিন্দুরের বাখান কর। কিন্তুক এই সিন্দুরের যে কি জ্বালা, হেয়া তো কোন কালে বুঝলা না বৈরাগী ভাই। হইতা মাইয়া মানুষ, পিরথিমীতে আমার লাখান আর এক তিলি হইয়া জন্ম নিতা, বুঝতা সিন্দুরের জ্বালা কারে কয়!'

আর মজা করল না উম্ধব। তিলির পাশে বসে পড়ল। তার থমথমে উদাস মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, 'কী হইছে রে দিদি?'

তিলি জবাব দিল না।

তিলির কাঁধে অল্প একটু ঠেলা মেরে উম্ধব আবার বলল, 'হরিপদর লগে কিছু হইছে?' তার গলায় উদ্বেগ [illegible]ট।

বড় দুঃখে হাসে তিলি। বলে, 'এইটা কি আর নয়া কথা বৈরাগী ভাই! জনমভর কোন দিনটা বাদ গেছে, যেইদিন তার লগে আমার লাগে নাই! একটা দিনও চুলাচুলি ছাড়া যায় নাই গো ভাই, একটা দিনও না।'

তিলি এমনিতেই ঘোমটা দেয় না। আজ কি মনে করে দিয়েছিল। ঘোমটাটা খসে পড়েছে। ঘোমটা-খসা, উদাসিনী তিলি নদীর দিক থেকে চোখ ফেরায় না।

হরিপদকে নিয়ে তিলির যে দুর্বিষহ জীবন তার কথা কলোনির সবাই জানে। এ ব্যাপারে তিলিদের দিক থেকে ঢাকাঢাকি বা গোপন করার চেষ্টাও নেই।

আর কিছু রটুক আর নাই রটুক, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ার খবরটা ঠিকই জানাজানি হয়ে যায়।

কথায় কথায় বুড়ী বাসিনী প্রায়ই বলে, 'সু তো রটে না, কু-টাই রটে।'

গভীর গলায় উদ্ধব বলে, 'মানাইয়া নে দিদি, মানাইয়া নে। হাজার হউক সোয়ামী তো।'

উদ্ধব আন্দাজ করে নিয়েছে, হরিপদর সঙ্গে আজও তিলির কিছু একটা হয়েছে। তিলির মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোয় সে। বলে, 'মাইয়া মাইনষের জন্ম নিয়া এই পিরথিমীতে আইছস। মাইয়া মাইনষের অনেক কিছু সইতে হয় দিদি, অনেক সইতে হয়—'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কিছুই বলে না।

হঠাৎ একসময় তিলি ডাকল, 'বৈরাগী ভাই—' ডেকেই থেমে গেল।

উদ্ধব বলল, 'কী কও?'

কি যেন একটু ভেবে নিল তিলি। তারপর বলল, 'আইছা বৈরাগী ভাই, আমি তো একজনের বউ।'

'হ হেয়া তো ঠিকই।'

'আমার এই শরীল, এই মন যখন সোয়ামীর কোন কামে লাগল না, তখন এগুলিনরে যদি উড়াইয়া দেই, পুড়াইয়া দেই—'

'কী কস তিলি?' উদ্ধব শিউরে উঠল।

তিলি তার কথার জবাব দিল না। নিজের খেয়ালেই বলতে লাগল, 'নিন্দা রটব। জানি পিরথিমীর হগল মানুষ আমার গায়ে ছ্যাপ (থুথু) দিব, মুখে চুনকালি মাখাইব। তবু এ ছাড়া আমার আর উপায় নাই বৈরাগী ভাই।'

উদ্বিগ্ন স্বরে উদ্ধব বলল, 'তিলি, তর মনে কী আছে রে বইন (বোন)?'

'আমার মনে যা আছে, সময় আইলেই জানতে পারবা। মনে যা আছে হেয়া আমি করুম, করুম করুম। নিচ্চয় করুম। এই কথা তোমারে কইয়া রাখলাম।' বলতে বলতে হঠাৎ তীক্ষ্ণ রিনরিনে গলায় হেসে উঠল তিলি। তার বিড়ালীর মত কটা চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

তিলির চোখে সর্বনাশ দেখতে পেল যেন উদ্ধব। সে মারাত্মক ভয় পেয়ে গেল।

২৪

এখন দুপুর।

সেই সকালে উপসাগরে নেমেছিল লা তে। নটিলাস, টার্বো, ট্রোকাস, সান ডায়াল—নানা জাতের নানা চেহারার সামুদ্রিক কড়ি তুলে খানিকটা আগে জল থেকে উঠেছে।

এরিয়াল উপসাগরটা ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে ডান দিকে যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে একটা কালো পাথরের চাঙড়ার ওপর চুপচাপ বসে আছে লা তে।

বাঁ দিকে খানিকটা দূরে একটা প্যাডক গাছের নিচে তিন টুকরো ইটা সাজিয়ে উনুন বানিয়ে নিয়েছে পানিকর। উনুনে ভাত ফুটছে।

আকাশে পেঁজা তুলোর মত টুকরো টুকরো ছন্নছাড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে রোদের তেজ এতটুকু মরে নি। তীব্র ধারাল উত্তেজক রোদে নোনা জল গেঁজে গেঁজে উঠছে।

দুই হাটুর মাথায় থুতনি রেখে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে লা তে। জল শুকিয়ে গায়ে নুন ফুটে বেরিয়েছে। আন্দামানের দরিয়ার সঙ্গে কত কালের জানাশোনা তার। বার চোদ্দ বছর বয়স থেকে শেল ডাইভারের কাজ করে আসছে সে। কোন উপসাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে টার্বো আসে, কোন উপকূলে হাঙর আর অক্টোপাসের আস্তানা, কোথায় পার্ল শেল, কোথায় ফ্রগ শেল, কোথায় নটিলাস আর কোথায় নী-ক্লাম মেলে—এ সব খবর লা তে'র জানা। রেমোরা মাছ, হাঙর আর কামটের সঙ্গে লড়ে লড়ে সে সিপি তোলে। দরিয়া থেকে কর আদায় করে। পনের বিশ বছর ধরে সিপি তুলতে তুলতে দরিয়ার সঙ্গে অদ্ভুত এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে লা তে'র। সঙ্গে যখন কেউ থাকে না, যখন একেবারেই একা হয়ে পড়ে, কিংবা যখনই একটু ফুরসত পায়, নিরিবিলি সমুদ্রের মুখোমুখি গিয়ে বসে লা তে। ফিস ফিস করে সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলে। দরিয়ার সঙ্গে লা তে'র অনেককালের নিবিড় বন্ধুত্ব। তার সত্তার সঙ্গে, অস্তিত্বের সঙ্গে, স্বভাবের সঙ্গে সমুদ্র মিশে আছে।

এখন ঝিম দুপুর।

শীতের অনেক আগেই সুদূর হিমালয় থেকে হাজার হাজার পাখি বাতাসে ভাসতে ভাসতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ডিম পাড়তে আসে। শীত যেই শেষ হয়, ডিম পাড়া যেই সারা হয়, পাখিরা আবার ফিরে যায়।

ছোট ছোট ডানায় দিগন্ত মাপতে মাপতে পাখিরা এখন হিমালয়ে ফিরে যাচ্ছে।

লা তে পাখি দেখছিল না। সমুদ্রের দিক থেকে চোখ ফেরাতে মন তার সায় দিচ্ছিল না।

উপসাগরটা অগভীর। এখানে জল সবুজ। কিন্তু দূরে জল গভীর, গম্ভীর, গহীন কালো। অনেক দূরে যার পর আর দৃষ্টি চলে না, যেখানে আকাশের নীল আর সমুদ্রের কালো একাকার সেই জায়গাটা ধূসর হয়ে রয়েছে। সাদা কুয়াশার মত কি যেন জমে আছে সেখানে। কেমন যেন দুর্বোধ্য দুজ্ঞেয় দেখায়।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল লা তে। অগভীর উপসাগরের মেজাজ সে কিছুটা জানে, নানা জাতের সিপির খবরও তার জানা। কিন্তু অনেক দূরে সমুদ্র যেখানে অথৈ অতল সেখানকার কথা সে জানে না।

এতকাল নোনা জলে ডুবে ডুবেও সমুদ্রকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারল না লা তে। সমুদ্র রহস্যময় হয়েই রইল তার কাছে। সমুদ্র শুধু জল ঢেউ আর গর্জনই নয়। সে আরো কিছু। সমুদ্র যে ঠিক কি, অল্পই বুঝতে পারে লা তে। বেশিরভাগই তার না বোঝা।

দূরে তাকিয়ে লা তে ভাবল, আর উপসাগরের অগভীরে না, যেখান থেকে সিপিয়া উপকূলের দিকে আসে, সমুদ্রের সেই গভীরে একবার সে যাবে। ফিস ফিস করে সে বলতে লাগল, 'যাব, জরুর একরোজ দরিয়ার অন্দরে ডুব মারব। দেখব, তোর অন্দর কী আছে?'

'শালে কি পাগলা বনলি! বিজির বিজির করে কি বকছস!'

লা তে চমকে উঠল। কখন যে পানিকর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারে নি। লাল লাল দাঁত বার করে খুব একচোট খ্যা খ্যা করে হাসল লা তে। তারপর বলল, 'কী মতলব মালেক?'

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'কি আবার মতলব! নালায়েক হারামীটা দরিয়া দেখলে বাওরা বনে যায়! খাবি না? কখন খানা পাকানো হয়ে গেছে!'

'হাঁ মালেক—' লা তে উঠে পড়ল।

খেতে বসে পানিকরের চোখে পড়ল। শুধু আজই না, দিন কয়েক ধরেই লোকটাকে দেখছে সে। পানিকর ডাকল, 'লা তে—'

'হাঁ মালেক—'

'হুই দ্যাখ্—দেখছিস, লোকটা আজও এসেছে।'

'হাঁ।' সংক্ষেপে জবাব সেরে মাছের সুরুয়া দিয়ে ভাত মাখতে লাগল লা তে।

পানিকর বলল, 'মনে হচ্ছে, লোকটা রিফুজি সেটেলমেন্টের কেউ হবে।'

লা তে জবাব দিল না।

পানিকর বলল, 'তোকে এক রোজ বলেছিলাম, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ইয়াদ আছে ?'

'আছে।' বলে একটু কি যেন ভেবে নিল লা তে। ফের বলল, 'লেকিন আপনার মতলবটা তো জানি না।'

ফিস ফিস করে পানিকর বলল, 'জানবি জানবি। সময় যখন হবে তখন আপসে জানতে পারবি। থোড়া সবুর কর।' পানিকরের চোখে অদ্ভুত একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

খাওয়ার পালা চুকিয়ে পেতলের থালাগুলো উপসাগরের জলে ধুয়ে মোটর বোটে রাখল পানিকর। তারপর বলল, 'চল্ লা তে—'

'কোথায় ?'

'হুই লোকটার সংগে খাতির জমিয়ে আসি। ওর মারফতই রিফুজি সেটেলমেণ্টে যাব। সমঝালি ?'

লা তে মাথা ঝাঁকাল।

অন্য দিনের মত আজও এরিয়াল উপসাগরে এসেছে নিত্য ঢালী। নোনা জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যে পাথরটা কচ্ছপের আকার পেয়েছে, তার ওপর চুপচাপ বসে রয়েছে। উদাস চোখে সামনের দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে সেই পুরানো ভাবনাটা ভাবছে সে। কি মানুষ ছিল, আর কি হয়ে গেল! ঘরে সোনাদানা মণিমাণিক্য না থাক, তবু দেশে থাকতে নিত্যর হাত-ভরা পয়সা ছিল। পাটবেচা, ধানবেচা কাঁচা পয়সা। পঁচিশ কানি তেফসলা জমি রাখত সে। অভাব তার কোনকালেই ছিল না। যে মানুষ দেশে থাকতে এত পয়সা নাড়াচাড়া করেছে, সরকারী খয়রাতের সামান্য ক'টি টাকা ছাড়া এখন তার হাতে আর কিছুই পড়ে না।

তা ছাড়া কাপাসী মেয়েটা যে আবার কোনদিন ভাল হবে, সুস্থ হবে, এমন আশা নিত্যর মন থেকে প্রায় নির্মূলই হয়ে গেছে। পৃথিবীতে তার মত দুঃখী আর কে ?

দূরের সমুদ্র-দ্বীপ-আকাশ হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল।

প্রথম প্রথম নিত্যর মনে হল, দিনটা বুঝি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার ভুল ভাঙল। নিজের জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখ দুটো ভিজে গেছে। চোখের জলই সামনের সব কিছু আবছা করে ফেলেছে।

হাতের পিঠে চোখ মুছতে মুছতে আচমকা নিত্য ডাকটা শুনতে পেল, 'এ বুড্ঢা—'

মুখ ফিরিয়ে নিত্য ঢালী দেখল, সেই লোক দুটো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কুচকুচে কালো, কোঁকড়ানো-চুল যার সে মোটর বোট চালায়। আর কুতকুতে-

চোখ, থ্যাবড়া-নাক একটা লোক, যে উপসাগরের জলে ডুব মেরে মেরে কি যেন তোলে।

পানিকর বলল, 'তোমাকে রোজ এখানে দেখি।'

'হ বাবা—' নিত্য ঢালী হাউ হাউ করে উঠল, 'কী আর করি বাবা, কোলোনিতে মন বহে না। খালি দুঃখু আর দুঃখু। ঘরভরা দুঃখু, পরাণ ভরা দুঃখু। দুঃখুর আর পারকুল নাই। তাই এইখানে আইসা যতক্ষণ পারি একা থাকি। যাউক ঐ সব কথা।' একটু থামল নিত্য। খানিকটা পর খুব উৎসুক সুরে বলল, 'বাবা, আপনেরাও তো রোজ এইখানে আহেন।'

'হাঁ, আমাদের রোজই আসতে হয়।'

'হেয়াই দেখি। আইচ্ছা বাবা, একখানা কথা জিগামু (জিজ্ঞাসা করব)?'

'কী কথা?'

'রোজই দেখি ঐ উনি—' লা তে'কে দেখিয়ে নিত্য ঢালী বলল, 'জলে ডুব দিয়া দিয়া কি য্যান তোলে। কী তোলে বাবা?'

'সিপি (শেল)।'

'সিপি দিয়া কী হয়?'

'ব্যবসা হয়। বিক্রি হয়।'

'ও।'

নিত্য ঢালী চুপ করে গেল। পানিকর আর লা তে তার পাশে ঘন হয়ে বসল।

পানিকর বলল, 'আমার নাম পানিকর। আমি প্রোপ্রাইটার, মালেক। আর এই বর্মীটা হল লা তে। ডাইভার। বুঝলে বুড়্ঢা?'

নিত্য ঢালী সামান্যই বুঝল। লা তে এবং পানিকর নামধারী দুটি আজব মানুষের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু।

পানিকর আবার বলল, 'তোমার নাম কী?'

নিত্য তার নাম বলল।

'তোমরা তো রিফুজি?'

'হ বাবা।'

'তোমরাই তা হলে কলোনি বানাচ্ছ?'

'হ বাবা।'

খানিকটা চুপচাপ।

এরিয়াল উপসাগর সমানে গর্জায়। বিরাট বিরাট ঢেউগুলো বিপুল আক্রোশে পারের ম্যানগ্রোভ বনে আছাড় খায়।

হঠাৎ এক সময় পানিকর বলে, 'আচ্ছা বুড়্ঢা, তুমি কাম করবে?'

বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে থাকে নিত্য ঢালী।

পানিকর বোঝাতে থাকে, 'তামাম দিন এই পাথরটার ওপর তো চুপচাপ

বসেই থাক। তার চেয়ে কাম কর না, রূপাইয়া মিলবে।'

'টাকা পামু ?' নিত্য ঢালীর ঘোলাটে চোখ দুটো চক চক করে।

'কাম করবে আর টাকা পাবে না ?' অদ্ভুত শব্দ করে পানিকর হাসে।

নিত্য ঢালী মনে মনে কি যেন ভাবে। বিড় বিড় করে কি যেন বকে। বুঝি বা ভাবে, যতক্ষণ সেটেলমেণ্টে থাকবে ততক্ষণ কাপাসীর অবুঝ হাসি শুনতে হবে। কাপাসীর হাসি তাকে অস্থির উন্মাদ করে তোলে। কাপাসীর মুখের দিকে তাকালে বিচিত্র এক যন্ত্রণা তাকে বিকল করে দেয়।

একরকম কাপাসীর ভয়েই এই নির্জন উপসাগরের পারে এসে চুপচাপ বসে থাকে নিত্য ঢালী। কিন্তু এখানে এসেও কি রেহাই মেলে! দামিনী বউ, কাপাসী, দেশভাগ, মাতানি নদীর পারে সেই ছোট হীরাকুপি গ্রামটা, জমি-জিরেত, সাত পুরুষের ভিটেমাটি—হাজারটা চিন্তা হাজার দিক থেকে তার মাথায় নখ বেঁধায়। তাকে কাবু করে ফেলে।

এই চিন্তা, এই অসহ্য দুঃখ আর যন্ত্রণা কিছুক্ষণের জন্যও অন্তত ভুলে থাকতে চায় নিত্য ঢালী। কিন্তু কেমন করে ?

নিত্য ঢালী ভাবল, পানিকরের কাছেই কাজ করবে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে আর যাই হোক, কাপাসীর কথা খানিকটা সময়ের জন্য ও ভুলতে পারবে। হা ঈশ্বর, এই কাজটা যেন তার হয়।

দুই হাঁটুর ফাঁক থেকে থুতনি তুলে নিত্য ঢালী বলল, 'কিন্তুক পানিকর বাবা, আমি কি আপনের কাম পারুম ?'

'পারবে, পারবে। জরুর পারবে। লা তে তোমাকে সব শিখিয়ে দেবে।'

নিত্য ঢালীর সঙ্গে এ-কথা সে-কথা বলে একসময় উঠে পড়ল দু'জনে। লা তে আর পানিকর পাশাপাশি চলেছে। কাজটা হাসিল হয়েছে, সেই খুশিতেই মশগুল হয়ে আছে পানিকর। এবারকার মরসুমে লা তে ছাড়া অন্য ডাইভার পায় নি সে। একজন মাত্র ডাইভারের ভরসায় মরসুম চালানো দুরূহ ব্যাপার। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে ধানুককে ভাগিয়ে এনেছিল পানিকর। কিন্তু হাঙর আর কামটের ভয়ে ধানুক তো জলেই নামল না।

পানিকর ভাবছিল, নিত্য ঢালীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে কিছুটা অন্তত কাজ চলবে। তা ছাড়া মাথায় অন্য একটা মতলব আছে। সেটার কথা ভাবতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল পানিকর। নিত্য ঢালীর মারফত সে রিফুজি সেটেলমেণ্টে ঢুকবে। তাকে সেখানে ঢুকতেই হবে।

২৫

দিন সাতেক পর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফিরে এল পালসাহাব। এরিয়াল উপসাগর থেকে জঙ্গল ফুঁড়ে সেটেলমেণ্টে পেঁছুতে পেঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল

তার। প্রথমেই নিজের ঝুপড়িতে গেল না সে। কলোনির সবাইকে উদ্ধব বৈরাগীর ঝুপড়িতে ডেকে আনল।

চারপাশে চারটে মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে উদ্ধব।

ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝোকানো রয়েছে পালসাহাবের। ফলে কপাল আর ভুরু ঢাকা পড়েছে। মশাল থেকে যেটুকু আলো পাওয়া গেছে তাতে মুখের চামড়া পোড়া তামার মত দেখাচ্ছে। বাদামী চোখদুটো ধক ধক করছে। ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পালসাহাব।

সবাই ভয়ে ভয়ে পালসাহাবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ভিড়ের মধ্য থেকে বুড়ী বাসিনী উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কী হইল সাহাব বাবা, কিছু সুরাহা হইল ?'

পালসাহাব জবাব দিল না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল।

বাসিনী আবার বলল, 'হাল বলদের কী হইল সাহাব বাবা ?'

'কুছু না, কুছু না—'

দু হাতে মুখ ঢাকল পালসাহাব। ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'তোদের জন্যে কুছু করতে পারলাম না। এত চেষ্টা করলাম! লেকিন—' ফুসফুসটা খালি করে বড় একটা শ্বাস ফেলল পালসাহাব। হতাশ গলায় বলল, 'লেকিন কিছুই হল না।'

সামনের মানুষগুলো আঁতকে উঠল, 'হাল বলদ পাওয়া যাইব না ?'

মাথাটা ঝুলে পড়েছে। আস্তে আস্তে ডাইনে বাঁয়ে সেটা নেড়ে পালসাহাব বলল, 'না। বড় বড় অফসরদের এত বললাম, কিছুই হল না। এক বরষের আগে বলদ কি ভইস আসার কোন উপায় নেই। ইণ্ডিয়া মুলুকের মেনল্যাণ্ড থেকে বলদ ভইস আসবে। লেকিন জাহাজই পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করব!'

যে মানুষের আশায় ভরসায় তারা বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়ছে, যার প্রাণশক্তি হাজার অপচয় করেও ফুরোয় না, সেই পাল-সাহাবকে এমন হতাশ হতে, এমন ভেঙে পড়তে আর কোনদিনই দেখে নি মানুষগুলো।

'সব্বনাশ! কী হইব ?' অনুচ্চ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বিলাপের মত শব্দ করতে লাগল মানুষগুলো।

'হাল বলদ না পাইলে চাষ হইব ক্যামনে ? কত আশা লইয়া আন্ধারমান আইছি। মাটি পাইছি। কিন্তুক ভগমান বাদ সাধল। এইবার কী করুম ? কুনখানে যামু ? ক্যামনে বাচুম ?'

জীবনে যখন কোন সমস্যা আসে তার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পর্যন্ত এই মানুষগুলো হারিয়ে ফেলেছে। দেশভাগ তাদের একেবারেই বিকল করে দিয়েছে। সমস্যা যখনই সামনে এসে পড়ে তারা সহজ কোন উপায় খুঁজে পায়

না, আর পায় না বলেই বিব্রত বিমূঢ় মানুষগুলো সমস্বরে কান্না জুড়ে দেয়।

আজও তারা কাঁদছে। হাল বলদ দিয়ে চষে পরল পারল মাটি তুলে ফেলতে না পারলে এই দ্বীপে ফসল ফলাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। অথচ পালসাহাব বলছে, বছর খানেকের আগে বলদ কি মোষ মিলবে না। এ রকম একটা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে মানুষগুলো কাঁদা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে।

মানুষগুলোর কান্না শুনলে অন্য দিন পালসাহাব খিস্তি করত, খেঁকিয়ে উঠত। কিন্তু আজ সে নিজেই হতাশ হয়ে পড়েছে। সে কিছুই বলল না।

বুড়ী বাসিনী এক কিনারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে পালসাহাবের কাছে এগিয়ে এল। ডাকল, 'সাহাব বাবা—'

'হাঁ—' অস্ফুট একটা শব্দ করল পালসাহাব।

'আর কোন উপায়ই কী নাই? অন্য কুনো জায়গা থিকা হালের বলদ আনা যায় না?'

'যায়। লেকিন—'

'লেকিন কী সাহাব বাবা?'

'অনেক রুপেয়ার দরকার।' বলে একটু থামল পালসাহাব। তারপর শুরু করল, 'পুট বিলাস (পোর্ট ব্লেয়ার) থেকে আসার সময় একবার লং আইল্যাণ্ড নেমেছিলাম। লং আইল্যাণ্ড থেকে রঙ্গত গেলাম। রঙ্গতে রিফুজি সেটেলমেণ্ট বসেছে। সেখানে খোঁজ করলাম হালের জন্যে যদি বলদ কি ভইস মেলে।'

'মিলল বাবা?' আগ্রহে বুড়ী বাসিনীর মুখটা ঝকমক করে।

'মিলেছে। ওখানকার রিফুজিরা চোদ্দটা বলদ বেচতে চায়। লেকিন এক একটার দাম তিন শ রুপেয়া। চোদ্দটার দাম পুরা চার হাজার আউর দো শ' রুপেয়া। অত রুপেয়া কোথায় পাব?'

খানিকটা চুপচাপ।

মানুষগুলো কান্না থামিয়ে ঝিম মেরে বসে থাকে।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল পালসাহাবের। সে বলল, 'একটা উপায় হতে পারে।'

'কী উপায় সাহাব বাবা?'

'সব রুপেয়া এক সাথ না দিলেও চলবে। পয়লা দফে এক হাজার রুপেয়া দিতে হবে। তারপর মাহিনায় মাহিনায় (মাসে মাসে) দিতে হবে। ভাবছি ক্ষেতির সময় তোরা তো ক্যাশ ডোল পাবি। এক এক আদমীর ডোল থেকে মাহিনায় এক এক টাকা কেটে বলদের দাম দেব।'

'তাই দ্যান, তাই দ্যান—'

এতক্ষণ মানুষগুলো দম বন্ধ করে যেন বসে ছিল। এবার সুরাহার একটা উপায় খুঁজে পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

এতক্ষণে পালসাহাবের গলায় ধমক ফুটল, 'চুপ, চুপ শালে লোগেরা। হল্লা-গল্লা লাগিয়ে দিয়েছে। আগে সব শোন্। পয়লা দফের হাজার রুপেয়ার কি হবে?'

মুহূর্তে উৎসাহ চুপসে গেল। মানুষগুলো আগের মতই আবার মলিন মুখে বসে রইল।

দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কেটে যায়।

প্রথম দিকে প্রবল উদ্যমে জ্বলে জ্বলে মশালগুলো এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। জঙ্গলের দিক থেকে ঠাণ্ডা উল্টোপাল্টা হাওয়া দিয়েছে।

হঠাৎ বাসিনী বলল, 'আপনেরা এট্টু খাড়ন, আমি আইতে আছি।' বলতে বলতেই পূব দিকের টিলাটার দিকে ছুটল। একটু পর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বলল, 'এইটা দ্যাখেন দেখি সাহাব বাবা—'

পুরনো গড়নের একটা সোনার বিছে হার পালসাহাবের হাতে তুলে দিল বুড়ী বাসিনী। পালসাহাব তাজ্জব বনে গেছে। সে বলল, 'সোনার হার কোথায় পেলি রে বুড্ঢী?'

'হে অনেক কথা সাহাব বাবা। ঐ হার আমার শাউড়ী আমার বিয়ার সময় দিছে। আমার শাউড়ী তার বিয়ার সময় তার শাউড়ীর কাছ থিকা পাইছিল।' একটু থামল বুড়ী বাসিনী। পরক্ষণে উদাস গলায় শুরু করল, 'দ্যাশখান দুই ভাগ হওয়ার পর কিছুই তো আনতে পারি নাই, খালি শ্বউরকুলের ঐ চিহ্নটুক ছাড়া। কত বিপদ আপদ গেছে, কতদিন না খাইয়া থাকছি। তবু ঐটুক সোনা বেচতে পারি নাই।' আবার থামে বাসিনী। অল্প অল্প হাঁপায়। ঘোলা ঘোলা, আবছা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'সাহাব বাবা, আমার তিনকুলে কেউ নাই। সোয়ামী না, পুত না, বাপ না, ভাই না, বান্ধব না। খালি ঐ রসিকই যা আছে। আমারে খুড়ী ডাকছে। ও ছাড়া আর কেউ নাই। নিজের বিপদ আপদের কথা ভাবি না। তিন কাল গেছে। কয়দিন আর বাচুম। তাই ভাবলাম, এই হারখান যদি হগলের কামে লাগে, উপকারে লাগে—'

একদৃষ্টে বাসিনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে পালসাহাব। কিছু একটা সে বলতে চাইল, পারল না। অদ্ভুত এক আবেগে তার গলাটা বুজে আছে।

একটু আগে মানুষগুলো চিৎকার করে কাঁদছিল। কান্না থামিয়ে এখন তারা পালসাহাবের মতই বাসিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে যত আনন্দ তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়। সমস্যাটার যে এমন একটা সমাধান হয়ে যাবে, আগে ভাগে কেউ কি তা ভাবতে পেরেছিল।

বাসিনী বলল, 'হারটার ওজন আছিল দশ ভরি। ঐটা বেচলে হাজার ট্যাকা হইব না সাহাববাবা?'

'হবে হবে, জরুর হবে।'

এবার এক কাণ্ডই করে বসল পালসাহাব। পাগলা দু হাতে বুড়ী বাসিনীকে ওপরে তুলে ধরল। তারপর কয়েক পাক ঘুরিয়ে বলল, 'তুই মানুষ না, এই সেটেলমেণ্টের সব শালে লোগের মা।'

পাক খেতে খেতে বুড়ী বাসিনী চেঁচাতে লাগল, 'ছাড়েন সাহাব বাবা, ছাড়েন। পড়লে নিঘ্ঘাত মইরা যামু, মইরা যামু।'

যতই চেঁচাক বাসিনী, পালসাহাব তাকে ছাড়ে না।

২৬

উজানী বুড়ীর হয়েছে যত জ্বালা! সেই যে সেদিন বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হল, তার পর থেকে হারাণ আর ঘরমুখো হয় না। সকাল-দুপুর রাত, সারাটা দিনের মধ্যে একবার এসে উজানী বুড়ীর খোঁজও নেয় না। কোথায় কোথায় যে সে কাটায়!

পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই উজানী বুড়ীর। এক ঐ হারাণ। একটা মাত্র নাতি। তার হাত ধরে বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেছে সে। ঘর তুলেছে হারাণ। কিন্তু সেই ঘর শূন্য, খা-খা। হারাণই যদি না থাকে তবে সেই ঘর দিয়ে কি হবে? একা একা কেমন করে দিন কাটায় উজানী বুড়ী!

এখন সকাল। উঠোনের এক কিনারে দুই হাঁটু আর এক মাথা জোড়া করে চুপচাপ বসে রয়েছে উজানী বুড়ী। আবছা উদাস চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটো ফোলা ফোলা, টকটকে লাল। বোঝা যায়, কয়েকদিন ধরে সে সমানে কাঁদছে।

পুব দিকের কুয়াশা ছিঁড়ে রোদ দেখা দিয়েছে। সূর্যটাকে এখন এক পিণ্ড নরম রক্তিম মাখনের মত দেখায়।

উঠোনের আর এক কিনারে একটা ছোট প্যাডক গাছ। গাছটা পাতার জিভ মেলে রোদের নির্যাস শুষছে। মগডালে একটা হলদিবনা পাখি আর তার পাখিনী বাসা বুনেছে। এখন পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না। একা একা পাখিনীটা চেঁচামেচি শুরু করেছে।

উজানী বুড়ীর মন নানা ভাবনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল। নানা জনে নানা কথা তাকে বলে যাচ্ছে।

কাল রাত্রে কুমী এসেছিল। সে বলেছে, 'বুঝলা মাউই, তোমার হারাইণা রাইক্ষসীর মায়ায় পড়ছে। ঐ যে হাসনী ঢলানী কাপাসী—পাগল না ছাই, হে-ই তোমার নাতির মাথাখান খাইতে আছে। নাতিরে বান্ধো, তার মন বান্ধো। না হইলে কাইন্দা কুল পাইবা না মাউই।'

উজানী বুড়ী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'কেমনে তারে বান্ধুম কুমী? হে কি দুধের শিশু যে হাতে পায়ে দড়ি দিয়া রাখুম।'

'বিয়া দাও, বিয়া দাও মাউই। তা হইলেই ঠিক হইয়া যাইব।'

'দিমু, তাই দিমু। কিন্তুক শয়তানটা যে ঘরেই আহে না। কী করি! হা ভগমান, হারাইণার মতিগতি ভাল কইরা দাও।' কেঁদে, চুল ছিঁড়ে, গড়াগড়ি খেয়ে নিজেকে অস্থির করে তুলেছিল উজানী বুড়ী।

উজানী বুড়ী হারাণের কথাই ভাবছিল এই মুহূর্তে। কেমন করে তার মতিগতি ভাল হবে, তার মন কাপাসীর দিক থেকে ফিরবে, ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল।

মেয়েমানুষের দেহই হল সব। ধর্ম বল, কর্ম বল—দেহ ছাড়া মেয়েমানুষের আছে কী! দেহই যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে বাকি থাকে কী? কিছুই না। মেয়েমানুষ তখন শুধুই ফক্কিকার।

কাপাসীর শরীর নষ্ট হয়ে গেছে। সে কোন কাজে আসবে? তাকে নিয়ে ধর্ম চলবে না, কর্ম চলবে না, সমাজ সংসার অচল হয়ে যাবে। এই সোজা সহজ কথাটা কেন বোঝে না হারাণ?

হলদিবনা পাখিনীটা বড় ক্যাচর ক্যাচর লাগিয়েছে। দু দণ্ড সুস্থির হয়ে বসে একটা কথা যে ভাববে, তার কি যো আছে!

হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলল উজানী বুড়ী। পাখিনীটা পাতার ভেতর দিয়ে নেচে নেচে বেড়ায়। আর ডাকে, 'চিকির-চিকির চিক-চিক—'

উজানী বুড়ী বলে, 'মাগীর আহ্লাদ দ্যাখ। আমি মরি আমার জ্বালায়। আমি জ্বলি আমার দুঃখুতে। যা যা, এইখান থিকা যা। চৌখের আবডালে যা।'

পাখিনীটা ডাকে, 'চিকির-চিকির-চিক-চিক—'

'পুরী আমার শূন্য, বুক খা খা করে। ঘরে আমার কেও নেই। আর তরা, যত রাইজ্যের পাখপাখালি আপদ আইসা জুটছস। যা যা—হুস্—'

পাখিনী যায় না। ঘাড়টা বাঁকিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর ডেকে ওঠে, 'চিকির-চিকির-চিক-চিক—'

'তব কি, তর পরানে কত সুহাগ, কত আহ্লাদ। উজানী বুড়ী হইয়া পিরথিমীতে জন্ম নিতি, তা হইলে বুঝতি। এইবার থাম—থাম লা মাগী। হারাইণা নাই, তোগো নিয়া আমি কী করুম? পারলে তারে আইনা দে।'

পাখিনীটা কি বুঝল, সে-ই জানে। আগের মতই নাচল, লাফাল, ডাকল, 'চিকির-চিকির-চিক-চিক—'

অনেকক্ষণ পাখিনীটার সঙ্গে ঝগড়া করল উজানী বুড়ী।

একসময় পুরুষ পাখিটা ফিরে এল। খুব একচোট চেঁচামেচি করে তাকে নিয়ে বাসায় ঢুকল পাখিনীটা।

এদিকে একটু থিতিয়ে নিয়ে আবার হারাণের কথা ভাবতে শুরু করল উজানী বুড়ী। না, এই শেষ বয়সে হারাণ বুঝি তাকে আর জুড়োতেই দেবে না। সেই যে দেশভাগ হল, তারপর ক'টা বছর ক্যাম্পে ক্যাম্পে, স্টেশনের প্লাটফরমে কি ভাবে যে কেটেছে! দিন কেটেছে তো রাত কাটে নি। রাত যদি বা ফুরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত অফুরন্ত দুঃখের দিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুঃখ, দুঃখ। দুঃখের যেন শেষ নেই, পার নেই, কুল নেই। সুখ শান্তি সোহাগ আহ্লাদ বলে পৃথিবীতে আরো কিছু কিছু যে বস্তু আছে, সে সবের স্বাদ একেবারেই ভুলে গিয়েছিল উজানী বুড়ী। অনেক দুঃখ অশেষ যন্ত্রণা পার হয়ে একদিন এই দ্বীপে এসেছিল তারা। পায়ের নিচে মাটি পেয়ে উজানী বুড়ী স্বপ্ন দেখেছিল হারাণের বউ আসবে। নাতির বউকে নিয়ে জীবনের শেষ সাধটা সে মিটিয়ে নেবে। কিন্তু সবই কপাল, সবই অদৃষ্ট।

জীবনে কোন সাধই মিটল না উজানী বুড়ীর। সতের বছর বয়সে যখন তার ভরা যৌবন তখন স্বামী মরল। রাড়ী হল সে। তারপর একে একে সবাইকে খেল। ছেলেকে খেল, ছেলের বউকে খেল। আপন বলতে একটা মাত্র নাতি। উজানী বুড়ী শোকাতাপা মানুষ। কোথায় তাকে একটু শান্তি দেবে হারাণ তা না, নিত্য ঢালীর নষ্ট পাগল মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়!

উজানী বুড়ী বিড় বিড় করে বকতে লাগল, 'কিন্তুক সোনা, তুমি যা ভাবছ তা হইব না। আমি যদ্দিন পিরথিমীতে আছি তদ্দিন আমার মতেই চলতে ফিরতে হইব।'

একটু থেমে পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'বজ্জাতের ছাও, সাত দিন তুই ঘরে ফিরস না। মরতে মরতে সারা গেরাম তরে খুজছি, কিন্তুক পাই নাই। তুই যে কোথায় আছস, বুঝতে পারছি। আইজ হেইখানেই যামু।'

সাতটা দিন ধরে সমানে হারাণকে খুঁজেছে উজানী বুড়ী। তার কি সেই দিন আছে? সেই গতরও কি আছে? না গতরে সেই সামর্থ্য আছে? এ কি পদ্মা-মেঘনা পারের সেই সমতলের দেশ! এ আন্দামান দ্বীপ। চড়াই-উতরাই, টিলা-জঙ্গল। যতদূর যে দিকে তাকানো যায় শুধু পাহাড়ের ঢেউ। একটু টিলা বাইতেই হাঁপ ধরে যায় উজানী বুড়ীর।

একে বয়স হয়েছে। তার উপর বাতের ব্যথা, শূলের ব্যথা, বায়ুর দোষ। হাজার জাতের রোগ উজানী বুড়ীর জীর্ণ কুঁজো অস্থিসার শরীরে বাসা বেঁধেছে।

এই ক'দিন হারাণকে খুঁজতে বেরিয়ে একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসেছে উজানী বুড়ী। তাকে না পেয়ে হতাশায় দুঃখে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে নিজের ওপর, হারাণের ওপর, চোখের সামনে যে পড়েছে তার ওপর ক্ষেপে উঠেছে উজানী বুড়ী। মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদেছে আর বলেছে, 'হারাইণা রে' এই বয়সে বড় দুঃখু দিলি। তর মুখের দিকে তাকাইয়া বুক বানছি (বেঁধেছি)। হেই বুকখান আমার ভাইঙ্গা দিলি রে—'

হারাণের কথা ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল উজানী বুড়ী।

হারাণ যে কোথায় আছে, কাল রাত্রে কুমী সে খবর দিয়ে গেছে। উজানী বুড়ী ঠিক করে ফেলল, যেমন করে পারুক আজ তাকে ধরবেই।

২৭

অনেক, অজস্র মানুষ।

শুধু মানুষ হিসাবেই তাদের পরিচয় না। তাদের মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য ভাগ আছে, ভেদ আছে, সীমারেখা আছে। পেশা বা বৃত্তি অনুযায়ী জাতও নির্দিষ্ট আছে। কেউ জেলে, কেউ জোলা, কেউ মালো, কেউ যুগী, কেউ সোনারু, কেউ বারুজীবী, কেউ বা ভূমিজীবী।

দেশভাগ সব ভাগ, সব ভেদ, সব সীমারেখা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। এদের তখন একটা মাত্র পরিচয়। কেউ আর জেলে যুগী কি সোনারু না। এমন কি মানুষও না। তখন তারা উদ্বাস্তু, সরকারি ভাষ্যে রিফুজি।

এতদিন তাদের জাত ছিল না। রিফুজি ক্যাম্পে, স্টেশনের প্ল্যাটফরমে কি খোলা আকাশের নিচে মানুষগুলো এক, অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আবার তারা মাটি পেয়েছে। ঘর পেয়েছে। সংসার পেয়েছে। পায়ের নিচে মাটি পেয়ে, মাথার উপর ছাউনি পেয়ে, সংসার পেয়ে আবার তারা সমাজ গড়ে তুলেছে। মাটি আর ঘর, সমাজ আর সংসারই শুধু না, দেশভাগের পর যে জাত তারা হারিয়ে ফেলেছিল, যে ভাগ যে ভেদ এবং যে সীমারেখাগুলো ভেঙে গিয়েছিল—সে সব আবার ফিরে এসেছে।

উত্তর আন্দামানের এই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ দ্বীপে মানুষ এসেছে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জাত এসেছে। জাতের সঙ্গে তার বিচারও এসেছে।

হাজার হাজার বছর ধরে পদ্মা-মেঘনাপারে মানুষ যে জীবন গড়ে তুলেছিল, পুরোপুরি হুবহু তা এই দ্বীপে এসে গেল।

আজ বেরুতে একটু দেরি করে ফেলেছে নিত্য ঢালী।

লা তে তাকে সিপি তোলার কায়দা কানুন শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। ইদানীং উপসাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে সিপি তোলে। কোনটা কোন জাতের সিপি,

কোনটার নাম টার্বো, কোনটার নাম নটিলাস, কোনটার নাম সান ডায়াল, কোনটা শংগ শেল—সব চিনে ফেলেছে নিত্য ঢালী। লা তে'ই তাকে চিনিয়ে দিয়েছে।

জলের সঙ্গে যুঝে যুঝে সিপি কুড়োতে হয়। সিপি তোলার অভ্যাস না থাক, জলের সঙ্গে যোঝার অভ্যাস আছে নিত্য ঢালীর। সে জল-বাঙলার—সেই পদ্মা-মেঘনাপারের মানুষ।

নতুন কাজে প্রচুর উৎসাহ পাচ্ছে নিত্য। ভোর হতে না হতে এরিয়াল উপসাগরে চলে যায়। সারা দিন সিপি তুলে সেটেলমেণ্টে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়।

এ কাজে ভয় যে নেই তা নয়। হাঙর-কামট এবং বিষাক্ত মাছেরা আছে। অক্টোপাস আছে। যে কোন মুহূর্তে চোরা ঘূর্ণির ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তবু উৎসাহ পাচ্ছে নিত্য ঢালী। তার প্রথম কারণ, কিছুক্ষণের জন্য হলেও কাপাসীর কথা, জীবনের হাজারটা চিন্তার কথা সে ভুলে থাকতে পারে। আরো একটা কারণ আছে। রোজ কাজের শেষে তিন টাকা হিসেবে মজুরী দেয় পানিকর।

কাজের কথা পালসাহাবকে বলেছে নিত্য ঢালী। সে যে একটা কিছু নিয়ে আছে, হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে দু পয়সা রোজগার করছে, এতেই পাল-সাহাব খুব খুশি।

তার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে পালসাহাব বলেছিল, 'সাবাস, শালে নিত্য। এই তো আমি চাই।'

আজ অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। ফলে জঙ্গলের মাথায় আর কুয়াশা নেই। পুব দিকের আকাশ থেকে ঝকঝকে রোদের ঢল এসে পড়েছে। বনভূমি ফাঁকা করে সাগরপাখিরা সমুদ্রে চলে গেছে।

চড়াই-উতরাই বেয়ে, জঙ্গল ফুঁড়ে অন্তত মাইল ছয়েক যেতে পারলে এরিয়াল উপসাগর। সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দুপুর হয়ে যাবে।

রোদের চেহারা দেখে অস্থির হয়ে পড়ে নিত্য ঢালী। ঘর থেকে বাইরে পা দিয়েই চমকে উঠল সে। হারাণের ঠাকুমা উজানী বুড়ি টিলা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। ঘরটার সামনে এসে খুব একচোট হাঁপায় সে। বড় বড় শ্বাস টানতে থাকে।

পাটের ফেঁসোর মত রুক্ষ, আঠা-আঠা চুল উড়ছে বুড়ীর। ঘোলাটে চোখ দুটো জ্বলছে। বুক থেকে কাপড় খসে পড়েছে। দেখেই বোঝা যায়, উজানী বুড়ী ভয়ানক উত্তেজিত।

বুড়ী বলল, 'এই যে ঢালীর পুত—'

'কী কও মাসি ?'

নিত্য ঢালী উজানী বুড়ীকে মাসি ডাকে। ডাকেরই মাসি সে। এমনি কোন সুবাদ নেই। দু জনের জাত গোত্র ভিন্ন। এক জায়গায় থাকতে হলে

যেটুকু সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে হয় তার চেয়ে বেশি কিছু না।

উজানী বুড়ী ক্ষেপে উঠল, 'মাসি! আমি তর কুন জম্মের মাসি রে শয়তানের ছাও!'

মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিত্য ঢালী বলে, 'সকালে উইঠা কি কাইজার (ঝগড়ার) মন নিয়া আইছ মাসি?'

'হ রে ঢালীর ছাও। যদি এক বাপের পুত হইস তা হইলে সত্য ক'বি (বলবি)।'

মেজাজ কতক্ষণ আর ঠিক রাখা যায়! নিত্য ঢালীও তেতে উঠল, 'দেখ বুড়ী, আর যাই কর বাপ তুইলো না। ভালো হইব না কইলাম।'

'বাপ তুলুম, জাত তুলুম, তর চৌদ্দ গুষ্ঠি তুলুম। কী করবি? আমার মাথা কাটবি?'

'চুপ মার বুড়ী—' নিত্য ঢালী রুখে উঠল, 'না হইলে তরই একদিন কি আমারই একদিন। সক্কালবেলা ভগমানের নাম করব, না মাগী আইছে আমার লগে কাইজা মারতে। যা যা, চোখের সুমুখ থিকা যা—'

'যামু যামু—' হঠাৎ ডুকরে উঠল উজানী বুড়ী, 'যামু, সত্যই যামু। হারাইণারে বাইর কইরা দে। তারে নিয়া আমি অহনই চইলা যামু।'

'হারাণ!' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নিত্য ঢালী।

'হ-হ, হারাণ—আমার নাতি। সাত দিন হে ঘরে ফিরে না। সাত দিন তারে দেখি না। দে নিত্যা, তারে বাইর কইরা দে।'

'কী কও তুমি মাসি! হারাণ তো এইখানে আহে নাই।'

'মিছা কইস না নিত্য। এই দ্বীপের হগলে জানে, হারাণ তর ঘরে আছে। হগলে জানে।' নিত্য ঢালীর একটা হাত ধরল উজানী বুড়ী। তার বুকে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল, 'তর ভালো হইব নিত্য, হারাণরে তুই ফিরাইয়া দে। ভগমান তর ভাল করব।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হইয়া গেল মাসি! কে তোমারে লাগাইছে, তুমিই জান। ভগমানের কিরা (দিব্য) কাইটা কই, হারাণরে আমি এক মাসের মইধ্যে দেখি নাই।' একটু থেমে নিত্য ঢালী বলল, 'আমি কামে যামু, এইবার তুমি ঘরে যাও মাসি।'

নিত্য ঢালীর হাতটা ধরে ছিল উজানী বুড়ী। হঠাৎ সেটা ছেড়ে সে ফুঁসে উঠল, 'ঢালীর পুত তর মনে কি আছে, আমি জানি। কিন্তুক তুই যা ভাবছস, তা হইব না।'

নিত্য ঢালী অবাক হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'আমি মরি আমার জ্বালায়। তুমি আমার পোড়ানি বাড়াও। খোলসা কইরা কও দেখি, তোমার মনে কি আছে!'

'আমার মনে যা আছে, কমু। কিন্তুক তুই যদি সত্য না ক'স তো তর

মাইয়ার মাথা খাব।'

শান্ত গলায় নিত্য ঢালী বলল, 'থামু। এইবারে কও।'

'তর মাইয়ার লগে হারাণের বিয়া দিতে চাস না?'

'কী কও তুমি!'

'আমি একা কমু ক্যান? পিথথিমীর হগলে কয়। তর মতলব জানতে কারো বাকি নাই।'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে নিত্য ঢালী। তারপর বলে, 'যদি হারাণের লগে কাপাসীর বিয়া দেই, ক্ষোতিটা কি হয়!'

'হা ভগমান, তুমি অহনও আছ! অহনও আকাশে চন্দর সুরুয ওঠে! ভগমান পোড়া কপাইলার মাথায় ঠাট (বাজ) ফালাও।'

কেঁদে ককিয়ে চেঁচিয়ে অস্থির হয়ে উঠল উজানী বুড়ী, 'নিত্যা, তুই কি ভুইল্যা গেলি তরা ঢালীর জাত। আর আমরা কাপালী। যে সে কাপালী না, শিউলি কাপালী। পাগলচান আমাগো গুরু। ভিন জাতের লগে কি আমাগো বিয়া হয়, না হইতে পারে। হে ছাড়া—'

উজানী বুড়ীর কথা শেষ হবার আগেই ঘরের ভিতর থেকে সেই তীব্র অবুঝ হাঁসির শব্দটা ভেসে আসতে লাগল। কাপাসী হাসছে।

উজানী বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল, 'একে ভিন জাত, তার উপুর ঐ পাগল লণ্ট মাইয়া—'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নিত্য ঢালী, 'বাইর হ, অহনই বাইর হ। না হইলে তরে খুন করুম।'

নিত্য চেঁচায় আর হাঁপায়। হাঁপায় আর বলে, 'বাপ তুললি, কিছু কইলাম না। গুষ্টি তুললি, চৈদ্দ পুরুষ তুললি, তবু মুখখান বুইজা রইলাম। জাত গোত ধোয়ালি, হেয়াও সইলাম। কিন্তুক আর না। মাইয়ার নামে এট্টা মোন্দ কথা কইলে তর দাত আমি ছুটাইয়া দিমু। যা যা, বাইর হ মাগী—'

নিত্য ঢালীর মারমুখী চেহারা দেখে এক পা এক পা করে পিছু হটে উজানী বুড়ী। একটা কথাও আর বলে না।

মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে।

উজানী বুড়ী চলে যাবার পর উঠোনের এক কোণে মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে নিত্য ঢালী। বেলার মনে বেলা বাড়ে। রোদের তাপ চড়তে থাকে। নোনাজলের মাঝখানে এই মিঠে মাটির দ্বীপ তেতে ওঠে।

চুপচাপ বসেই থাকে নিত্য ঢালী। আজ আর তার এরিয়াল উপসাগরে যাওয়া হয় না।

২৮

ড়ী বাসিনীর হারটা বেচে এগার শ টাকা পেয়েছিল পালসাহাব। সেই টাকা য়ে প্রথম কিস্তির দাম মিটিয়ে মিড্‌ল আন্দামানের রিফুজী সেটেলমেণ্ট থেকে ান্দটা বলদ নিয়ে এসেছে সে।

চোন্দ বদলে সাতটা হাল নেমেছে। এখন দিন রাত চাষ চলছে।

সাতটা মাত্র হাল। সাতটা হালে কি আর এত জনের জমি চষা যায়! াই পালসাহাবের ব্যবস্থা অনুযায়ী দিনে এবং রাতে মাটি চষার কাজ চলছে।

দিনের আলোতে হাল চালাবার অসুবিধা নেই। রাত্রিতেও মশাল জ্বালিয়ে াজ চলেছে।

লাঙলের ফলায় ফলায় মাটি উথল পাথল হয়ে যাচ্ছে; পরল পরল উপড়ে াসছে।

পালসাহাব ঠিক করে ফেলেছে নতুন বর্ষা নামার আগেই এই দ্বীপকে সে ুরোপুরি চৌরস করে ফেলবে।

সেটেলমেণ্টের একটি মানুষেরও জিরান নেই, বিশ্রাম নেই। খাওয়ার ময়টুকু ছাড়া তারা জমিতেই কাটাচ্ছে।

পালসাহাব আজকাল নিজের ঝুপড়িতেই ফেরে না। দু বেলা মা-তিন তার ন্য ভাত নিয়ে আসে জমিতে।

এর মধ্যেই ঘুরতে ঘুরতে একদিন খিলাফৎ খান রিফুজী সেটেলমেণ্টে এল। জঙ্গল সাফ হয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। টিলায় টিলায় বেত'পাতার চাল থায় নিয়ে ঘর উঠেছে। দ্বীপের কি হাল ছিল, আর এই নতুন মানুষগুলো াস কি হালই না করেছে!

সরাসরি চাষের জমিতে এসেই উঠল খিলাফৎ। হাতের সামনে পালসাহাবকে ায়ে চিৎকার করে উঠল, 'এ শালে পালসাহাব—'

'আরে আও আও খিলাফৎ দোস্ত—' লম্বা রোমশ একটা হাত বাড়িয়ে লাফৎকে টেনে নিল পালসাহাব। বলল, 'তার পর কী মনে করে ইয়ার?'

'নিজের আঁখে সব কুছ সচমুচ দেখতে এলাম।'

লাল লাল নোংরা দু পাটি দাঁত মেলে খুব একচোট হাসল পালসাহাব। ল, 'ক্যায়সা দেখলে?'

'বহুত খারাপ।' বলে একটু থামল খিলাফৎ খান। পরক্ষণে আবার শুরু ল, 'এই জংগল বহুত বদনসীব।'

'কেন ?'

'আরে হারামী, তা না হলে কি তোর হাতে পড়ত! এত রোজ জংগ
কাম করলি, তবু জংগলকে ভালোবাসতে শিখলি না। জংগলের সাথ উলফা
মহব্বতি, কিছুই হল না। জংগলের এ কী হাল করেছিস, পালসাহাব
খিলাফৎ পাঠানের গলায় দুঃখ আক্ষেপ এবং বেদনা-মেশা অদ্ভুত স্বর ফোটে।

'কী হাল করেছি ?'

'জংগলের জান তুড়েছিস। কেটে কুটে তাকে লবেজান করে ফেলেছিস।'

'ভালোই তো হয়েছে।' পালসাহাব হাসল। বলল, 'এখানে গাঁও বস
ক্ষেতিবাড়ি হচ্ছে, খামার হচ্ছে, কুঠিবাড়ি উঠছে। মানুষ এসেছে।'

'আ রে থাম থাম। মানুষ পুরা দুশমন, পুরা হারামী। না, তো
আমাকে এখানে আর টিকতে দিবি না। উত্তরে, সেই ল্যাণ্ডফল জাজিরাতে চ
যাব। জরুর যাব। সেখানে এখনও বিলকুল জংগল আর জংগল। মান
কোন দিন সেখানে যেতে পারবে না।'

এর পর থেকে প্রায়ই আসতে লাগল খিলাফৎ খান। পালসাহাবের সং
গল্প করে সে। নতুন বাসিন্দাদের অনেকের সংেই তার আলাপ হয়েছে
তাদের সংগেও গল্প করে। গল্প আর কি, শুধু জংগলের কথা। উত্তর দক্ষি
এবং মধ্য আন্দামান, হ্যাভলক দ্বীপ, সেণ্টিনেল দ্বীপ—আন্দামানের দ্বীপমা
জুড়ে যে অরণ্য মাথা তুলে আছে, তার কথা বলে।

প্যাডক পাপিতা চুগলুম দিদু—এক একরকম গাছের নাকি এক একরব
মেজাজ। জংগলে ঢুকলে গাছেরা নাকি তার সংগে কথা বলে। জংগলের সং
তার অনেক দিনের বন্ধুত্ব। এই জংগল তাকে মানুষের দুশমনি বেইমানির হা
থেকে বাঁচিয়েছে, তাকে শান্তি দিয়েছে, স্বস্তি দিয়েছে। এমন একটা স
এসেছিল যখন বার বার দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে মরতে চেয়েছে খিলাফৎ! বার বা
গলায় রশি দিতে চেয়েছে। কিন্তু আন্দামানের জংগল তাকে আশ্রয় দি
বাঁচিয়েছে।

এমনি সব আজব আজব কথা বলে খিলাফৎ খান।

খিলাফৎ খান ফরেস্ট গার্ড। কত কাল যে আন্দামানের জংগলে জংগ
ঘুরে বেড়াচ্ছে, সঠিক হিসাব কি সে নিজেই জানে। জংগলে জংগলে ঘো
নানা জাতের গাছ দ্যাখে আর নিজের দিকে তাকায় খিলাফৎ খান। গায়ে
খসখসে কোঁচকানো চামড়া যেন গাছের ছাল, লোমগুলি যেন গাছের শ্যাওল
হাত-পা যেন ডালপালা, মাথার চুল যেন গাছের রাশি রাশি পাতা, গায়ে সোঁ
সোঁদা বনজ গন্ধ। খিলাফৎ খান যেন নিজেই একটা গাছ। জংগলে ঘু
ঘুরে সে এক প্রাচীন বৃক্ষ হয়ে গেছে।

খিলাফতের যা মনের গঠন তাতে নিজের সংগে গাছের উপমা দেবার ম

ক্ষমতা নেই। কিন্তু অনেক কাল জংগলে কাটিয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক য়মেই এই উপমাটা তার মনে এসেছে। জংগল তাকে বাঁচিয়েছে। খিলাফতের বনে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

মানুষের ওপর বিশ্বাস প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি হারিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই পে কয়েদ খাটতে এসেছিল খিলাফৎ।

পালসাহাব যে সময় আন্দামান আসে, তারও দশ পনের বছর আগে খিলাফৎ ন এখানে এসেছিল। সে সময় সেলুলার জেল তৈরীর কাজ চলছে। ভাইপার পের কয়েদখানায় দু মাস বিশ দিন কয়েদ খেটে জংগলে কুলী খাটতে যায়। তার পর পঞ্চাশ না ষাট বছর পার হল, অত হিসেব খিলাফৎ রাখে না।

অনেক হিসেবই গোলমাল হয়ে গেছে। স্মৃতি থেকে অনেক কথা অনেক টনা হারিয়ে গেছে তার। কত কিছু যে ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু আজও বিকল সেই ঘটনাটার কথা মনে করতে পারে খিলাফৎ।

চাচাতো ভাই হায়দার যেদিন তাকে মিথ্যে খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে সমস্ত জীবনের সাজা খাটাতে আন্দামান পাঠাল সেদিন বিস্ময়ে দুঃখে যন্ত্রণায় বোবা য়ে গিয়েছিল খিলাফৎ। আল্লাহ্‌র কাছে, দিনদুনিয়ার মালেকের কাছে সে ধু কেঁদেছিল, 'খুদা, তুমি তো জান আমি সাচ্চা মানুষ! বিলকুল বেকসুর, বগুনাহ—'

তখনও মানুষের ওপর কিছু কিছু বিশ্বাস ছিল খিলাফতের। আশা ছিল, াজার মেয়াদ ফুরোলে সে দেশে ফিরবে। দেশে তার শাদি করা বিবি আছে। বিবির কাছে ফিরে যাবে সে। চোদ্দ বছর পর বিবিকে ফিরে পাবে—এই বিশ্বাসের জোরে মুখ বুজে দ্বীপান্তরী সাজা খেটে গেছে খিলাফৎ। কিন্তু সব বিশ্বাস একদিন হারিয়ে ফেলল সে, মানুষকে অবিশ্বাস করতে ঘৃণা করতে শিখল।

দক্ষিণ আন্দামানের গারাচারামাতে তখন জংগল 'ফেলিং' অর্থাৎ বনকাটা চলছে।

দেশ থেকে হঠাৎ চিঠি এল, তার বিবি সেই চাচাতো ভাইয়ের ঘর করছে। বরটা পেয়ে উন্মাদের মত হয়ে উঠল খিলাফৎ খান। বার তিনেক সমুদ্রে লাফ ল। তিন বারই ফরেস্টের কুলীরা তাকে তুলে আনল। বার দুই গলায় দড়ি বার সব বন্দোবস্ত করে ফেলল। দু বারই ফরেস্টের জবাবদাররা তাকে বাঁচাল।

এত সব ঘটনার পর থেকে তাকে পাহারা দিয়ে রাখা হ'ত। মরে যে খিলাফৎ চবে, তার কোন উপায়ই রইল না।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

ঋতুর চাকায় মাস বছর সময় পাক খেয়ে ফিরতে থাকে। জংগলে জংগলেই র দিন কেটে যায়। জংগলের ঠাণ্ডা হিম-হিম ছায়া একটু একটু করে খিলাফতের সব জ্বালা সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিতে লাগল।

মানুষের সংগ ছেড়ে জংগলের আরো গভীরে নেমে গেল সে। অরণ্য তাকে আশ্রয় দিল, গভীর অন্তহীন স্নেহে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

মানুষের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গিয়ে জংগলের গভীর নিবিড় স্বাদ একটু একটু যেন বুঝতে পারল খিলাফৎ।

তার মনের একদিকে মানুষের প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃণা, আর এক দিকে জংগলের জন্য অপার মমতা ; অশেষ অফুরন্ত ভালোবাসা।

জংগলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন খিলাফৎ দেখতে পেল, তার গায়ের চামড়া গাছের ছালের মত খসখসে, মাথাটা গাছের ঝুপসি পাতার মত, হাত-পা ডালপালার মত। খিলাফৎ দেখল, পঞ্চাশ ষাট বছর আন্দামানের জংগলে কাটিয়ে পাপিতা চুগলুম কি দিদু গাছের মত সে-ও একটা গাছ হয়ে গেছে।

আজকাল প্রায় রোজই ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে আসে খিলাফৎ। এখানে পা দিয়েই বলে, 'এই ডিগলিপুরে আর থাকব না। উত্তরে, বিলকুল উত্তরে ল্যাণ্ডফল জাজিরাতে, যেখানে সিরফ জঙ্গল আর জঙ্গল সেইখানেই চলে যাব। কোন আদমীকে সেখানে আর যেতে হবে না।'

নতুন বাসিন্দাদের কেউ কিছু বলে না। অবাক হয়ে আন্দামানের এই আজব মানুষটার কথা শোনে। কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না।

একদিন দুপুরের দিকে ধুঁকতে ধুঁকতে এল খিলাফৎ।

অনেক বয়স হয়েছে। মেরুদাঁড়াটা এমনিতে দুটো খাঁজ খেয়ে বাঁকানো। চোখদুটো টকটকে লাল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। একটু চলে, আবার থামে। হাঁপায়, কাশে। তারপর দম নিয়ে টলতে টলতে এগোয়।

খিলাফৎকে দেখে এই কথাটাই মনে হয়, একটা জীর্ণ বয়স্ক প্রাচীন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে পৌঁছেছে।

পালসাহাব তাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল।

জমিতে লাঙল চলছিল। লাঙল ফেলে সবাই পালসাহাবের পিছু পিছু ছুটল।

টলতে টলতে টক্কর খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল খিলাফৎ। দুহাত বাড়িয়ে তাকে জাপটে ধরল পালসাহাব। আর ধরেই চমকে উঠল। খিলাফতের গা অসম্ভব গরম। প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে।

পালসাহাব বলল, 'একি, মালুম হচ্ছে তোমার বুখার!'

'হ্যাঁ।' বলতে বলতে ঘাড়টা ভেঙে পড়ে খিলাফতের। পালসাহাব কাঁধে মাথা রেখে নির্জীব গলায় বলে, 'বুখারই মালুম হচ্ছে।'

'বুখার নিয়ে তোমার আসা ঠিক হয় নি খান সাহাব। চল, শোবে চল। থোড়া আরাম করে 'বীটে' ফিরবে।'

ঘোর ঘোর, রক্তাভ চোখ দুটো একবার মেলল খিলাফৎ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল। কিছু বলল না সে।

আস্তে আস্তে খিলাফৎকে হাঁটিয়ে সামনের একটা টিলার দিকে এগুতে লাগল পালসাহাব। মানুষগুলো পিছু পিছু আসছিল। এক ধমক মেরে তাদের আবার জমিতে পাঠিয়ে দিল, 'শালে কুত্তার পাল, আপনা কামে যা—'

খিলাফতের বুক থেকে ঘড়ঘড়ে হাঁপানির মত একটা শব্দ আসছে। পাল-সাহাব বলল, 'তখলিফ হচ্ছে?'

'হাঁ। বুকটা ফেটে চুর চুর হয়ে যাবে রে পালসাহাব। আর হাঁটতে পারছি না! বড় তখলিফ হচ্ছে।' গলার ভেতর থেকে গোঙানির মত একটা আওয়াজ বেরুতে লাগল খিলাফতের।

পালসাহাব খুব নরম সুরে বলল, 'আর একটু খান সাহেব, থোড়া দূর। এই এসে গেল—'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে?'

এক মহূর্তে কি যেন ভাবল পালসাহাব। তার চোখ দুটো হঠাৎ খুশিতে চিক চিক করে উঠল। গাঢ় গলায় বলল, 'যেখানে নিয়ে গেলে মানুষের ওপর বিশোয়াস ফিরে পাবে, দিলের তাপ পাবে, যো কুছ হারিয়ে ফেলেছে তার সব ফিরে পাবে, সেইখানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি খান সাহাব।'

খিলাফৎ জবাব দিল না।

২৯

সেটেলমেণ্টের শেষ মাথায় রামকেশবের ঘর। রামকেশব ফরিদপুর জেলার মানুষ।

সাত পুরুষের ভিটেমাটি হারাবার শোক রামকেশবের প্রাণে কতটুকু বেজেছে, তাকে দেখে বুঝবার জো নেই।

কথা রামকেশব খুব কমই বলে। সাতটা প্রশ্ন করলে একটা জবাব মেলে কি মেলে না। বড় চাপা মানুষ সে। একেবারে পাথরের মত ঠাণ্ডা, নির্জীব।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে চলে যেন রামকেশব। কারো সঙ্গে কথা বলে না। দিনরাত কি এক চিন্তায় যেন জর্জর হয়ে আছে।

রামকেশবের সংসারে সে ছাড়া আর মাত্র একটি মানুষ। সে হল তার বউ ক্ষিরি। আরো দুজন ছিল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। তারা নেই।

রামকেশব যেমন চাপা স্বভাবের মানুষ, তার বউ ক্ষিরি ঠিক উল্টো। দিন

রাত সে কথা বলে। লোক না পেলে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই বকে যায়। ডিগলিপুরের বাসিন্দারা বলে, ক্ষিরির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মাথা খারাপ হওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। না হওয়াটাই ছিল বিস্ময়ের।

দেশভাগের দুঃখ তবু সইত। কিন্তু ছেলেমেয়ে হারানোর দুঃখ সইল না। রামকেশব আর ক্ষিরি—একজন দুঃখে পাথর, আর একজন মুখর।

দেশ দু'টুকরো হওয়ার পর আর দশজনের মত রামকেশবরাও কলকাতায় এসেছিল। সঙ্গে ছিল ছেলে আর মেয়ে। পরী আর সুবল। পরী বড়, বছর ষোল বয়স। সুবল ছোট, বয়স দশ।

শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে সে সব দিনে লঙ্গরখানার সদাব্রত বসেছিল। মাথা পিছু এক ডাব্বা কালচে খিচুড়ি, আর এক খাবলা ঘ্যাঁট।

লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে আমাশা ধরল সুবলের। আমাশা থেকে রক্ত আমাশা। তাতেই একদিন ছেলেটা মরল। বাকি রইল মেয়েটা।

পরী তখন যুবতী হয়েছে। লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়েও অঢেল স্বাস্থ্যে সে শুধু যুবতীই না, রূপসীও হয়ে উঠেছে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বাপ-মায়ের বুক কাঁপে। তারা কাঁদে আর বলে, 'হা ভগমান, একটারে নিছ, আর একটারে রাখ। বাপ-মায়ের বুক খালি কইরা দিও না।'

ঠিক খুপরি না, খোপও না। শিয়ালদা স্টেশনের পাশে যে ফালতু জমি আর ফুটপাথ পড়ে রয়েছে তারই এক টুকরো দখল করে পেটা টিন পিচবোর্ড চট দিয়ে ঘিরে নিয়েছিল রামকেশব। শুধু রামকেশব কেন, আরো অনেকেই।

হাত ছয়েক মাত্র উঁচু ছাউনি। সামনের দিকে সুড়ঙ্গ। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বর্ষা, লজ্জা-সরম—সব কিছুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ঐ ছাউনিটাই একমাত্র ভরসা। জন্ম-মৃত্যুও ঐ একই ছাউনিতে।

রামকেশব স্টেশনে ভিক্ষে করত। ভিক্ষে করতে করতে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ব্যবসাটির কায়দা কানুন শিখে নিয়েছিল। সংসার মেয়ে-বউ কারো দিকে তার নজর ছিল না। ভিক্ষে করবে, না সংসারের দিকে নজর রাখবে।

ক্ষিরি মেয়েকে নিয়ে ছাউনিতে থাকত। সামনের দিকে ফুটপাথ। সেখানে তিন টুকরো ইট সাজিয়ে টিনের কৌটোতে জাউ রাঁধত। পচা ঘেয়ো আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধত। আর লক্ষ্য করত, সামনের ল্যাম্প পোস্টের গায়ে ঠেসান দিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে।

লোকটার পোকায়-খাওয়া দাঁত, ধূর্ত ধারাল চোখ, ওল্টানো চুল। পরনে পা-জামা আর বুকখোলা জামা।

চোখাচোখি হলেই লোকটা দাঁত বার করে হাসত। খুক খুক করে কাশত।

লোকটার দিক থেকে চোখ ফেরালেই ক্ষিরি দেখতে পেত, পরী একদৃষ্টে সেই লোকটার দিকেই চেয়ে আছে।

মেয়েকে ঠেলে গুঁতিয়ে ছাউনিটার ভেতর ঢোকাতে ঢোকাতে ক্ষিরি চেঁচাত, 'মর মর, তুই মর। আমার হাড্ডি জুড়াউক।'

রোজ সকালে এসে দাঁড়াত লোকটা। সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকত। অনেক রাত্রে রামকেশব ফিরে এলে তাকে আর দেখা যেত না।

মেয়েকে দুহাতে আগলে আগলে রাখত ক্ষিরি। তবু তাকে বাঁচাতে পারল কই!

ক'দিন পর ব্যাপারটা তার চোখে পড়ে গেল।

সন্ধের একটু আগে, কর্পোরেশনের লোকেরা তখনও রাস্তার আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি, একটা চৌকো টিন নিয়ে কল থেকে জল আনতে গিয়েছিল ক্ষিরি। ফিরে এসে দেখে সেই লোকটা পরীর সঙ্গে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে।

ক্ষিরিকে দেখেই লোকটা চট করে সরে গেল।

জলের টিনটা নামিয়ে রেখেই পরীর চুলের মুঠি ধরল ক্ষিরি। বলল, 'সব্বনাশী, ঐ শয়তান তরে কি কয়?'

'ছাড় মা, ছাড়। হগল কমু তোমারে।'

'ছাড়ুম না, কিছুতে না। আগে ক' কী কয় হেই শয়তানে—'

'আমারে শাড়ি দিতে চায়, টাকা দিতে চায়, মিঠাই দিতে চায়।'

'আইজই পেরথম ঐ শয়তানটার লগে কথা ক'লি?' চিলের মত ধারাল হিংস্র চোখে চেয়ে থাকে ক্ষিরি।

'না মা, তুমি যহনই এদিক উদিক যাও, তহনই ও আমার লগে কথা কইতে আহে।'

'আমারে ক'স নাই ক্যান সব্বনাশী? চুলের মুঠি ছেড়ে পাগলের মত পরীর নাকে মুখে কিল চড় বসাতে থাকে ক্ষিরি। মার খেয়ে পরী পড়ে যায়। এবার নিজের চুল ছেঁড়ে ক্ষিরি। দুম দুম করে বুকে কিল মারতে মারতে বলে, 'তুই মর সব্বনাশী। আমিও মরি। আমার কী হইব! হে ভগমান!'

মার খেয়ে পরী পড়ে গিয়েছিল। টেনে হিঁচড়ে তাকে এবার ছাউনিটার ভেতর ঢুকিয়ে দেয় ক্ষিরি।

এত করেও পরীকে বাঁচানো গেল কই? একদিন তাকে পাওয়া গেল না। ল্যাম্প পোস্টের গায়ে ঠেসান দিয়ে যে লোকটা দিনরাত বিড়ি ফোঁকে, সেও উধাও হয়েছে।

সুবল মরল। পরী নিখোঁজ হল। ঠিক নিখোঁজ না, সে-ও আরেক ভাবে মরল। দেশভাগ তাকে মারল।

তারপর থেকেই ক্ষিরি যেন কেমন হয়ে গেছে।

সেটেলমেণ্টের শেষ মাথায় সব চেয়ে উঁচু টিলাটার ওপর রামকেশবের ঘর।

ঘরটার সামনে বসে দিনরাত উকুন বাছে ক্ষিরি। কালো কালো লিকগুলি নখের মাথায় রেখে টিপে টিপে মারে। পট্‌ পট্‌ শব্দ হয়।

উকুন মারে আর বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। কাঁদে আর বলে, 'আমার সুবল রে, আমার পরী রে, তরা কই! তরা নাই, আমার কোল-বুক খালি হইয়া গেছে। তরা আয়, ফিরা আয়। আয় রে বাপ, আয় রে মা। আমার লক্ষ্মী সুনা, আমার মণি মাণিক্য। আয়, তরা না আইলে আমার পুরী যে আন্ধার।'

শুধু বিনিয়ে বিনিয়েই কাঁদে না ক্ষিরি, অভিসম্পাত দেয়। চোখের সামনে যাকে পায় তাকেই শাপাশাপি করে, 'পুতের মাথা খা। মাইয়ার মাথা খা। আমার লাখান পুতখাকী মাইয়াখাকী হইয়া নিঃবংশ হ। তরা পুত নিয়া মাইয়া নিয়া সুখে ঘর করস। অত সুখ সইব না। পুতের সুখ মাইয়ার সুখ আমার ভোগে লাগল না। মনে করস, তোগো ভোগে লাগব? কিছুতেই না। আমার বুক আমার ঘর খা খা করে। তোগো বুকও খা খা করব। শ্মশান হইয়া যাইব।'

ছেলেমেয়ে নিয়ে কাউকে সংসার করতে দেখলে ক্ষেপে ওঠে ক্ষিরি। বলে, 'সইব না, সইব না। অত সুখ ভোগে লাগব না। আমারও লাগে নাই, তোগোও লাগব না।'

ছেলেমেয়ের সুখ ঘুচেছে ক্ষিরির। অন্য কাউকে সেই সুখে বিভোর দেখলে বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে তার।

সুবল আর পরীকে হারিয়ে স্নেহ প্রীতি মমতা—জীবনের সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলেছে ক্ষিরি। পৃথিবীর কোন মানুষের জন্যই তার মনে এতটুকু কোমলতা নেই।

এখন দুপুর।

আজও উকুন বাছছিল ক্ষিরি। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল।

খিলাফৎকে নিয়ে পালসাহাব এসে পড়ল। ডাকল, 'এ চাচী—' ক্ষিরিকে চাচী ডাকে সে।

একবার মুখ তুলেই আবার উকুন বাছতে লাগল ক্ষিরি।

পালসাহাব বলল, 'এই দ্যাখ্‌ চাচী, কাকে এনেছি—'

'কারে আনছস পালসাহাব?'

'বল্‌ তো কাকে এনেছি?'

কারো দিকে না তাকিয়েই ক্ষিরি বলল, 'তুইই ক।'

একটু কি যেন ভাবল পালসাহাব। তারপর বললে, 'তোর লেড়কাকে নিয়ে এসেছি চাচী।'

'সত্য ?' সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ পালসাহাবের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষিরি। আবার বলল, 'সত্য ক'স ?'

'হাঁ হাঁ সচ্, জরুর সচ্—'

উকুন বাছতে বাছতেই উঠে এল ক্ষিরি। খিলাফতের থুতনি ধরে নেড়ে নেড়ে মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এ তো বুড়া মানুষ। এ আমার সুবল হইব কেমনে ? তুই যে কি ক'স পালসাহাব। তর মাথা খারাপ।'

এতক্ষণ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল ক্ষিরি। এবার তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দে হেসে উঠল।

গাঢ় গলায় পালসাহাব বলল, 'বুড্ঢা হোক আর বাচ্চা হোক, এ-ই তোর ছেলে। খুব বুখার হয়েছে। চল্, একে ঘরে নিয়ে যাই।'

'ব্যারাম হইছে ?'

'হাঁ।'

'তুই যহন ক'স আমার পুত তহন ঘরেই নিয়া চল্।' বলেই বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল ক্ষিরি, 'ও আমার সুবলারে, মায়ের বুক খালি কইরা দিয়া তুই কই গেলি।' কাঁদতে কাঁদতে পালসাহাব আর খিলাফৎ খানকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

মাচানের উপর ছেঁড়া চট আর ছেঁড়া কাঁথার উঁচু বিছানা। তার উপর খিলাফৎকে শুইয়ে দিল পালসাহাব।

জ্বরে মুখটা টস টস করছে। চামড়ায় অসহ্য তাপ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। ঘড়ঘড়ে হাঁপানির টানের মত শব্দ হচ্ছে। টেনে টেনে গাঢ় মন্থর শ্বাস নিচ্ছে খিলাফৎ। বুকটা তোলপাড় হচ্ছে। গলার কাছটা ধুক ধুক করছে। মাঝে মাঝে অস্ফুট গলায় কি যেন বলছে খিলাফৎ, ঠিক বোঝা যায় না।

পালসাহাব ডাকল, 'কাছে আয় চাচী—'

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ খিলাফতের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষিরি। চোখ কুঁচকে কি যেন ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বিছানাটার পাশে এসে বসল।

খিলাফতের মুখের উপর ঝুঁকে কি যেন খুঁজছে ক্ষিরি। হঠাৎ কি যেন সে পেয়ে গেল।

ক্ষিরির মুখটা এখন চকচক করছে।

৩০

রাত্রি যেন কালো সমুদ্র। সেই সমুদ্রের ওপর সাদা ফেনার মত কুয়াশা ভাসছে।

কুয়াশার স্তরগুলি ভেদ করে আকাশ পর্যন্ত দৃষ্টি পেঁছিয় না। সেখানে হয়ত চাঁদ আছে, হয়ত নেই।

মায়া বন্দরের জাহাজ ঘাটায় এখন তিনটি মূর্তি বসে আছে। প্রোপ্রাইটর পানিকর, ডাইভার লা তে, এবং একজন নতুন মানুষ। কাল পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এখানে এসেছে। নাম আধারকর। আধারকর পানিকরের অনেক কালের পুরনো বন্ধু।

এখন কত রাত কে বলবে!

জাহাজ ঘাটার একাধারে করাত-কল। সেখানে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। দূরে টিলার মাথায় সারি সারি কাঠের বাড়ি, প্যাডক আর নারকেল গাছ—সব কিছু গাঢ় কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

মায়া বন্দরের এই দ্বীপের এখন কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। কুয়াশা আর অন্ধকার তাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। সমুদ্রের অশান্ত গর্জন আর মৌসুমী বাতাসের একটানা মাতামাতি ছাড়া এখানে আর কোন শব্দ নেই।

আধারকর বলল, 'আমার কথাটা ভেবে দেখেছ?'

'হাঁ।' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল পানিকর। ফিস ফিস করে বলল, 'তোমার মতলবটা বহুত আচ্ছা।'

একটু চুপচাপ। তারপর আধারকর আবার শুরু করল, 'বুঝলে দোস্ত, সিপির ব্যবসাতে আর সেই সুখ নেই। দরিয়া শালে মক্ষীচুষ (কৃপণ হয়ে) গেছে।'

আধারকরও সিপির কারবারী। বছর দশেক আন্দামানের দরিয়া থেকে সিপি কুড়িয়ে বিদেশের বাজারে চালান দিচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র বড় কৃপণ হয়ে যাচ্ছে। আগে আগে যত সিপি মিলত ইদানীং আর তত পাওয়া যায় না। ডাইভারদের মজুরী, মোটর বোটের তেলের দাম, খাই খরচ—হাজারটা ঝামেলা মিটিয়ে পোষাতে আর চায় না।

সিপির ব্যবসাতে আগে লাভ ছিল। কিন্তু আজকাল আর সে সুখ নেই। আগের সেই মধুও নেই। অথচ আধারকর ভাগ্য ফেরাতে চায়।

ভাগ্য ফেরাতে হলে দরিয়ার মর্জির ওপর ভরসা করে থাকলে চলে না। সিপির পেছনে অনিশ্চিতভাবে কতদিন আর ছোটা যায়।

আধারকরের মাথায় তাই অন্য একটা ফিকির এসেছে। পানিকর তার অনেক

কালের বন্ধু। তাকে নিয়েই নতুন কাজে নামতে চায় সে। আজ ক'মাস ধরে পানিকরকে সমানে ফুসলোচ্ছে।

আধারকর বলল, 'বাঁচতে তো হবে। হাড্ডি চুর চুর করে সিপি তুলব। সেই সিপি সাফ করব। তারপর চালান দেব। না না, অত খাটুনি পোষায় না পানিকর।'

'সে তো ঠিক বাত।'

'দেখ ইয়ার, এই দুনিয়াতে লাভের ব্যবসা স্রিফ দুটো আছে। একটা শরাবের—' বলতে বলতে আধারকর ঝুঁকে পড়ল। তারপর পানিকরের কানে মুখটা গুঁজে ফিস ফিস করতে লাগল, 'আর একটা হল আওরতের।'

পানিকর মুখে কিছু বলল না। কিন্তু খুব একচোট মাথা ঝাঁকাল।

আধারকর আবার শুরু করল, 'জান ইয়ার, আমার এক শালা পাঞ্জাবী রিফুজি লেড়কীদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। একেবারে লাল হয়ে গেল।'

অন্ধকারে পানিকরের চোখ দুটো ধক ধক করে।

আধারকর থামে না, তাই ভাবছিলাম, এখানে এমন একটা ব্যবসা ফাঁদলে কেমন হয়? সে কথা তোমাকে আগেও জানিয়েছি।'

কুয়াশা আর অন্ধকারে সমুদ্র রহস্যময় হয়ে আছে।

উঁচু উঁচু ঢেউগুলি পাড়ে এসে আছাড় খায়। জলের রঙ বোঝা যায় না। আকাশ দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায়, কুয়াশা আর অন্ধকারের নিচে বিপুল সমুদ্র উথল-পাথল হচ্ছে।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে লা তে। দিনের সমুদ্রকে তবু কিছু কিছু বুঝতে পারে সে। কিন্তু অফুরন্ত অন্ধকারে নিজেকে জড়িয়ে যে অস্পষ্ট সমুদ্র এখন দুর্জ্ঞেয় রহস্যে মেতে আছে, তাকে কোনদিনই বুঝতে পারে না লা তে।

লা তে'র পাঁজরে কনুই দিয়ে আস্তে একটা গুঁতো মারল পানিকর। ডাকল, 'এ লা তে—'

লা তে চমকে উঠল, 'হাঁ মালেক, কুছু বললেন?'

'আর শালে, দরিয়া দেখলে একেবারেই হুঁশ থাকে না, না!'

লা তে কিছু বলল না। হি হি করে খুব একচোট হাসল।

পানিকর বলল, 'শালে একদম পানির পোকা।'

'হি-হি—' লা তে হাসতেই লাগল। বোঝা গেল, পানির পোকা বলাতে সে খুশিই হয়েছে।

'থামু শালে, আধারকরের কথা শোনু।'

'কাহিয়ে আধারকরজী—'

আধারকর বলতে লাগল, 'শরাবের ব্যবসা তো করা যাবে না। শুনছি

সিরকার আন্দামানে শরাব বিলকুল বন্ধ করে দেবে। তাই ভাবছি, আওরতের ব্যবসাটাই চালু করব।'

লা তে শিউরে উঠল, 'লেকিন—'

'লেকিন ফেকিন কুছ নেহী। আগে আমার বাত শোন্।' বলে কেশে গলাটা সাফ করে নিল আধারকর। আস্তে আস্তে বলল, 'এক এক লেড়কীর জন্যে আমি হাজার রুপেয়া দেব।'

অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলল না।

একসময় পানিকরই প্রথম কথা বলল, 'হা-জা-র রু-পে-য়া'—তার স্বরে কিছুটা বিস্ময় কিছুটা সন্দেহ এবং অনেকখানি লোভ মেশানো।

'হাঁ ইয়ার।'

ওদের কথার মধ্যেই কখন যেন লা তে উঠে চলে গেছে।

মায়া বন্দরের জাহাজ ঘাটায় অন্ধকার আর কুয়াশা মেখে বাকী দুটো মূর্তি বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রয়েছে এখন।

৩১

দিন-মাস-বছর দিয়েই শুধু নয়, সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা-আনন্দ দিয়েও মানুষ তার জীবনকে তার আয়ুকে মেপে মেপে চলে। জীবনের এই নিয়ম বুঝি সব জায়গাতেই এক। তার কোন ব্যতিক্রম নেই। বঙ্গোপসাগরের এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপেও জীবনের সেই সনাতন নিয়মটি কাজ করে যায়।

নিত্য ঢালীর সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে উজানী বুড়ী ভেবেছিল, চুলোয় যাক হারাণ। তাকে আর খুঁজবে না। বিড় বিড় করে বকেছিল, 'যা, তর বান্ধবরা যেইখানে আছে হেইখানেই যা। তাগো কাছেই থাক। তর মুখ আমি আর দেখতে চাই না। ক্যান দেখুম ? যে না দ্যাখে আমারে তারে লউক চামারে।'

মুখে তো এত বলল তবু মনকে বুঝ মানাতে পারল কই ? ঠিক করেছিল, হারাণের ব্যাপারে সে পাষাণ হবে। কিন্তু কিছুই করা গেল না। ক্ষুব্ধ অভিমানী মনটা যেই একটু থিতাল সঙ্গে সঙ্গে হারাণের খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়ল উজানী বুড়ী।

হারাণ নিত্য ঢালীর বাড়ীতে ওঠে নি। এ ক'দিন সে ছিল উদ্ধব বৈরাগীর

াছে। সেখানে নিয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কে'দে, ভাই-দাদা-সোনা বলে হারাণের মনটাকে নরম করে ফেলল উজানী বুড়ী।

শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরল হারাণ।

হারাণ ঘরে ফিরলেই বা কী, তার আগে উদ্ধব বৈরাগীর কাছে থাকলেই া কী, উজানী বুড়ীর সেই যে সন্দেহ হয়েছিল তা আর ঘুচল না। তার ারণা, হারাণ নিত্য ঢালীর ঘরেই ছিল।

আজকাল হারাণকে আর বিয়ের কথা বলে না উজানী বুড়ী। ভাত জ্বাল দতে দিতে কি উঠোন নিকোতে নিকোতে নিজের মনেই আক্ষেপ করে, 'বিরিক্ষ বৃক্ষ), আগে আছিলা কার ? তোমার। অহন কার ? অমুক বান্ধবের।' একটু থামে। আবার শুরু করে, 'কিন্তুক এই বান্ধবেরা আছিল কুনখানে ? হন দুই বছরের শিশু রাইখা বাপ মরল মা মরল, তহন তারা আইতে পারে নাই! সেই শিশু অহন বড় হইছে, হাত-পা হইছে, পাখ হইছে। অহন তো বান্ধব জুটবই। জুটুক জুটুক। তর কপাল তুই খাবি। আমার আর কি ? কিছুই না। আমার আর কয়দিন! তিন কাল গেছে। গতর নাই, বয়স নাই, আমার কিছুই নাই। ভাবছিলাম তর সোমসার গুছাইয়া দিয়া যামু। কিন্তুক নিজের কপাল নিজে পোড়াইলে পরে কি করতে পারে।' উজানী বুড়ী সমানে বকে যায়।

সবই দ্যাখে হারাণ, সবই শোনে। কিন্তু মুখ খোলে না। মুখ খুললেই তো অনর্থক চেঁচামেচি। একটা অনর্থ বেধে যাবে।

তাই দেখেও হারাণ দ্যাখে না, শুনেও শোনে না। কানে তুলো আর চোখে ঠুলি দিয়ে মুখ বুজে থাকে। আদতে উজানী বুড়ীকে গ্রাহ্যেই আনে না হারান।

অনেক আগেই সকাল হয়েছে।

দ্বীপের পাখিরা সমুদ্রে চলে গেছে। দিনের প্রথম রোদে জঙ্গলের মাথা জ্বলছে।

বাঁশের মাচানে এখন শুয়ে রয়েছে হারাণ।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে সোনার তারের মত সরু সরু রোদের রেখা চোখে এসে বিঁধছে। সকাল বেলায় ঘুমের মৌতাত ছুটে যাচ্ছে। অগত্যা রোদ ঠেকাবার জন্য কাঁথাটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিল হারাণ। কিন্তু কাঁথা মুড়ি দিয়েই কি ঘুমাবার জো আছে ?

গুপী বিলাস আর যোগেন এসে ডাকাডাকি শুরু করল, 'হারাণ, আঁই হারাণ, আর কত ঘুমাবি ? ওঠ্ ওঠ্—'

উঠতেই হল। বিরক্ত গলায় বিড় বিড় করে হারাণ বলল, 'না, সুখের ঘুমটুক যে ঘুমামু তার উপায় নাই। বিহানে আইতে কইছি, শয়তানেরা রাইত

থাকতে উইঠা আইছে।' মাচানে বসেই আড়মোড়া ভাঙল হারাণ। একটা একটা করে হাত-পায়ের বিশটা আঙ্গুল মটকাল। গুনে গুনে দশটা হাই তুলল।

বাইরে গুপীরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, 'হারাণ, আই হারাণ—মরলি নিকি? ওঠ—ওঠ—'

'আরে যাই যাই—' ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এল হারাণ। আর বেরিয়েই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

গুপীরা একপাল কুকুর নিয়ে এসেছে। জন্তুগুলো উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল হারান। বিস্ময়ের ভাবটা কাটলে বলল, 'এত কুত্তা দিয়া কি হইব?'

'কাইল রাইতের কথা আজ বিহানেই ভুললি!' গুপীরা বলতে থাকে, তুই তাজ্জব করলি হারাণ। তর মনখান কই থাকে রে বান্দর (বাঁদর)?'

হারাণ জবাব দিল না। তার মনে পড়েছে কাল রাত্রেই ঠিক করা হয়েছিল, আজ সকালে তারা জঙ্গলে শুয়ার মারতে যাবে। তাই গুপীরা কুকুর নিয়ে এসেছে। নাঃ, আজকাল সব ব্যাপারেই বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে হারানের।

গুপীরা তাড়া লাগাল, 'চল্—সুরয উইঠা গেছে। আর দেরী করনের কাম নাই।'

'চল্—'

আগে আগে কুকুরের পাল চলল। পেছন পেছন গুপী হারাণ বিলাস আর যোগেন।

শুয়ার মারতে তারা পশ্চিম দিকের পাহাড়ে যাবে।

টিলার পর টিলা পেরিয়ে চড়াই-উতরাই ভেঙে জঙ্গল ঠেঙিয়ে হারাণরা চলেছে। চলতে চলতে একবার মুখ তুলে ওপরে তাকাল তারা।

সূর্যটা আকাশ বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। পশ্চিমা বাতাস এতক্ষণ ঢিমে তালে বইছিল। হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। জঙ্গলের মাথা মুচড়ে মুচড়ে তার মাতামাতি শুরু হল।

নিত্য ঢালির ঘরের সামনে দিয়ে পথ। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল হারাণ।

গুপীরা বলল, 'কী হইল, এইহানে খাড়লি যে!'

'তরা জঙ্গলে যা, আমি এট্টু পরে যামু।'

বেলা চড়ছে। রোদের তাত বাড়ছে। গুপীরা আর দাঁড়াল না। কুকুরের পাল নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

ঝিম মেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হারাণ। এখান থেকে নিত্য ঢালীর ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। উঠোন, বাঁশের পাটাতনের দাওয়া, ঘরের বেড়া, ঝাঁপ—সব কিছুই স্পষ্ট।

উঠোনে পাশাপাশি ঘন হয়ে বসেছে নিত্য ঢালী আর একটা লোক। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হারাণের দিকে পিছন ফিরে সে বসে আছে।

পিছন দিকটা দেখে হারাণ যতদূর আন্দাজ করতে পারছে তাতে মনে হয় লোকটা এই সেটেলমেণ্টের কেউ না।

এই উপনিবেশের কাকে না চেনে হারাণ! সবার চেহারা তার মুখস্থ। দূর থেকে দেখেই সে বলতে পারে কে যোগেন, কে পালসাহাব আর কে রসিক শীল! কিন্তু এই লোকটা ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে একেবারে নতুন মনে হচ্ছে।

লোকটা সম্বন্ধে নানা কথা হারাণের মাথায় ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছিল। কি নাম, কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, নিত্য ঢালীর সঙ্গে এত মাখামাখি হল কি করে, এমনি হাজারটা চিন্তা হারাণকে অস্থির এবং উত্তেজিত করে তুলল।

এক সময় হারাণের হুঁশ হল। দেখল, কথা বলতে বলতে নিত্য ঢালী আর সেই লোকটা টিলা বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে।

পাশেই একটা প্যাডক গাছ। সরকারী বন বিভাগের লোকেরা গাছটার ডাল-পালা এবং ছাল পুড়িয়ে গিয়েছে। কি মনে করে আধপোড়া কবন্ধ গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল হারাণ। যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই।

লোকটা এই সেটেলমেণ্টের কেউ না। চামড়ার রং কুচকুচে কালো, পুরু পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল।

লোকটাকে যে কোথা থেকে নিত্য ঢালী আমদানী করল, ঈশ্বর জানে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এরিয়াল উপসাগরের দিকে চলে গেল নিত্য ঢালী।

সঙ্গে সঙ্গে আধপোড়া প্যাডক গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হারাণ। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে পড়ল, খোলা বারান্দার পাটাতনে একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে কাপাসী। নতমুখ, আঁটা ঠোঁট, উদাসীন চোখ। পশ্চিমা বাতাস এক একবার ক্ষেপে উঠে চুলগুলো উড়িয়ে নিয়ে কাপাসীর মুখ ঢেকে দিচ্ছে।

টিলা বেয়ে তর তর করে ওপরে উঠে এল হারাণ। একটুক্ষণ উঠোনের এক কিনারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

নাঃ, যেমন ছিল তেমনি বসে রইল কাপাসী। কোনদিকে তার লক্ষ্য নেই।

আস্তে আস্তে কাপাসীর সামনে এসে দাঁড়াল হারাণ। একবার মুখ তুলেই নামিয়ে নিল কাপাসী।

হারাণ ডাকল, 'কাপাসী—'

শান্ত গলায় কাপাসী বলল, 'কও—'

'নিত্য তালুইর লগে একজনেরে বাইরে যাইতে দেখলাম। নয়া মানুষ মনে হইল।'

'ও, তা হইলে দেখা হইছে!'

একটু থতমত খেল হারাণ। বাধো বাধো গলায় বলল, 'এইখান দিয়া শুওর

মারতে যাইতে আছিলাম। দেখলাম, নিত্য তালুই তার নয়া মানুষটা কথা কইতে কইতে সমুদ্দরের দিকে গেল। তাই—'

তাই খবর নিতে আইলা ?'

'হ।'

অনেকক্ষণ আর কেউ কিছু বলে না। হারাণও না, কাপাসীও না। হারাণ ভেবেছিল নিজের থেকেই সব জানাবে কাপাসী। লোকটা কে, কি নাম, কি মতলবে এসেছে, কিছুই বাকি রাখবে না। কিন্তু যখন সে কিছুই বলল না, মনে মনে রীতিমত ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু ক্ষোভটাকে মনের মধ্যে চেপে রাখতে জানে হারাণ। নিজের গরজেই এবার সে বলল, 'নয়া মানুষটা কে ?'

'পানিকর ভাই। বাপে তার কাছে কাম করে। পানিকর ভাই বড় ভাল মানুষ। কামের বদলে টাকা দ্যায়। আমাগো কত তত্ত্বতালাস করে।' এবার পানিকর সম্বন্ধে একসঙ্গে অনেক কথা বলে কাপাসী।

'পানিকর ভাই! এর মধ্যে সম্বন্ধও পাতান হইয়া গেছে!' হারাণকে উত্তেজিত দেখায়।

কাপাসী বলতে থাকে, 'মাইনষের লগে মাইনষের সম্বন্ধ পাতাইতে হয় না। আপনা থিকাই পাতান থাকে। বুঝলা পুরুষ—'

'অ্যাত দিন বুঝি নাই।'

খানিকটা চুপচাপ। হারাণই আবার শুরু করে, 'তোমার পানিকর ভাই কি রোজই আহে ?' বলেই চোখ কুঁচকে কাপাসীর দিকে তাকায়।

'পেরায়ই আহে। আমাগো কত উপকার করে।'

টেনে টেনে হারাণ বলে, 'উপকারী বান্ধব। তা এই বান্ধবখান আছিল কোথায় ?'

কাপাসী জবাব দেয় না।

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হারাণ। কিন্তু যে কাপাসী নিস্পৃহ উদাসীন তার সঙ্গে সেধে সেধে কত কথাই বা বলা যায়!

মাথার ভেতরটা যেন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল হারাণের। সে বলল, 'আমি অহন যাই।'

মুখে কিছুই বলল না কাপাসী। মাথাটা বাঁ পাশে কাত করল।

উত্তেজনায় দুঃখে এবং ক্ষোভে কপালে ফোটা ফোটা ঘাম দেখা দিয়েছে। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। একটা ভারী নিরেট কান্না কণ্ঠার কাছে স্তূপাকার হয়ে আছে। হাজার ঢোক গিলেও সেটাকে নামানো যাচ্ছে না।

টিলা বেয়ে টলতে টলতে নিচের দিকে নামছিল হারাণ। একটা কথা ভেবে সে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

কাপাসীর পানিকর ভাই এল। সঙ্গে সঙ্গে তার তীব্র অবুঝ অস্বাভাবিক

হাসিও থেমে গেল। অন্য দিনের মত কাপাসী আজ তো কল কল হাসিতে মেতে উঠল না।

কাপাসীর কথা যতই ভাবল, মাথাটা ততই গরম হয়ে উঠল হারাণের।

একবার বসতেও বলল না কাপাসী। নিজের থেকে একটা কথাও বলল না। হারাণ কিছু জিজ্ঞাসা করলে দু একটা কথায় দায় সারল।

হারাণের মনে হল, কাপাসীর কথায় বার্তায় প্রাণের তাপ নেই। তার সম্বন্ধে কাপাসী কেমন যেন নিস্পৃহ।

কিন্তু কেন?

হুঁশ ছিল না, কাপাসীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন নিজের ঘরে ফিরে এসেছে।

আজ আর হারাণের শুয়োর মারতে যাওয়া হল না।

৩২

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে বর্ষা এসে গেল। চৈত্র থেকে যে ছন্নছাড়া দিশাহারা মেঘগুলি আকাশময় ভেসে বেড়াচ্ছিল, আষাঢ়ে এসে সেগুলো জমাট বেঁধে গেল।

আকাশটা পোড়া তামারঙের মেঘে ছেয়ে গেছে। মেঘ এত নিরেট এত জমাট যে আকাশের নীল দেখার মত কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। মাঝে মাঝে আকাশটা আড়াআড়ি চিড় ধরে। কড় কড় শব্দে বাজ গর্জায়। সাপের জিভের মত বিদ্যুৎ লিক লিক করে। আর দিনরাত আকাশ-জোড়া বিরাট মৃদঙ্গটায় গুরু গুরু ঘা পড়ে।

পশ্চিমা বাতাসের দাপট বড় সাংঘাতিক। কিন্তু আন্দামানের মেঘ এত ঘন এত ভারী যে ঝড়ো হাওয়াও তা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না। মেঘের গায়ে বাড়ি খেয়ে বাতাস ফিরে যায়।

মেঘ উড়িয়ে নেবে কি, পশ্চিমা বাতাসই রাশি রাশি মেঘের টুকরোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে আন্দামানের আকাশে নিয়ে আসছে।

একদিন সব আয়োজন শেষ হল। তারপরেই শুরু হল বৃষ্টি। আন্দামানের বৃষ্টির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, সময়ের হিসেব নেই। দিনরাত ঝরছে তো ঝরছেই।

তামারঙের আকাশটা এখন দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। দূরের কাছের টিলা-জঙ্গল-পাহাড়—সব কিছু ঝাপসা হয়ে আছে।

সীসের মত বৃষ্টির রঙে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

বর্ষা নামার আগেই পালসাহাব নয়া সেটেলমেন্টের বাসিন্দাদের হুঁশিয়ার

করে দিয়েছিল, 'এ বার বারিষ নামবে, খুব সাবধান। চালে আর এক দফা ছাউনি চাপা।'

আন্দামানের বর্ষার স্বরূপ এই নতুন মানুষগুলো জানে না। আগে ভাগে তাদের সতর্ক না করে দিলে বিপদ অনিবার্য।

জল যেই নামে সব গর্ত বুজে যায়। গর্তের যারা বাসিন্দা, সাপ-বিছে-কানখাজুরা, এমনি নানা জাতের সরীসৃপ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। মানুষের ঘর ছাড়া এই উলঙ্গ বর্বর দ্বীপে নিরাপদ আশ্রয় কোথায় মিলবে? সরাসরি অরা ঘরেই এসে ঢোকে।

পালসাহাবের কথামত নতুন বাসিন্দারা ঘরের চালে আর এক পরল খেত-পাতা চাপিয়েছে। সাপ-বিছে-পোকা-মাকড় যাতে ঢুকতে না পারে সে জন্য বেড়ার গায়ে সব ফাঁক-ফোকর-ফুটো ন্যাকড়া গুঁজে গুঁজে বুজিয়ে ফেলেছে। ঘরের আড়াগুলো তক্তা দিয়ে আটকে দিয়েছে।

সাতদিন অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে।

কয়েক দিন আগেও কিলপণ্ড নদীটাকে দেখে হারাণ মনে মনে হেসেছিল। হাত বিশেক চওড়া একটা তিরতিরে, প্রায় নিঃস্রোত খালের নাম কি না নদী! তা যে দেশের যে রীতি!

এখন যদি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে হারাণ দেখত! সোঁতা খালটার চেহারা কি ভয়ানকই না হয়ে উঠেছে। দশ হাত চওড়া খালটা এখন পঞ্চাশ হাত হয়ে গেছে। আর তীরের মত দুর্জয় বেগে জল ছুটছে। জলের ঘা খেয়ে শিকড়সুদ্ধ বিরাট বিরাট গাছগুলি উপড়ে যাচ্ছে।

বর্ষার দৌলতে কিলপণ্ড নদী কি মারাত্মকই না হয়ে গেল! নদীর এখন ভরা যৌবন।

শুধু কি কিলপণ্ড নদীই, ওপাশের ডিগলিপুরের খালটারও একই দশা। বর্ষার জল পেয়ে সেটাও ক্ষেপে উঠেছে; ফুলে ফেঁপে ফেনিয়ে উঠে এরিয়াল উপসাগরের দিকে ছুটেছে।

এদিকে এই বৃষ্টির মধ্যেও পালসাহাব বেরিয়ে পড়েছে। রোজই সে সেটেলমেণ্টটা টহল দিয়ে বেড়ায়। এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। জল হোক, ঝড় হোক, অসুখ হোক, বিসুখ হোক, কিছুতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবার জো নেই।

পায়ে গাম বুট, গায়ে রবারের রেনকোট। পা ফেললেই কাদায় গেঁথে যায়। সঙ্গে সঙ্গে টেনে তোলে পালসাহাব। অতি কষ্টে কাদা আর বৃষ্টির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে এগোয়। এগোয় আর চিল্লায়, 'শালে লোগ হোঁশিয়ার। সাপ-বিছে-কানখজুরা বেরিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকবে।' কিন্তু বৃষ্টির একটানা শব্দে পালসাহাবের গলার আওয়াজটা চাপা পড়ে যায়॥

টহল মারতে মারতে এর-ওর-তার ঘরে গিয়ে বসে পালসাহাব। কিছুক্ষণ এ কথা সে কথা বলে, 'এবার তো তোদের মজা। বারিষ পড়ল। মিট্টিও লাঙলের গুঁতোয় চৌপট হয়ে আছে।'

এ-ও-সে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ্ পালসাহাব। বন্যাটা এট্টু ধরলেই বীজ রুইতে যামু।'

'মালুম হচ্ছে ফসল এই মিট্টিতে ভালই ফলবে।'

'তাই মনে হয়।' সকলেই ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয়।

কিছুক্ষণ বসেই উঠে পড়ে পালসাহাব। অনেকক্ষণ বসে গল্প করার সময় তার কোথায়? এই বর্ষাতেও তার অনেক কাজ।

কারো চাল হয়তো ফুটো হয়েছে, তা মেরামত করে দেয়। কেউ হয়ত ব্যারামে পড়েছে, তার ওষুধের ব্যবস্থা করে। প্রতিটি ঘরে ঘুরে সকলের খোঁজ খবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেটেলমেণ্টের শেষ মাথায় উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে আসে পাল-সাহাব। গামবুট রেনকোট খুলতে খুলতে বলে, 'তামাক সাজো উস্তাদ—'

মায়া বন্দর থেকে হুঁকো-কলকি-তামাক—যাবতীয় সরঞ্জামই এনে দিয়েছে পালসাহাব। জুত করে তামাক টানতে টানতে সে বলে, 'লাগাও উস্তাদ, সেই গানটা লাগাও।'

রোজই এক নিয়ম। কি গান তা আর বলতে হয় না আপনা থেকেই উদ্ধব বুঝে নেয়।

দোতারার তারে আঙুল টেনে টেনে টুঙ টাঙ শব্দ করে উদ্ধব। তারপর খানিকক্ষণ গুন গুন সুর ভেঁজে গাইতে থাকে :

ওরে যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?

একসময় হুঁকোর শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক অনেক দূরে সীসারঙের বৃষ্টিতে আকাশটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আকাশের ওপারে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে ফেলে পালসাহাব।

আহা, বঙ্গোপসাগরের এই বর্বর নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়তে গড়তে পাগলা পালসাহাব জীবন রসিক হয়ে গেল।

একটানা পনের দিন বৃষ্টি চলল। কবে যে এই বর্ষণ থামবে, আদৌ থামবে কি না আকাশের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই।

যোগেনের ঘরটা একেবারে কিলপণ্ড নদীর পারে।

নদীর ঘা খেয়ে খেয়ে ঘরের পেছন থেকে অনেকখানি মাটি ধসে পড়েছে। এখনও বিরাট বিরাট মাটির চাঙড়া খসে পড়ছে।

ঘরের চালটা তিন চার জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। জল পড়ে ঘর ভেসে যাচ্ছে। এত বৃষ্টি যে বাইরে বেরিয়ে বেতপাতা এনে চাল ছাইবে, তার জো নেই। অগত্যা ঘরে বসে বসে ভিজেই চলেছে যোগেন।

খাওয়া দাওয়া একরকম বন্ধ। বৃষ্টি না ধরা পর্যন্ত উনুন জ্বালাবার কোন আশাই নেই।

বর্ষা নামবার আগে কিছু চিঁড়ে আর গুড় জোগাড় করে রেখেছিল যোগেন। চিঁড়ে চিবিয়েই কটা দিন চলছে।

দুই হাঁটুতে থুতনি ঢুকিয়ে মাচানের উপর জবুথবু হয়ে বসে আছে যোগেন।

ঘরের সব ফাঁক-ফুটোয় ন্যাকড়া গুঁজে এঁটে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও রোখা গেল না। কোন পথে, কখন, কিভাবে যে পোকা-মাকড়-জোঁক ঢুকে পড়েছে, তারাই জানে। ঘরময় বাড়িয়া পোকা, গান্ধী পোকা, জোঁক বিছে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। এ ঘর যেন তাদের রাজত্ব।

জোঁকগুলো যোগেনের রক্ত শুষে শুষে কাঁচ তেলাকুচের মত হয়ে আপনা থেকেই খসে পড়ে। বাড়িয়া পোক আর গান্ধী পোকারা কামড়ে কামড়ে চামড়া ফুলিয়ে ফেলেছে।

পনের দিন ধরে সমানে জোঁক আর পোকাদের উৎপাত সয়ে সয়ে শরীরে এখন আর সাড় নেই।

বাইরের দিকে একবার তাকাল যোগেন। সীসারঙ দুর্বোধ্য আকাশ দেখে বোঝা যায় না এখন বেলা কত। সকাল, দুপুর না সন্ধ্যা?

হঠাৎ চমকে উঠল যোগেন।

ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে বিরাট একটা গোক্ষুর সাপ ঘরের মধ্যে ঢুকল। কুচকুচে কালো রঙ। ফণায় সাদা নকশা আঁকা।

ঘরে ঢুকে সাপটা জুল জুল করে এদিক সেদিক তাকাল। তার চোখ দুটো

দুটুকরো নীলার মত জ্বলছে। জলে ভিজে সাপটার গায়ের আঁশ এখন মসৃণ পিছল এবং চকচকে।

সাপটা বুঝি বা তাপ চায়। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য উষ্ণ নিরাপদ একটি আশ্রয় চায়।

হঠাৎ সাপটার চোখে পড়ে গেল, মাচানের উপর একটা লোক বসে আছে। যোগেনও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল প্রাণীটার দিকে।

সাপের সঙ্গে মানুষের চোখাচোখি হল। ঠিক সাপ আর মানুষ নয়। যেন দুটো সাংঘাতিক প্রতিপক্ষ।

যোগেনের চোখের দিকে তাকিয়ে সাপটা কি বুঝলো কে জানে। সাঁ করে লেজের উপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। আধ হাত চওড়া বিরাট ফণাটা একটু একটু দুলতে লাগল। পাতাহীন চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। চেরা জিভটা লিক লিক করতে লাগল।

এক মুহূর্ত আচ্ছন্নের মত বসে রইল যোগেন। মেরুদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা হিমের স্রোত নেমে গেল তার। একটাই মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই ধাঁ করে পাশ থেকে ঝকঝকে বর্মী দা'টা তুলে বাগিয়ে ধরল সে।

বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে একটি ঘরের দখল নিয়ে এই মুহূর্তে একজন মানুষ আর একটা সাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

এই ঘর একজনেরই হবে। হয় মানুষের, নয় সাপের। দু'জন প্রতিপক্ষ এক ঘরে থাকা অসম্ভব।

সাপের ফণা দুলছে। ছোবল পড়বার আগেই যোগেন দা চালিয়ে দিল। সাপের দেহ থেকে ফণাটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। প্রায় পাঁচ হাত লম্বা দেহটা এক মুহূর্ত খাড়া থেকে আছড়ে নিচে পড়ল। তির তির করে কাঁপতে লাগল। খানিকটা পর কাঁপুনি থেমে গেল।

প্রাণ বাঁচাবার অন্ধ তাগিদে দা চালিয়ে দিয়েছিল যোগেন। উত্তেজনা কেটে গেলে মাচানের উপর আচ্ছন্নের মত বসে রইল সে। কপালে, কানে, নাকের ডগায় কণা কণা ঘাম ফুটল। হাতের পাতা দুটো ভিজে উঠেছে। শ্বাস টেনে টেনে হাঁপাতে লাগল যোগেন।

কতক্ষণ যে বসে ছিল, হুঁশ নেই। যখন হুঁশ হল, বাইরের আকাশ আরো আবছা আরো দুর্জ্ঞেয় হয়ে যাচ্ছে। বুঝি বা একটু আগে দিন ছিল। দিনটা মরে মরে এখন রাত হচ্ছে।

অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে যোগেন। এখন কি করবে, সেই কথায় সে ভাবছিল।

হঠাৎ ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপে কে যেন ঘা মারল।

যোগেন চমকে উঠল: 'কে?'

'আমি। আমি ছাড়া আবার কে!' বৃষ্টির একটানা শব্দের সঙ্গে মিশে গলার

স্বরটা দুর্বোধ্য শোনাল। কে কথা বলছে যোগেন বুঝতে পারল না।

বাইরে থেকে এবার ঝাঁপ ধরে ঝাঁকানি শুরু হল। অসহিষ্ণু, কিছুটা বা উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'তরাতরি দুয়ার খোল।'

অগত্যা বাঁশের মাচান থেকে নিচে নামল যোগেন। কিন্তু ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপটা খুলেই তিন পা পিছিয়ে আসতে হল, 'তুমি!'

'হ-হ, আমি। চিনতে পারলা না! এই কয়দিনে আমি কি এতই বদলাইয়া গেলাম পুরুষ!'

যোগেন জবাব দিল না। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

যে ঘরে ঢুকেছিল, এবার তীক্ষ্ন রিনরিনে গলায় সে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'না চিনার তো কথা না পুরুষ। তোমার লগে আমার কত জন্মের সম্পর্ক। তাই না!'

বিমূঢ় ভাব অনেকটা কেটে গেছে যোগেনের। এবার সে বলল, 'তুমি ঘরে যাও তিলি, ঘরে যাও—'

তিলি কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'ঘরে ফিরার লেইগা তো আহি নাই।'

'কিন্তুক এ ভাল না, এ ভাল না। বড় মোন্দ, বড় পাপ—'

তিলি কিছুই বলল না। আগের মতই সরু ধারাল শব্দ করে হাসতে লাগল। তিলির হাসির শব্দটা ছুঁচের মুখের মত যোগেনের সমস্ত শরীরে বিঁধতে লাগল।

বৃষ্টিতে নেয়ে এসেছে তিলি। সারা দেহ কাদায় মাখামাখি। শাড়িটা জলে ভিজে বুকে লেপটে আছে। শাড়ির তলায় এক জোড়া, একই মাপের সুগোল নিটোল বুক পাশাপাশি ওত পেতে আছে। গালে আর কপালে তিনটে জোঁক লেগে আছে। তিলির হুঁশ নেই। বিড়ালীর মত কটা চোখ দুটো ঝিক ঝিক করছে তার। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে তিনটে ধারাল চোখা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। মুখে হিংস্র এবং সূক্ষ্ম একটি হাসি মিহি পর্দার মত জড়িয়ে আছে। তিলির মনে কি আছে কে জানে।

যোগেন অনেকটা পিছু হটেছে। তিলিও এক পা এক পা করে তার দিকেই এগুতে থাকে।

নির্জীব গলায় যোগেন আবার বলে, 'তুমি যাও—' বলে বটে, গলায় কিন্তু তেমন জোর পায় না যোগেন।

শব্দ করে হাসে তিলি। বলে, 'আগেই তো কইছি, যাওয়ার লেইগা আহি নাই।'

যোগেন শেষ চেষ্টা করে, 'কেউ দেইখা ফালাইব—'

'কেউ দেখব না পুরুষ।' তিলি বলতে থাকে, 'এই তুফান, এই বর্ষায় পিরথিমীর কেউ বাইর হয় না। ভগমান এই দিনটা খালি আমার লেইগাই

বানাইছে। হ গো পুরুষ—' তিলির ঠোঁট দুটো চিরে আরো কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। তিলির হাসি ক্রমশ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তিলি আদৌ হাসছে কী? যোগেন ঠিক বুঝতে পারে না। তার সমস্ত চেতনা যেন দ্রুত আচ্ছন্ন হয়ে যেতে থাকে।

৩৭

যোগেন আর তিলির একসঙ্গে গাঁথা একটা অতীত আছে।

এই সেটেলমেণ্টের কারো সঙ্গেই কোন সম্পর্ক নেই যোগেনের। তবু সবাই তাকে জামাই ডাকে।

একসঙ্গে থাকতে হলে একটা কিছু সম্বন্ধ পাতিয়ে নিতেই হয়। কেউ হয় খুড়ী, কেউ তালুই, কেউ মাউই, কেউ জেঠা। যোগেন হয়েছে জামাই।

সেটেলমেণ্টের আর কারো [illegible]ঙ্গে থাক আর নাই থাক, অ[illegible] সেই দেশভাগের আগে থেকেই তিলি আর যোগেনের মধ্যে এ[illegible]পন সম্পর্ক আছে।

ঢাকা জেলার বাজিতপুর গ্রাম হল তিলির শ্বশুরের ঘর। সেই গ্রামেরই নাপিত বাড়ির ঘর জামাই যোগেন। তিলি যে গ্রামের বউ সেই গ্রামেরই জামাই যোগেন। এমনিতেই দু'জনের মধ্যে রসের সম্পর্ক।

যোগেনের বউ নিমি যেদিন মরল আর তিলির ওপর রুগ্ন অস্থিসার খিটখিটে হরিপদর সন্দেহ যেদিন থেকে শুরু হল সেদিন থেকেই দু'জনের সম্পর্কটা শুধু রসেরই রইল না; অন্য কিছুরও হল।

নতুন সম্পর্কটা টের পেতে অনেক দিন লেগেছিল দু'জনের।

পাশাপাশি বাড়ি। মাঝখানে একটা ভদ্রাসন।

যখন তখন যোগেন আসত তিলিদের বাড়ি। তিলি যেত যোগেনদের বাড়ি। গ্রাম দেশে এই যাওয়া আসা কেউ কু চোখে দেখে না। সোজা সহজ মানুষ সব। মন কু না হলে কি চোখ কু হয়?

যোগেন ঘর জামাই। ঘরের কোন কাজেই সে আসে না। নিয়ম করে দু বেলা শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস ছাড়া তার অন্য কাজ নেই। এই শর্তেই নাপিতরা যোগেনকে ঘরজামাই করে এনেছিল।

দিনরাত যোগেনের অফুরন্ত ফুরসত। যতদিন বউ বেঁচে ছিল ততদিন তবু খানিকটা সময় ঘরে কাটাত যোগেন। কিন্তু বউ যেই মরল মনও উড়ু উড়ু। ঘরে আর মন বশ খায় না। ঘুরে ঘুরেই সে কিসের টানে যেন তিলির কাছে আসে।

তিলির হয়েছে মরণ। নিত্য দিন হাঁপির টানে ভোগে হরিপদ, তা যেন তিলির দোষ। দিনে দিনে হরিপদ আরো রোগা আরো কাহিল হয়ে পড়ছে, তাও তিলির দোষ। হরিপদর চোখের সামনে দেখতে দেখতে তিলি প্রচুর স্বাস্থ্যে ভরে উঠছে, তাও তিলিরই দোষ।

হরিপদ তামাকের ব্যবসা করে।

তামাক বিকিকিনি করতে হাটে যায়। যতক্ষণ সে হাটে থাকে ততক্ষণই তিলির যা একটু স্বস্তি, যা একটু শান্তি। না হলে তিলির জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই।

যতক্ষণ হরিপদ বাড়িতে থাকে খিটির খিটির করে, 'মাগী এত ফোলে ক্যামনে? কী খাইয়া ফোলে? কী সুখে ফোলে? ভগমান তুমি কি আন্ধা (অন্ধ) হইলা? আমারে শুকাইয়া মাগীরে ফুলাও!' খিটির খিটির করাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে হরিপদর।

মুখ বুজে সব সয়ে যায় তিলি।

হাজার হোক, মানুষ তো। মানুষের দেহ, মানুষের মনই তো। কত আর সয়! কত সওয়া যায়!

দিবারাত্রি সংসারের কাজ করছে। হরিপদর রোগের সেবা করছে। হরিপদ তামাক বেচতে যাবে, তার ব্যবস্থা করছে। গতরকে গতর মানছে না তিলি। তবু হরিপদর খিটির খিটির কমে না। উঠতে বসতে তার খালি সন্দেহ আর সন্দেহ। যোগেন আসে, সুবল আসে, গোকুল আসে। হাজারটা মানুষ আসে। গ্রামের যে-ই আসুক না, তাদের সঙ্গে তিলিকে জড়িয়ে দিনরাত সন্দেহই করছে সে।

হরিপদ বলে, 'অরা ক্যান আহে, আমি জানি। তুই ক্যান দিন দিন ফোলস হেয়াও জানি।'

'জান তো ভাল। মোন্দ কথা ভাবতে তোমার যত সুখ!' তিলি রুখে উঠত।

তিলিকে সন্দেহ করাটা স্বভাব হয়ে উঠল হরিপদর। তার ব্যারামটার সঙ্গে সন্দেহ বাতিকটাও পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল।

এমনিতে তিলি হাসিখুশি, প্রাণের প্রাচুর্যে ঠাসা। সব সময় রঙ্গরসে মেতে থাকে। তিলির প্রাণশক্তি এত প্রচুর এত পর্যাপ্ত যে হরিপদর এত সন্দেহ এত খিটির খিটিরের পরেও সে উজ্জ্বল সরস তাজা হয়ে থাকতে পারে।

এমন যে তিলি, এক একদিন বেজার মুখে চুপচাপ বসে থাকে। গালে হাত দিয়ে আকাশে চোখ রেখে কি যেন ভাবে।

হরিপদ হয় তো হাটে গেছে কি বাড়িতে নেই। এদিক সেদিক দেখে তিলির কাছে আসে যোগেন। হরিপদ থাকলে যোগেন তার বাড়ি ঢোকে না। হরিপদ যে তিলির সঙ্গে তার মাখামাখি পছন্দ করে না, এটুকু যোগেন বুঝে নিয়েছে।

যোগেন ডাকে, 'বউ—'

'আগো জামাই তুমি! আমি ভাবলাম কে না কে!' অল্প একটু হাসে তিলি।

'হরিপদ দাদায় নাই?'

'তারে বুঝি ডর?'

'না, ডর ঠিক না। তয়—' বলতে বলতে থেমে যায় যোগেন।

একটু চুপচাপ। তারপর তিলিই শুরু করে, 'বস, তোমার লগে কথা আছে।'

তিলির পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে যোগেন। বলে, 'কও।'

আকাশের দিকে চোখ রেখে কি একটু যেন ভাবে তিলি। তারপর হঠাৎ আকুল হয়ে বলে, 'আইচ্ছা জামাই—' বলেই থেমে যায়।

'কও, যা কইতে চাও—'

'জামাই, সারাটা জনম কি আমি দুঃখুই পামু? কপালে দুঃখুর লিখা লইয়াই কি আমি পিরথিমীতে আইছিলাম।'

তিলির প্রশ্নের জবাব যোগেনের জানা নেই। বিমূঢ় মুখে তিলির দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

দুহাতে যোগেনকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তিলি আবার বলে, 'কও জামাই কও, আর কদ্দিন আমি দুঃখু পামু?'

যোগেন কিছুটা আন্দাজ করেছিল। আস্তে আস্তে সে বলল, 'বনিবনা কইরা লও। যত মন কষাকষি হইব দুঃখু খালি বাড়বই বউ। ততই কষ্ট পাইবা।'

'ও—' একটি মাত্র শব্দ করে চুপ করে যেত তিলি।

তিলির মুখের দিকে তাকিয়ে যোগেনের মুখে আর কথা জোগাত না।

হরিপদ আর তিলির মধ্যে যে বনিবনা নেই, মিল নেই, মোটামুটি এই কথাটা বুঝতে দেরি হয় নি যোগেনের। তিলির বিষণ্ণ উদাস চেহারাই সে কথা সর্বক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কী-ই বা করতে পারে যোগেন! সে নিরুপায়। মুখ বুজে চুপচাপ তিলির দঃখের কথা শোনা ছাড়া তার কিছুই করার নেই।

এক এক দিন দুঃখটা যখন অসহ্য হয়ে উঠত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তিলি কাঁদত। বলত, 'আর পারি না, আর পারি না জামাই। দিন রাইত উঠতে বইতে খালি মন্দ আর মন্দ।'

'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর বউ' যোগেন তাকে বোঝাত।

'আর কত ধৈর্য ধরুম?

'মনেরে বুঝ মানাও বউ।'

'আর কত বুঝ মানামু?'

এর পর আর কথা খুঁজে পেত না যোগেন।

কথায় বলে বনের বাঘে খায় না, খায় মনের বাঘে। হরিপদর হয়েছে সেই দশা। তার মনে সেই যে সন্দেহ বাতিকটা জন্মেছে, তা আর ঘোচে না। দিন দিন বাড়তেই থাকে। হরিপদর মনে যে বাঘটা ছিল সেটাই একদিন তাকে খেল। হরিপদকে তো আর খেল না, খেল তিলিকে। হরিপদর সন্দেহই একটু একটু করে তিলিকে যোগেনের দিকে এগিয়ে দিল।

বাজিতপুর গ্রামে এমন একটা মানুষ নেই, যাকে মনের কথা বলে তিলি জুড়োতে পারে। এক আছে ঐ যোগেন।

এদিকে মেয়ে মরেছে তো জামাইর আদরও ঘুচেছে। দু বেলা দু পেট ভাত গিলতে শাশুড়ীর গঞ্জনা সইতে হয়। শ্বশুর দিনরাত ক্যাট ক্যাট করে। চোখ মুখ বুজে খাবার সময় শ্বশুরবাড়ি ঢোকে যোগেন। নইলে সারাটা দিন কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় কে বলবে।

স্বামীর দেওয়া গঞ্জনা সয় তিলি। শাশড়ীর দেওয়া ভাতের খোঁটা সইতে হয় যোগেনকে। তিলি আর যোগেন—দু'জনের দুঃখের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল আছে।

একদিন খাওয়া হল না যোগেনের। ঘর জামাইর চামড়া যতই পুরু হোক খিদের মুখে ভাতের খোঁটাটা বড় বিঁধল।

শ্বশুর বলেছিল, 'নবাবের ছাও, একখান কুটা লাড়ো না, এক খান কাম কর না। দুই বেলা ভাতের থালের সুমখে (সামনে) বইতে সময় লাগে না?'

শাশুড়ী ঘোমটার ফাঁকে নথপরা নাক নেড়ে বলেছিল, 'সরম নাই গো, সরম নাই। আমরা হইলে অমুন গু মুত গিলতে পারতাম না। গলায় দড়ি দিতাম।

সামনের ভাত ফেলে উঠে গিয়েছিল যোগেন। তারও জুড়োবার একটা জায়গাই আছে এই গ্রামে। সরাসরি সেইখানেই চলে এসেছিল সে।

কিন্তু তিলিদের উঠানে পা দিয়েই চমকে উঠল যোগেন। বারান্দার একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে তিলি। চুল উড়ে উড়ে মুখের উপর এসে পড়ছে। চোখ দুটো পাকা করমচার মত লাল। দেখেই বোঝা যায়, অনেকক্ষণ ধরে তিলি কাঁদছে। কাছে এগিয়ে এসে যোগেন ডেকেছিল, 'বউ—'

'জামাই তুমি আইছ! সেই বিহান থিকা তোমার কথাই ভাবতে আছিলাম। উঠে এসে যোগেনের দুহাত চেপে ধরল তিলি।

তিলির চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়-ভয় গলায় যোগেন বলল, 'কী হইছে বউ, অমুন কান্দো ক্যান?'

'সাধে কি কান্দি, কপালে কান্দায়।' অতি দুঃখে হাসে তিলি। বলে, 'সোয়ামী আইজ ঘরের বাইর কইরা দিল। কইল, 'মাগী তর মন যেইখানে যাইতে চায় হেইখানে যা।' সোয়ামী আমারে নষ্ট দুষ্ট কুচরিত্তির কইল। আর পারি না জামাই, আর পারি না।'

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল-যোগেন। নিজের দুঃখ জুড়োতে তিলির কাছে এসেছিল সে। নিজের কথা আর বলা হল না।

তিলি অস্থির হয়ে উঠেছে। কাঁদছে আর বলছে, 'অনেকদিন ভাবছি কিন্তুক আমি ঘরের বউ। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। আইজ আর পারুম না। পিরথিমী জানব, আমার মনে পাপ আছে। আমি মোন্দ, লণ্ট। যার মনে যা আছে, তাই ভাবুক। তুমি আমারে বাচাও পুরুষ, আমারে বাচাও।'

'কেমনে ?' যোগেনের গলা কেঁপে উঠেছিল।

'পুরুষে যেমনে মাইয়া মাইনষেরে বাচায়।' বলে একটু থামল তিলি। কী ভেবে ফের বলল, 'তুমি আমারে কোথাও নিয়া চল জামাই।'

শান্ত গলায় যোগেন বলেছিল, 'যামু।'

'চল, অহনই যাই। এই পুরীতে এক দণ্ড আমার থাকতে সাধ নাই।'

'অহন না, আইজও না, কাইলও না। যেদিন বুঝুম, পিরথিমীর কুনোখানে তোমার আশ্যয় নাই, হরিপদ দাদায় সত্যসত্যই তোমারে আর চায় না হেই দিন তোমারে নিয়া যামু।'

'সত্য ?'

'সত্য। তোমারে ছুঁইয়া কই।'

তারপরও অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে।

একদিন দেশভাগ হল। ভাসতে ভাসতে তিলিরা কলকাতায় এল। তিলিদের সঙ্গে সঙ্গে যোগেনও এল কলকাতায়। হরিপদ ব্যারামী মানুষ। মনে তার যাই থাক, বিপদের দিনে যোগেনকে পেয়ে সে যেন বাঁচল, ভরসা পেল।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, রিফুজি ক্যাম্পে কয়েক বছর কাটিয়ে এখন তারা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে।

যোগেন আর তিলির পেছনের অতীতটা মোটামুটি এই রকম।

৩৫

এ বৃষ্টি যেন কোনদিন শেষ হবে না।

বাইরে আকাশটা কালো হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে যুঝে যুঝে এই দ্বীপ দিনের কাছ থেকে যেটুকু আলো পেয়েছিল, সন্ধে এসে তা মুছে দিতে শুরু করেছে।

মড় মড় শব্দে বাইরে গাছ ভাঙছে। যোগেনের ঘরের ঠিক পেছনেই ঝুপ ঝাপ আওয়াজ হচ্ছে। কিলপণ্ড নদী দুর্জয় বেগে মাটি ভাঙছে।

একটানা বৃষ্টির শব্দ, মাটি ধসার শব্দ, ক্ষ্যাপা নদীর শব্দ, উন্মাদ বাতাসের শব্দ, গাছ ভাঙার শব্দ—সব মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা সৃষ্টির সেই আদিম দুর্যোগে ফিরে গিয়েছে।

ঘরের ঝাঁপ খোলা রয়েছে। তীব্র ধারাল রেখায় ভেতরে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। কিন্তু কারো হুঁশ নেই। তিলিরও না, যোগেনেরও না।

পিছু হটতে হটতে বাঁশের মাচানে গিয়ে ঠেকেছে যোগেন। হটবার আর জায়গা নেই।

এদিকে তিলি যোগেনের একটা হাত ধরে ফেলেছে। তার চোখের তারা ঝিলিক দিয়ে উঠল। ফিস ফিস গলায় সে বলল, 'এইবার পুরুষ ?'

ভীরু অসহায় স্বরে যোগেন বলল, 'নিজের সব্বনাশ কইরো না তিলি। অহনও সময় আছে, ফিরা যাও।'

'সব্বনাশের কথা না ভাইবা কি মাইয়ামাইনষে ঘরের বাইর হয় !' অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠল তিলি। বলল, 'নিজের কথা ভাবি না পুরুষ। নিজের ভাবনা আমার ঘুচছে।'

'তবে কী ভাবো তুমি ?' করুণ নির্জীব গলায় প্রশ্ন করল যোগেন।

'তোমার সব্বনাশ করুম, দিন রাইত এই কথাই ভাবি, বুঝলা ?' যোগেনের গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিল তিলি।

যোগেন জবাব দিল না।

তিলি বলতে লাগল, 'সোয়ামীর কাছে দুঃখু পাইয়া ফিরা ফিরা তোমার কাছে আইছি পুরুষ। তুমি ফিরাইয়া দিছ।'

'তোমার ভালর লেইগাই ফিরাইছি।'

তিলি হাসল। আস্তে আস্তে বলল, 'আ গো পুরুষ, মাইয়া মাইনষের কিসে ভাল কিসে মোন্দ, তা কি তোমরা বোঝ ? আমার ভাল-মোন্দ আমারেই বুঝতে দাও।'

একটু চুপচাপ।

তিলির ভেজা কাপড় থেকে টপ টপ করে ফোটায় ফোটায় জল ঝরছে। চুল, চোখের ভুরু, মুখ—সব সপসপে হয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো সিঁটিয়ে গেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপছে তিলি। কাঁপতে কাঁপতেই বলল, 'খাড়ইয়া খাড়ইয়া কী দ্যাখ পুরুষ, আমি এইদিকে টালকিতে (শীতে) কাইপা মরি। একখান কাপড় দাও।'

টিনের ছোট একটা বাক্স থেকে শুকনো একটা কাপড় বার করে তিলির হাতে দিল যোগেন।

তিলি বলল, 'হা কইরা তাকাইয়া দ্যাখ কী! যত বলদ (বোকা) নিয়া আমার কারবার। ড্যাবা ড্যাবা চোখে আমার দিকে তাকাইয়া থাক! সরম নাই। আমার দিকে পিছন দিয়া খাড়াও।'

অগত্যা তিলির দিকে পেছন ফিরে ডানদিকের বেড়ায় চোখ রাখল যোগেন।

একা মানুষ যোগেন। তার একার এই সংসার। ঘরে মেয়েমানুষ নেই যে তিলি ভিজে এলে শাড়ি যোগাবে। নিজের একখানা ধুতিই দিয়েছে সে। ক্ষিপ্র হাতে ভিজা শাড়ি বদলে শুকনো ধুতি পরে ফেলেছে তিলি। ভেজা শাড়িটা নিঙড়ে সারা শরীর মুছেছে।

তিলি বলল, 'এইবার মুখ ফিরাও পুরুষ।'

যোগেন ঘুরে দাঁড়াল।

তিলি এবার এক কাণ্ডই করল। আস্তে আস্তে যোগেনের কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, 'বার বার তুমি ফিরাইয়া দিছ। এইবার আর পারবা না।'

যোগেন জবাব দিল না।

যোগেনের বুকে একটা হাত রেখে ফিস ফিস করে তিলি বলল, 'ডর লাগে পুরুষ?'

'হু।' অস্ফুট শব্দ করল যোগেন।

'ডর আর সরম-ভরমের মাথা না খাইলে কি আমারে পাইবা!'

যোগেন চুপ করে রইল।

ক্ষ্যাপা বাতাস বৃষ্টির ছাটকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসছে। এতক্ষণে তিলির যেন হুঁশ হল। সে বলল, 'ইস্, ঘর একেবারে ভিজা গেল।' ছুটে গিয়ে ক্যাচা বাঁশের ঝাঁপটা বন্ধ করে দিল সে।

একটানা বৃষ্টি বঙ্গোপসাগরের এই উলঙ্গ বর্বর দ্বীপটাকে, শুধু কি দ্বীপটাকেই, যোগেনের এই ছোট্ট বেতপাতার ঘরটাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

বাইরে এই দ্বীপ যখন অন্ধ আদিম দুর্যোগে মেতে উঠেছে তখন ঘরের ভেতর যোগেন আর নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

বার বার এসেছে তিলি। বার বার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে যোগেন। কিন্তু আজ আর তাকে ফেরানো গেল না।

আন্দামানের বর্ষা শুধু মাটিকেই না, জীবনকেও বুঝি সরস এবং উর্বর করে তোলে।

বর্ষার আগে আগেই সিপি তোলার মরসুম শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সিপি তোলা শেষ হল বলেই কি কাজ শেষ হয়ে গেল! কাজ শেষ হতে হতে আবার মরসুম শুরু হয়ে যাবে।

সমুদ্র থেকে যে সিপিগুলো তোলা হল, এবার তাদের সাফ করার পালা। অ্যাসিড দিয়ে সেগুলোর ওপরকার চুন এবং নুন পরিষ্কার করতে হবে।

সিপি সাফ করার পর বাছতে হবে। যেগুলো কুলীন জাতের সিপি, যেমন টার্বো ট্রোকাস নাটিলাস, বাজারে যাদের চড়া দাম সেগুলোকে কাঠের বাক্সে বোঝাই করা হবে। জাহাজে উঠে তারা যাবে কলকাতা এবং মাদ্রাজ। কলকাতা-মাদ্রাজ থেকে আবার জাহাজে উঠবে। আন্দামান সমুদ্রের সিপি পৃথিবীর কোথায় কোথায় যে চলে যাবে অত খবর পানিকর রাখে না। এজেণ্টের কাছে বেচে দিয়েই সে খালাস।

স্নগ শেল, নী-ক্লাম—বাজারে যে সিপির দর কানাকড়িও না সেগুলো বিলিয়ে বিলিয়ে ফুরিয়ে ফেলবে পানিকর।

এখন সিপি সাফ করার কাজ চলছে।

একটানা বিশ দিন বৃষ্টির পর আকাশটা দিন দুই চুপচাপ রইল। থমথমে চেহারা দেখে মনে হল, আকাশ একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। যখন আবার ঢালতে শুরু করবে, এই দ্বীপ রেহাই পাবে না।

এর মধ্যেই ফাঁক বুঝে মায়া বন্দর থেকে ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে এসে উঠল পানিকর। এরিয়াল উপসাগরের পার থেকে পুরো ছ মাইল টিলা-জংগল ভেঙে থকথকে কাদা আর জোঁকের সংগে লড়তে লড়তে এসেছে সে।

কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে খাবলা খাবলা মাংস উঠে গেছে। সমস্ত শরীর রক্তারক্তি। কাদা আর জোঁকে মাখামাখি। পানিকরের হাল দেখে দুঃখও হয়, হাসিও পায়।

বারান্দায় বাঁশের পাটাতনে বসে চাল বাছছিল কাপাসী। পিঠটা উদাম, কাপড় সরে গেছে। ঘাড় আর গলার কাছে রাশি রাশি রুক্ষ তেলহীন চুল ছড়িয়ে রয়েছে। মুখটা ঠিকমত দেখা যায় না। চুলে ঢাকা পড়েছে। পালকের মত সরু কালো একটু ভুরু চোখে পড়ে।

শাড়ির লাল জমিতে চৌকো চৌকো সবুজ খোপ কাটা। শাড়িটা কাপাসীর সুঠাম চিকন কোমরে কি বশই না মেনেছে!

এখন দুপুর। আকাশ থেকে মেঘভাঙা রুপোলী রোদ এসে কাপাসীর গায়ে পড়েছে। উদাম পিঠ, রুক্ষ চুল, হাত, পাখির পালকের মত সরু ভুরু—সব চকচক করছে।

কাপাসীকে কেমন যেন দুর্বোধ্য দেখায়। শুধু দুর্বোধ্যই না, একটানা বিশ দিন বৃষ্টির পর দুপুরের মেঘভাঙা উজ্জ্বল রোদে অলৌকিক মনে হয়।

টিলা বেয়ে ওপর দিকে উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পানিকর। কাপাসীর চুল-হাত-পিঠই শুধু না, পানিকরের চোখ দুটোও চকচক করছিল।

পানিকর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই একটা চুগলুম গাছ। চুগলুমের পুরু পুরু বিরাট পাতায় বৃষ্টির জল আটকে ছিল। রোদ সেই জলকে পুরোপুরি শুষে নিতে পারে নি। বাকি যেটুকু আছে বাতাসের ঝাঁকানি খেয়ে ঝুপ ঝুপ করে পানিকরের গায়ে ঝরে পড়ল। তবু তার হুঁশ নেই।

একদৃষ্টে কাপাসীর দিকে তাকিয়ে আছে পানিকর। চোখদুটো চকচকই করছে না, অস্বাভাবিক জ্বলছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপাসীর উদাম পিঠটা দেখল পানিকর। তারপর একসময় টিলা বেয়ে ওপরে উঠে এল। আস্তে আস্তে ডাকল, 'কাপাসী—'

'কে ?' কাপাসী চমকে উঠল।

'আমি—আমি পানিকর—'

শাড়ির আঁচল দিয়ে পিঠটা ঢাকতে ঢাকতে কাপাসী বলল, 'পানিকর ভাই, আপনে আইছেন! আহেন আহেন।'

বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পানিকর। তার কিম্ভুত চেহারার দিকে চেয়ে মুখে কাপড় ঠেসে কাপাসী হাসে। পুরো হাসিটা বেরোয় না। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে কিছুটা বেরোয়, বাকিটা মুখের ভিতর উথলে উথলে উঠতে থাকে। গুজ গুজ শব্দ হয়। আটকানো হাসির দমকে কাপাসীর শরীরটা থরথরিয়ে কাঁপে।

বোকার মত পানিকরও একটু হাসে।

কাপাসী বলে, 'আপনের কী হাল হইছে পানিকর ভাই!'

পানিকর যেন কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করে, 'কি করবে! বারিষে মাটি গলে আছে। পা ফেললেই কোমর পর্যন্ত গেঁথে যায়। যা জোঁক! কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে চামড়া ছিঁড়ে গোস্ত আউর খুন বেরিয়ে পড়েছে।'

পানিকর আর কাপাসীর হাসাহাসি, কথা কওয়া-কওয়ির মধ্যেই নিত্য ঢালী এসে পড়ে।

বিশ দিন পর বৃষ্টি থামায় সকালে উঠেই একটা ঝাঁকি জাল নিয়ে ডিগলিপুরের খালে গিয়েছিল নিত্য ঢালী। ভুলা বোঝাই করে পার্শে, তারিণী, লাল ভেটকি আর মায়া—নোনা জলের মিঠে মাছ মেরে এনেছে। পানিকরকে

দেখেই মাছ আর জাল উঠোনে নামিয়ে রাখল নিত্য, ছুটতে ছুটতে তার সামনে এল। বলল, 'কখন আইলেন পানিকর বাবা?'

'এই তো এলাম চাচা—' পানিকর আগে আগে নিত্য ঢালীকে নিত্য বুড়ো ডাকত। আজকাল চাচা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে।

নিত্য ঢালী আবার বলল, 'বিহানে উইঠা মাছ মারতে বাইর হইছিলাম। বুঝলেন নি বাবা, বড় বাহারের মাছ। আইজ না খাইয়া যাইতে পারবেন না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—' পানিকর হাসল।

মেয়ের দিকে ঘুরে নিত্য বলল, 'পানিকর বাবায় খাইব। লাল ভেটকির পাতরি, আর পাইশ্যা মাছ দিয়া সউরষার ঝাল পাক করিস কাপাসী। মন দিয়া পাক করবি। এক ফের খাইলে য্যান পানিকর বাবায় ভুলতে না পারে।'

কাপাসী মুখে কিছু বলল না। মাথা ঝাঁকিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠোনের যেখানে জাল আর মাছ রেখেছে নিত্য, আস্তে আস্তে সেদিকে চলে গেল।

এবার পানিকরকে তাড়া লাগাল নিত্য ঢালী, 'চলেন, চলেন বাবা, গাও ধুইতে চলেন।'

কিছুক্ষণ পর বিলপও নদী থেকে একেবারে নেয়ে ঘরে ফিরল দু'জনে।

নিত্য ঢালীর দেওয়া একটা শুকনো কাপড় কোমরে জড়িয়ে জুত করে বাঁশের মাচানে বসল পানিকর। নিত্যও মুখোমুখি বসল।

পানিকর বলল, 'ক'দিন কি বারিষই না হল!'

'যা কইছেন বাবা, আমাগোও জলের দ্যাশ। হেই মাতানি নদী হের পারে ঘর। কিন্তুক এমুন বিষ্টি বাপের জম্মে দেখি নাই।'

পায়ের বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে অল্প অল্প হাসে পানিকর। বলে, 'এ আর কি বারিষ! আন্দামানের বারিষ বহুত বেতোবিয়ৎ। যখন মেজাজ হবে, একটানা দুমাস চলবে তো চলবেই।'

'ক'ন কী বাবা!'

'সচই বলি। সবে তো এসেছ। আমার কথা সচ্ কি ঝুট, নিজের আঁখেই দেখবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর পানিকরই আবার শুরু করল, 'আজ বারিষ থেমেছে। সকালে উঠে তোমার কথা মনে পড়ল চাচা। আর দেরি করলাম না। সিধা চলে এলাম।'

'ভাল করছেন বাবা, খুব ভাল কাম করছেন। বড় আনন্দ দিলেন। বড় আনন্দ পাইলাম। আমার কথা যে ভোলেন নাই, কি সুভাগ্যি!' খুশিতে নিত্য ঢালীর রুক্ষ খসখসে মুখটা টস টস করে। সে বলতে থাকে, 'কয়দিন আপনের দেখা নাই। দেখা হইব কেমনে! যা বিষ্টি! যাউক হে কথা। মনে মনে এই কয়দিন আপনের কথাই ভাবতে আছিলাম।'

'বহুত তাজ্জবের বাত!' অবাক হয়ে একটুক্ষণ নিত্য ঢালীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পানিকর। তারপর বলল, 'আমিও যে তোমার কথাই ভাবছিলাম চাচা—'

'ক্যান বাবা?' পা ঘষটাতে ঘষটাতে পানিকরের কাছে ঘন হয়ে এল নিত্য ঢালী। বলল, 'কিছু কাম আছে বাবা?'

'হাঁ হাঁ, অনেক দরকারী কাম চাচা।'

'তো ক'ন।'

ঘরের ঝাঁপটা খোলা। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঘের সঙ্গে যুঝে যুঝে এতক্ষণ রোদ আসছিল। এখন সূর্যটা ভাসন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

একটা ঘন ছায়ার পর্দা যেন উত্তর আন্দামানের এই দ্বীপটাকে ছেয়ে ফেলেছে হঠাৎ। অনেক দূরে উঁচু টিলা। টিলার ওপর বিরাট একটা গর্জন গাছ। গাছটার মাথায় ধোঁয়ার মত সাদা সাদা কি যেন জমেছে। আকাশ টিলা গাছ মেঘ সবই দেখা যায় কিন্তু অস্পষ্ট নিস্তেজ আলোতে মনে হয়, তাদের আরো কিছু মানে আছে। মানেটা যে কি, ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয়, তারা শুধু গাছ না, পাহাড় না, টিলা না, আকাশ না। সব মিলিয়ে পরম দুর্জ্ঞেয় একটা কিছু।

বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পানিকর। কি একটু ভেবে সে শুরু করল, 'দ্যাখো চাচা, কামে ঠিক সুবিধে হচ্ছে না। একা লা তো'কে দিয়ে হবে না। ভাবছি—'

'কা ভাবেন বাবা?'

'ভাবছি, তোমাকে মায়া বন্দর নিয়ে যাব।'

মায়া বন্দর যাবার নাম শুনে নিত্য ঢালী দমে গেল। একটা ঢোঁক গিলে বলল. 'কিন্তুক পানিকর বাবা—'

সতর্ক চোখে নিত্য ঢালীর মুখচোখ ভাবভঙ্গি লক্ষ করতে লাগল পানিকর। আস্তে আস্তে বলল, 'লেকিন কী চাচা?'

'আমি গেলে চলবে ক্যামনে? কাপাসীরে কার কাছে রাইখা যামু? কে এমুন নিজের জন আছে যে, কাপাসীরে দেখব। কেউ তো নাই।' বলতে বলতে একটু থামে নিত্য। টেনে টেনে শ্বাস নেয়। ভোঁতা খ্যাসখেসে গলায় ফের শুরু করে, 'শত্তুর, চাইর দিকে যেই মুখ দ্যাখেন, সেই মুখই আমার শত্তুরের মুখ। শত্তুর পুরীর ভিতরে মাইয়ারে রাইখা আমি মরতেও পারুম না পানিকর বাবা।'

'তবে—' চোখ কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলে একটুক্ষণ বসে থাকে পানিকর। আবার বলে, 'তবে কি হবে চাচা? লা তে তো একা একা এত সিপি সাফ করতে পারবে না। 'সীজন' ধরতে না পারলে খাব কী? সিপি চালান দিতে

না পারলে—' বলতে বলতে সে থেমে যায়।

খানিকক্ষণ কী ভেবে হঠাৎ নিত্য ঢালী বলে, 'একটা কাম করলে কেমুন হয় পানিকর বাবা?'

'কী কাম?'

'সিপিগুলান যদি আমার বাড়িতে আনেন। আপনে, লা তে, কাপাসী আর আমি, চাইর জনে মিলা সাফ করতে পারি।'

ওপরের পাটির দাঁত নিচের পুরু কালো ঠোঁটে গেঁথে ভুরু দুটো অল্প একটু কুঁচকে পানিকর বলে, 'তা হলে তো ভালই হয়। লেকিন দুটো কথা—'

'আবার কী কথা? কথা তো হইয়াই গেল। কাইলই আপনে সিপি লইয়া আমার এইখানে আইসা পড়েন।'

'আগে আমার কথাটা শোন চাচা। সিপি এখানে থাকলে তো আমাদেরও এখানে থাকতে হবে। না হলে রোজ মায়া বন্দর থেকে ডিগলিপুরে আসার বহুত ঝামেলা। এরিয়াল বে থেকে ছ মাইল জঙ্গল ভেঙে এখানে আসতে হয়। বড় তখলিফ—'

'হ-হ, হে কথা কইতে হইব নিকি! আমি জানি না, জঙ্গলের ভিতর দিয়া আইতে যে কত কষ্ট, রোজই ট্যার পাই।'

নিত্য ঢালী থামে না। এক দমে বলে যায়, 'যাওন আহনের কাম নাই। আপনেরা এইখানেই থাকবেন।'

'লেকিন—' পানিকরের দ্বিধান্বিত ভাবটা কিছুতেই আর ঘুচতে চায় না।

'আবার কী হইল বাবা?'

'রিফুজি কলোনীর কেউ যদি কিছু বলে! আমরা তো তোমাদের মুলুকের আদমী না। আমরা—'

এমনিতে নিরীহ শান্ত মানুষ নিত্য ঢালী। হঠাৎ সে ক্ষেপে উঠল, 'কোন হালায় কী কইব! কারো কওনের তোয়াক্কা করি? কেউ দুই পয়সা দিছে? কেউ এক বেলা খাওয়াইছে যে কারো কথার ধার ধারুম? আমার ঘর, আমার বাড়ি, যারে খুশি তারে রাখুম। কোন হালায় কথা কইতে আইব!'

দু হাত ধরে নিত্যকে শান্ত করল পানিকর। বলল, 'ঠিক আছে চাচা, ঠিক আছে। চটাচটি করো না। আমি সিপি আউর লা তে'কে নিয়ে কালই আসব।'

'হ-হ, কাইলই আইবেন। যত তরাতরি পারেন, আইবেন। কে কি কয়, একবার দেখুম।' নিত্য ঢালীর উত্তেজনা কমে না। সমানে চিল্লাতেই থাকে সে।

নিত্য হঠাৎ কেন যে ক্ষেপে উঠল, পানিকর জানে না। না জানলেও তার লোকসান নেই।

তরিবত করে রেঁধেছে কাপাসী। মায়া মাছ ভাজা, তারিণী মাছের রসা, সরষে দিয়ে লাল ভেটকি আর পার্শে মাছের টক।

রাঁধার গুণে জলের মাছে এমন স্বাদ এমন গন্ধ খোলে, না খেলে কোন দিন কি জানতে পারত পানিকর।

পানিকররা নিজেরাই যা পারে রেঁধেবেড়ে খায়। সিপি তুলতে তুলতে ফুরসত বুঝে মোটর বোট থামিয়ে উপসাগরের পারে ওঠে। তিন টুকরো ইঁট সাজিয়ে উনুন পেতে নেয়। ভাত ফোটায়, মাছ রাঁধে। আধা সিদ্ধ, আধা পোড়া, আধা কাঁচা, না তেল, না ঝাল, না ঠিকমত নুন—এমন এক বস্তু গিলে গিলে জিভ অসাড় হয়ে গিয়েছে।

আজ প্রচণ্ড খাওয়া খেল পানিকর।

খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দার পাটাতনে এখন পাশাপাশি বসেছে দু'জনে। পানিকর আর নিত্য ঢালী।

পানিকর ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বলে, 'বহুত খেয়েছি। একেবারে গলা পর্যন্ত ঠাসা। তোমার মেয়ে আচ্ছা পাকায় চাচা।'

'এই কি আর খাইলেন পানিকর বাবা, থাকত হেই দ্যাশ, যাইতেন আমার বাড়ি, বুঝতেন খাওন কারে কয়! হগলই কপালের লিখা বাবা—' অল্প একটু হাসল নিত্য ঢালী। মুখটা বিষণ্ণ করুণ উদাস দেখাল। এই মুহূর্তে সে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটিতে যেন নেই। হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মাতানি নদীর পারে ঢালীদের ছোট্ট গ্রামটিতে চলে গেছে।

একসময় ফিস ফিস করে নিত্য ঢালী বলল, 'কিছুই রইল না পানিকর বাবা। দ্যাশ গেল, ভিটা গেল, সাতপুরুষের হগল চিহ্ন গেল। হগল খুয়াইয়া এই দ্বীপে আইছি। পথের ভিখারী হইয়া গেছি বাবা। থাকত হেই দ্যাশ—' গলাটা ভারী হয়ে বুজে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

মৌসুমী বাতাসের তাড়া খেয়ে টুকরো টুকরো মেঘেরা পশ্চিম দিকে ফেরার হচ্ছে। আবার রোদ দেখা দিয়েছে। উজ্জ্বল ধারাল তেজী রোদ। মেঘভাঙা রোদ এমনিতেই বড় তীব্র। চোখে যেন বিঁধে যায়।

এখন ঠিক বিকেলও না, দুপুরও না। দুপুর আর বিকেলের ঠিক মাঝামাঝি। রোদের তেজ মরে নি কিন্তু রং বদলাতে শুরু করেছে। একটু আগে গলা রুপোর মত ঝকঝকে আলো ছিল। এখন তাতে হলদে আভা লেগেছে।

টিলা-জঙ্গল-পাহাড়-আকাশ—এখন সব কিছুই বড় স্পষ্ট, বড় তীক্ষ্ণ। একটু আগে আবছা আলোতে মনে হচ্ছিল তাদের অন্য কোন মানে আছে। কিন্তু এখন এই প্রখর রোদে সে সবের চারপাশ থেকে রহস্য সরে গেছে। মেঘম্লান আকাশের নিচে তাদের অস্তিত্বকে ছাপিয়ে একটা দুর্বোধ্য মানে হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু তীব্র আলোতে এখন তারা নিতান্তই আকাশ পাহাড় টিলা এবং জঙ্গল। একেবারেই নগ্ন, নিরাবরণ, উলঙ্গ।

পানিকর ডাকল, 'চাচা—'

'কী ক'ন বাবা ?' নিত্য ঢালীর গলাটা এখনও ধরা-ধরা। এখনও মাতামন নদীর পারের সেই গ্রামটার কথা ভেবে মনটা ভারী হয়ে আছে তার।

পানিকর বলল, 'তুমি যে বলছিলে, আমার সাথ তোমার কি যেন কাম আছে।'

'হ বাবা—' খাঁকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিল নিত্য ঢালী। আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল সে, 'চোখ টাটায়। হগলের পরান কচকচ করে। উই যে আপনে দুইটা পয়সা দ্যান, আমি যে গতর খাটাইয়া দুইটা পয়সা ঘরে আনি, কারো তা সয় না।'

পানিকর কিছুটা বুঝে, কিছুটা না বুঝে মাথা ঝাঁকায়। মুখে কিছুই বলে না।

নিত্য ঢালী থামে না, 'পানিকর বাবা, বুঝলেন কি না, চাইর পাশেই আমার শত্তুর। তা না হইলে উই যে উজানী বুড়ী, হারাইণার ঠাউরমা, আমার বাড়িতে আইসা আমার মাইয়ারে লষ্ট কয়, কুচরিত্তির কয়! আমি জানি, আড়ালে আবডালে কাপাসীরে হগলেই কুচরিত্তির কয়। কিন্তুক ভগমান জানে, মাইয়া আমার খাটি সোনা। তার ভিতর এতটুক দাগ নাই, খাইদ নাই।' বলে আর হাউ হাউ করে কাঁদে নিত্য।

সেই যে সেদিন উজানী বুড়ী বাড়িতে এসে ঝগড়া করল, কাপাসীকে নষ্ট-দুষ্ট-কুচরিত্তির বলে গেল, বাপ হয়ে কিছুতেই তা সইতে পারছে না নিত্য। দুঃখটা তার প্রাণে বড় বেজেছে।

কাপাসী কি সাধ করে শরীর নষ্ট করেছে ? সে কথা কেউ না জানুক, নিত্য তো জানে। জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক দুঃখের দামে সে কথা সে জেনেছে।

কে হারাণ, কে উজানী বুড়ী, কে নষ্ট, কে কুচরিত্তির—কিছুই বোঝে না পানিকর। হাঁ করে নিত্য ঢালীর হাউ হাউ কান্নার বিচিত্র শব্দ শোনে।

নিত্য বলতেই থাকে, 'হগলে আমার মাইয়ারে লইয়া পড়ছে। হে পাগল মানুষ। পাগল হইয়াও তার বাচনের জো নাই।'

পানিকর চমকে উঠল, 'পাগল, কে পাগল !'

'কাপাসী বাবা, আমার মাইয়া—'

'কাপাসী পাগল !'

'হ বাবা, এমনে বোঝনের উপায় নাই। ভাল মানুষ, থির ধীর। বুঝ বুদ্ধি আছে। কিন্তুক মাঝে মইধ্যে কেমুন জিনি হইয়া যায়। খালি হাসে।' গাঢ় মন্থর দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল নিত্য ঢালী। বিবন্ন করুণ স্বরে বলতে লাগল, 'হেই হাসি শুনলে বুকের ভিতরটা কাপে পানিকর বাবা।'

এর আগেও বার দু তিন ডিগালিপুরের এই সেটেলমেণ্টে নিত্য ঢালীর এই ঘরেই এসেছে পানিকর। কাপাসীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। কথাবার্তা হয়েছে। সহজ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতই কাপাসী তার সঙ্গে কথা বলেছে। তার যে মাথা খারাপ, সে যে পাগল, একবারও এ সন্দেহ পানিকরের মনে আসে নি। কাপাসীর মুখেচোখে, আচার ব্যবহারে, চলায় ফেরায় পাগলামির কোন লক্ষণই খুঁজে পায় নি সে।

রোদের রঙ এখন হলুদ। জঙ্গলের মাথা ঝিম মেরে আছে। সকালে যে পাখিরা সমুদ্রে গিয়েছিল, বিকেলে তারা দ্বীপমুখী হতে শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপ, নিঝুম জঙ্গল, নিবু নিবু হলুদ রোদ, দ্বীপে ফেরা পাখির ঝাঁক—সব মিলিয়ে গোটা চরাচর জুড়ে একটা শান্ত উদাস সুর যেন সাধা হচ্ছে।

হঠাৎ তাল কেটে গেল।

উঠোনের এক কিনারে রান্নাঘর। সেখান থেকে অবুঝ গলায় দমকে দমকে হেসে উঠল কাপাসী।

নিত্য ঢালী, পানিকর চমকে উঠল। নিত্য বলল, 'শুনলেন তো বাবা। এই হাসন, এই হাসন আমি সইতে পারি না। আমার বুকের ভিতরটা কেমুন জিনি করে। হা ভগমান—'

কপাল থাপড়াতে লাগল নিত্য। বলতে লাগল, 'হগলই আমার দোষে, আমার পাপে। বাপ হইয়া তারে বেড়া আগুনের হাত থিকা বাচাইতে পারলাম না, এই দুঃখু আমার মরলেও ঘুচব না।'

অনেকক্ষণ পর কপাল থাপড়ানি আর কান্না থামল। ঝিম মেরে বসে রইল নিত্য ঢালী। পানিকরও চুপচাপ। আর একটানা হেসে হেসে হয়রান হয়ে কাপাসীও থামল একসময়।

হঠাৎ নিত্য ঢালী বলল, 'কামের কথাখান কই পানিকর বাবা—'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'আপনেরে আমি বিশ্বাস করি। বাইচা থাকলে আমার পোলাও আপনের বয়সেরই হইত।' বলে একটু চুপ করল নিত্য ঢালী। মনের কথাগুলি আগে পরে ঠিকমত সাজিয়ে গুছিয়ে নিল। তারপর ফের শুরু করল, 'একটা কথা আমি শুনছি, কথাটা সত্য কিনা আপনে ক'ন দেখি।'

'কী কথা ?'

'পাগলগো নিকি হাসপাতল আছে ? হেইখানে চিকিচ্ছা করাইলে নিকি পাগলামি ব্যারাম সারে ?'

'হাঁ হাঁ—' পানিকর উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিকই শুনেছ চাচা। পাগলা গারদে পাঠালে কাপাসী জরুর সেরে উঠবে।'

'সত্য ক'ন বাবা ?'

'হাঁ হাঁ, সচ্—'

'কাপাসী আবার আগের লাখান হইব ?'

'হাঁ হাঁ—'

একটু চুপ।

কিছুক্ষণ আগে খানিকটা নিস্তেজ রোদ ছিল। এখন আর নেই। ছায়া ছায়া, ছে'ড়া ছে'ড়া মেঘ লম্বা পাড়ি মেরে দ্বীপের মাথায় আসতে শুরু করেছে। রোদ ঢাকা পড়েছে। সাগরপাখিদের আর দেখা যাচ্ছে না। টিলা-জঙ্গল-পাহাড় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

নিত্য ঢালী বলল, 'আপনে পাগলগো হাসপাতল চিনেন পানিকর বাবা ?'

'হাঁ চিনি।'

'তা হইলে কাপাসীরে বাচান বাবা, আমারে বাচান।' পানিকরের দু হাত জরিয়ে ধরল নিত্য ঢালী। করুণ গলায় বলল, 'আমরা আপনের গুলাম হইয়া থাকুম।'

'ডর নেই। আমি সব বন্দোবস্ত করব। তুমি দেখো চাচা, কাপাসী জরুর আগের মত হয়ে যাবে।'

'ঠিক তো বাবা ?'

'আরে হাঁ হাঁ—' পানিকর বলল, 'এবার উঠি। আমাকে আবার মায়া বন্দর ফিরতে হবে।'

পানিকর উঠে পড়ল। নিত্য ঢালীও সঙ্গে সঙ্গে উঠল। বলল, 'কাইলই সিপি আর লা তে'রে নিয়া আইবেন।'

পানিকর মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, আসবে।

দিন পাঁচেক হল পালসাহাব সেটেলমেণ্টে নেই। কি একটা কাজে পোর্ট ব্লেয়ার গেছে।

পালসাহাব থাকলে একটা কিছু সুরাহা হতই। দুর্ভাবনা করতে হত না। সে-ই সব সমস্যার সমাধান করে দিত।

কিন্তু চোখেমুখে এখন অন্ধকার দেখছে হারাণ।

উজানী বুড়ীর একটা মাত্র কাপড়। সেই কাপড়খানা ফেঁসে পিঁজে পিঁজে গেছে। মাঝে মাঝে ফালি ফালি গর্ত। এতাদন তালি দিয়ে সেলাই করে কোনরকমে চালিয়ে এসেছে। এখন আর উপায় নেই। কোথায় তালি মারবে? ক'টা গর্ত বুজোবে?

উজানী বুড়ী সোজাসুজি একবারও হারাণকে বলে না, 'আমার কাপড় ছিড়া গেছে। একখান নয়া কাপড় কিনা দে।'

না বলার কারণও আছে। বড় সাধ করে হারাণের সঙ্গে চন্দ্র জয়ধরের মেয়ে পাখির বিয়ে দিতে চেয়েছিল উজানী বুড়ী। কিন্তু শেষ বয়সের শেষ সাধটা মিটল না। হারাণ সিধে মুখের ওপর বলে দিয়েছে, পাখিকে বিয়ে করবে না। অথচ হারাণ বিয়ে করবে। বিয়ে করবে কাকে, না ঐ নিত্য ঢালীর নষ্ট-শরীর পাগল মেয়েটাকে। দুঃখটা প্রাণে বড় বেজেছে উজানী বুড়ীর। নিজের নাতিকে দিয়ে একটা সাধ মিটবে না, তার ওপর নিজের জোর খাটবে না, এ দুঃখ কোথায় রাখবে সে!

আজকাল বড় অবুঝ হয়ে উঠেছে উজানী বুড়ী। হারাণের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে। একটুতেই ক্ষেপে ওঠে। সোজাসুজি কাপড়ের কথা না বললেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে নানাভাবে কথাটা শোনায়।

আজ ভোরে উঠেই মাটির পাতিলে জাউ জ্বাল দিতে বসেছে উজানী বুড়ী।

পুব দিকটা আবছা আবছা। এখনও রোদ এই দ্বীপের মাথায় এসে পেঁছিতে পারে নি।

উনুনের মুখে শুকনো পাতা গোঁজে উজানী বুড়ী। দপ দপ করে পাতা পোড়ে। টগ বগ করে জাউ ফোটে।

ফুটন্ত জাউর দিকে তাকিয়ে বুড়ী বকতে থাকে, 'কে আছে আমার? কেউ নাই। এই যে একখান কাপড় দিয়া সারা বচ্ছর বারো মাস কাটাই, কেউ কি দ্যাখে? দ্যাখে না। কাপড়খান পিজা পিজা গেছে। এত বড় পিরথিমীতে

কেউ নাই আমার যে একখান কাপড় দিতে পারে, যে আমার সুখ-দুঃখু বোঝে।

ঘরের ভিতর বাঁশের মাচানে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল হারাণ। উজানী বুড়ীর বকবকানিতে ঘুম ছুটে গেল। জেগে গেলেও হারাণ উঠল না। চোখ বুজে কান খাড়া করে রইল।

উজানী বুড়ী থামে না, 'কাপড় নাই, অহন আমি সরম ঢাকি কেমনে? আমি তো কেউ না, গাঙ্গের জলে ভাইসা আইছি। যত আপন হেই লণ্ট পাগল মাগীটা!'

টেনে টেনে একটু দম নেয় উজানী বুড়ী। নতুন উদ্যমে আবার শুরু করে, 'হেই বান্ধবের কাপড় যদি ছিড়ত, এই ডিগোলিপুরের হগল মানুষ দেখত, কবে বাহারের শাড়ি আইনা গেছে। বান্ধবের লেইগা চুপে চুপে হগল আছে। বাহারের বাহারের শাড়ি, বাহারের বাহারের বেলাইজ (ব্লাউজ), গন্ধতেলের শিশারি। হগল কথাই কানে আহে। কালা তো আর হই নাই। কিন্তুক আমার বেলাতেই মুখ বেজার। আমার কাপড় যে ছিড়া গেছে, দেইখাও দ্যাখে না।'

ভোরে উঠেই নির্জলা মিথ্যা বকতে শুরু করেছে উজানী বুড়ী। কবে সে কাপাসীকে বাহারের বাহারের শাড়ি, বাহারের বাহারের জামা, গন্ধতেল দিল, ভেবেই পায় না হারাণ। কে যে এই সব কথা উজানী বুড়ীর কানে তোলে। সাত সকালেই মনটা ভার খারাপ হয়ে গেল হারাণের।

কতক্ষণ আর উজানী বুড়ীর বকবকানি শোনা যায়! মানুষের ধৈর্য বলে একটা কথা আছে। অগত্যা চোখ ডলতে ডলতে উঠে পড়ল হারাণ। নাঃ, আজ যেমন করে পারুক উজানী বুড়ীর জন্য একখানা কাপড় কিনে আনবেই।

পালসাহাব সেটেলমেণ্টে থাকলে ভাবনাই ছিল না। না থাকাতেই হয়েছে যত বিপদ। নিজের হাতে একখানা পয়সাও নেই হারাণের। কি যে সে করবে! এদিকে ঘরে টেকার উপায় নেই। যতক্ষণ নতুন কাপড় না আসবে ততক্ষণ বক বক করে উজানী বুড়ী তাকে জ্বালিয়ে মারবে।

ধারের আশায় আশায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেটেলমেণ্টের সব ঘরে হন্যে হয়ে ঘুরল হারাণ।

পরনের কাপড় আর প্রাণটা ছাড়া বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে কে-ই বা কী আনতে পেরেছে! কার ঘরে সোনাদানা মণিমাণিক্য রয়েছে যে ধার দেবে!

শেষ পর্যন্ত উদ্ধব বৈরাগীর কাছে পাঁচটা টাকা মিলল। সেই টাকা ক'টা সম্বল করে যোগেনকে সঙ্গে নিয়ে এরিয়াল উপসাগরের দিকে রওনা হল হারাণ।

মাস দুই হল, উপসাগরের পাড়ে একটা দোকান বসেছে। মালাবারী মুসলমান হাসমত আলীর দোকান। হাসমতের দোকানে চাল-ডাল-মশলা কাপড়চোপড়, সব মেলে। ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে এই একটাই মাত্র দোকান।

ছ মাইল চড়াই-উতরাই, টিলা-জঙ্গল ঠেঙিয়ে একবার গেছে, আবার ফিরেছে। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বেজায় হতাশ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হারাণ আর যোগেন।

সেটেলমেণ্টে ঢুকেই প্রথমে উদ্ধব বৈরাগীর ঘর। সেখানে আলো জ্বলছে। দূর থেকে খোলের আওয়াজ আর গানের সুর ভেসে আসছে।

জোরে পা চালিয়ে সরাসরি উদ্ধবের ঘরে এসে উঠল হারাণরা। ওখানে আসর বেশ জমে উঠেছে।

রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর, বুড়ী বাসিনী—সেটেলমেণ্টের অনেকেই এসে উদ্ধবের ঘরে জমা হয়েছে।

খোলাওি হয়েছে রসিক শীল। বাঁ হাতে বাঁ কান চেপে ডান হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে উদ্ধব গান ধরেছে ঃ

সব্ব অঙ্গ খাইও রে কাক
না রাখিও বাকি,
শুধু কিষ্ণ দরশন আশে
রেখো দুটি আখি।

তালের মাথায় মাথায় খোলে চাঁটি মারে রসিক শীল।

হারাণদের দেখে গান থামাল উদ্ধব। সঙ্গে সঙ্গে খোলের আওয়াজও থামল। উদ্ধব বলল, 'কি রে সোনা, কুন সময় ফিরলি ?'

বিরস গলায় হারাণ বলল, 'এই তো আইলাম।'

উদ্ধব হারাণের কাছে এগুতে এগুতে বলে, 'দেখি দেখি, ঠাউরমায়ের লেইগা কী কাপড় আনলি ?'

'কাপড় আনি নাই বৈরাগী দাদা। এই ধর তোমার টাকা।'

উদ্ধবের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে কাপড় কিনতে গিয়েছিল হারাণ সেটা ফেরত দিতে দিতে বলল, 'টাকা উধার (ধার) করলাম, কিন্তুক কামে লাগল না।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল উদ্ধব। আস্তে আস্তে বলল, 'ক্যান ? হইল কী ?'

'একখান মোটা কাপড়ের দাম চায় দশ টাকা।' হারাণ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'দশ টাকা দিয়া কাপড় কিনা আমার কাম না। এইবার থিকা ঠিক করছি, ন্যাংটাই থাকুম। ঠাউরমায়েরে গিয়া কমু, কাপড়ের আশা ছাড় বুড়ী।'

গানের আসরের তাল আগেই কেটে গিয়েছিল।

রসিক শীল, বুড়ী বাসিনী, চন্দ্র জয়ধর—সবাই হারাণ আর উদ্ধবের কথা শুনছে।

উদ্ধব বলল, 'ক'স কি হারাণ, একখান মোটা কাপড়ের দাম দশ টাকা!'

'ঠিকই কই বৈরাগী দাদা, বিশ্বাস না হয় জামাইরে জিগাও।' যোগেনকে আস্তে ঠেলা মেরে হারাণ বলল, 'সত্য মিথ্যা তুমিই কও জামাই।'

যোগেন সায় দিয়ে বলল, 'হ, হাসমত মিয়া ঐ দামই চাইল।'

'সব্বনাশ!' অদ্ভুত একটা শব্দ করল উদ্ধব।

খানিকটা সময় সবাই চুপচাপ।

হঠাৎ চন্দ্র জয়ধর বলল, 'হাসমত মিয়ার কাছে গলাকাটা দাম। কয়দিন আগে মাইয়ার লেইগা একখান শাড়ি কিনতে গেছিলাম। পনের টাকা দাম চায়। দিন পাইছে. ডিগলিপুরে আর দোকানও নাই। পরাণে যা চায়, মুখে যে দাম আহে, হেয়াই কয়।' একটু থামে চন্দ্র। আবার শুরু করে, 'মিয়া ভাই জানে, যে দাম কইব হেই দামেই মাল কিনতে হইব। জানে, তার দোকানে না গিয়া গতি নাই।'

কথায় কথা বাড়ে।

রসিক শীল বলল, 'সুযুগ পাইয়া কাপড়, চাউল ডাইল মশল্লা, হগল জিনিসের দাম চড়াইয়া দিছে হাসমত। অত চড়া দরে মাল কিনতে হইলে আমাগো লাখান গরীব কি বাচে?'

উদ্ধব বলল, 'তা হইলে উপায় কী? বিহিত কী?'

এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি বুড়ী বাসিনী। এক কোণে বসে মুখ বুজে সকলের কথা শুনছিল। এবার সে বলল, 'পালসাহাব কোলোনিতে নাই। হে না ফিরা ইস্তক কুনো বিহিত হইব না। আগে হে আহুক, একটা উপায় হইবই।'

আরো তিন দিন পর পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফিরে এল পালসাহাব। সব শুনে বলল, 'হাসমত শালে একটা ডাকু।'

রসিক শীল বলল, 'এত দরে তো মাল কিনা যায় না।'

'জরুর যায় না।'

পালসাহাব ক্ষেপে উঠল, 'এই ডিগলিপুর আমার এলাকা, এখানে অত মুনাফাবাজি চলবে না। হাসমত কুত্তার জান তুড়ব।' নাকের ফুটো দিয়ে পাঁশুটে রঙের অনেকগুলো রোঁয়া বেরিয়ে পড়েছে। উত্তেজনায় সেগুলো নড়তে লাগল। ঘোলাটে বাদামী রঙের চোখদুটো ধক ধক করছে। ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হাতের মুঠি দুটো কি একটা আঁকড়ে ধরার জন্য বার বার পাকিয়ে যাচ্ছে পালসাহাবের।

হঠাৎ উঠে একটা জখমী জানোয়ারের মত পায়চারি করতে লাগল পালসাহাব। তারপর হঠাৎই থেমে চিল্লাতে শুরু করল, 'আঁই হারাণ, আঁই যোগেন, আঁই গুপী—চল্, হাসমত শালের দোকান তুড়ে দিয়ে আসি।'

বুড়ী বাসিনী ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল। ধীর স্থির শান্ত মানুষ সে। বয়সের গুণেই হোক আর যে কারণেই হোক, মাথাটা সব সময়ই তার ঠাণ্ডা।

বাসিনীকে দেখে পালসাহাব বলল, 'এই যে মাঈ, তুই কুছু বলবি?' আজ-

াল বাসিনীকে মাঈ ডাকে পালসাহাব।

বাসিনী বলল, 'হ বাবা, আমি কিছু কইতে চাই।'

'বল্ বল্—' বাসিনীর পাশে এসে দাঁড়াল পালসাহাব।

'কমু, কিন্তুক রাগ করতে পারবেন না সাহেব বাবা।'

'আরে না না, রাগ করব না। তুই আমার মাঈ। তোর ওপর রাগ করতে ারি!' বলতে বলতে হেসে ফেলল পালসাহাব। বলল, 'তোদের ওপর আমি খন তখন রাগ করি, তাই না? কি করব, মেজাজটা ইতনা খারাপ হয়ে গেছে! াক, এবার তোর বাত শুরু কর মাঈ।'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'হাসমত মিয়ার দোকান ভাইঙ্গা দিয়া কি হইব? কিছু ্রাহা হইব না। আমাগো অন্য উপায় দেখতে হইব।'

'কী উপায়?' একদৃষ্টে বাসিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল পালসাহাব।

'আমি কই কি বাবা, এই ডিগলিপুরের কোলোনিতে আমরা তো এত ানুষ রইছি—'

'হ্যাঁ, ও তো ঠিক বাত। লেকিন তাতে হল কী?'

'আমারে কথাটা পুরা করতে দ্যান।'

'হাঁ হাঁ, তুই বল মাঈ।'

বাসিনী বলতে থাকে, 'আমরা এত মানুষ আছি। তবু আমাগো দোকান-পসার, হাট-বাজার নাই। এইখানে একখান হাট বহাইলে কেমুন হয়?'

'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব।' দু হাতে বুড়ী বাসিনীকে জড়িয়ে ধরল পালসাহাব। বলল, 'এ্যায়সা এ্যায়সা কি তোকে মাঈ বলি! ঠিক মতলব ঠিক সময় তুই বাতলে দিস।'

এর পর হাট-বাজার দোকান-পসার সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

এমনিতে কারো হাতেই টাকা পয়সা নেই। অথচ মূলধন ছাড়া ব্যবসা হয় কেমন করে?

ঠিক হল পালসাহাবই সব ব্যবস্থা করবে।

নিজে জামিন দাঁড়িয়ে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ধারে মাল এনে দেবে। মাল বেচার পর দোকানীরা মহাজনকে টাকা শোধ করে আসবে।

হাট বসার কথাটা পাকা হয়ে গেল।

দিন কয়েকের মধ্যেই ডিগলিপুরের খালের পার ঘেঁষে খান পাঁচেক ছোট ছোট দোচালা ঘর উঠল। বাঁশের খুঁটির মাথায় বেতপাতার চাল।

এটাই হাট।

উজানী বুড়ীর কাপড়ের দৌলতে ডিগলিপুরের সেটেলমেন্টে হাট বসে গেল।

বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে যারা উপনিবেশ গড়তে এসেছে এতদিন মনে হত তারা এক, অভিন্ন। তাদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। বউ বাচ্চা, জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ—সবাই মিলে মানুষের একটা পিণ্ড। কিন্তু পায়ের নীচে মাটি আর মাথার ওপর ছাউনি পেয়ে তাদের অন্য স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে।

একমাত্র উপনিবেশ গড়ার ব্যাপারেই তারা একত্র হয়। না হলে প্রত্যেকটি মানুষই তার মন অনুভূতি সুখ কি দুঃখ নিয়ে এই দ্বীপের মতই আলাদা আলাদা, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। এক এক জনের সমস্যা এক এক রকম। একজনের স্বভাব চরিত্র কি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্যের আদৌ মিল নেই।

দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন হয়েও প্রতিটি মানুষ দু জায়গায় এক। প্রথমত উপ-নিবেশ গড়ার কাছে। দ্বিতীয়ত পালসাহাবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায়। কেউই তার অভিযোগ নালিশ দুঃখ হতাশা কি আনন্দের কথা পালসাহাবকে না জানিয়ে পারে না।

এই দ্বীপের সব মানুষের সমস্ত দুঃখ সুখ এবং জীবনবোধের ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে একজন মাত্র মানুষ। সে পালসাহাব। নিয়তির মত, অমোঘ বিধানের মত এই মানুষটিকে কোনোমতেই অতিক্রম করা যায় না।

পালসাহাবকে ঘিরেই বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে জীবন গড়ে উঠছে।

শেষ পর্যন্ত কুমীকেও পালসাহাবের কাছে আসতে হল।

ডিগলিপুর সেটেলমেণ্টে কুমীর মত চরিত্র নেই।

কুমী বিধবা সধবা না কুমারী, বুঝবার জো নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই কিন্তু ডান হাতে এক গাছি শাঁখা আছে। একহারা চেহারা। থ্যাবড়া নাক, গোল মুখে হনু দুটো খাড়া হয়ে আছে। চারকোণো থুতনি। চেহারা দেখে বয়স আন্দাজ করার উপায় নেই। কুমী যদি না বলে দেয়, তা হলে তিরিশও মনে হতে পারে, আবার চল্লিশ ভাবতেও দোষ নেই।

ওপর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বড় সোজা মানুষ কুমী। কিন্তু চোখের দিকে তাকালেই ধারণা বদলে যায়। অমন ধূর্ত চোখ হাজারে একটা দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

কুমীর চোখের তারাদুটো খাঁচার পাখির মত ছটফট করে। খাঁচার পাখি হয়ত ঠিক নয়, উপমা হওয়া উচিত চরকি। চরকির মতই ছোটাছুটি করে।

সরু কোমরের নীচে ভারী মাংসল নিতম্ব। সেই নিতম্ব দুলিয়ে দুলিয়ে ডিগালিপুরের সেটেলমেণ্টে ঘুরে বেড়ায় কুমী।

কোনোদিন হয়ত সাদা একখানা থান পরে বেরুল। হাতে শাঁখা নেই। চুলগুলি মাথার উপর থুপথাপ করে বাঁধা।

কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করল, 'এই আবার কোন্ বেশ!'

অল্প একটু হেসে কুমী বলে, 'যুগিনী সাজলাম।'

আবার কোনোদিন টকটকে লাল ডুরে শাড়ি পরে, হাতে কাচের চুড়ি দিয়ে, পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে চলল।

সেদিনও হয়ত কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'এই আবার কোন বেশ!'

চোখের তারা দুটো ঘুরিয়ে কোমরের খাঁজে ঢেউ তুলে কুমী বলে, 'আইজ মুহিনী সাজলাম।'

ওপর থেকে দেখে যে কুমীকে খুব খারাপ মনে হয় না, তার ভিতরে ডুব দিতে পারলে যা পাওয়া যাবে তা হল কতকগুলি মারাত্মক প্যাঁচ।

কুমীর চামড়ার নিচে বুঝি বা রক্ত মাংস কি হাড় নেই। জটিল কুটিল অসংখ্য প্যাঁচ সেখানে ঠাসা।

সেটেলমেণ্টের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় কুমী। কোন্ ঘরের সোয়ামী আর স্ত্রীতে বনিবনা নেই, দেশভাগের পর কোন ঘরের মেয়ের শরীর নষ্ট হয়েছে, কোন ঘরের বউ নিশি রাতে নাগরের কাছে ঢলাতে যায়, ঘুরে ঘুরে এই সব খবর সে যোগাড় করে। দিনরাত এই-ই তার কাজ। এতেই তার চরম সুখ। মাছির মতই মানুষের জীবনের ঘা-গুলি খুঁটে খুঁটে আনন্দ পায় কুমী।

একটা ব্যাপার অনেকদিন ধরে দেখে দেখে, নিঃসন্দেহ হয়ে শেষ পর্যন্ত পালসাহাবের কাছে এল কুমী।

এখন দুপুর।

একটানা তিন মাস বর্ষার পর রোদ উঠেছে। উজ্জ্বল ধারাল তীব্র রোদ।

ঝুপড়ির সামনে বসে লাল খয়েরী হলুদ—নানা রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে চালু লাইন (এক ধরনের বঁড়শি) তৈরি করছিল পালসাহাব। কাল সকালে সে এরিয়াল উপসাগরে মাছ মারতে যাবে।

চালু লাইন বানাচ্ছিল আর গুন গুন গুন করে গাইছিল পালসাহাব:

ভোরের তোরঙ্গ উঠল
উসকো লিয়ে কি
লাও ডুবাবে?

এমন সময় কুমী এসে ডাকল, 'পালসাহাব—'

গান থামিয়ে চমকে উঠল পালসাহাব। বলল, 'কোন?'

'আমি কুমী—'

লাল লাল দাঁত বার করে একটু হাসল পালসাহাব। বলল, 'ও, তুই—মুহিনী-যুগিনী (মোহিনী-যোগিনী)। আয় আয়, বস।' পালসাহাব কুমীকে মুহিনী-যুগিনী ডাকে।

পালসাহাবের পাশ ঘেঁষে ঘন হয়ে বসল কুমী।

পালসাহাব শুধলো, 'কিছু কথা আছে?'

'হ বাবা।'

'বল্, বলে ফ্যাল্—'

সতর্ক চোখে চারদিক দেখে কুমী শুরু করল, 'কথাটা কিন্তুক গুপন (গোপন)—'

'হাঁ হাঁ, বল্ না তুই—' চালু লাইন বানানো বন্ধ রেখে কুমীর মুখের দিকে তাকাল পালসাহাব।

একটা ঢোক গিলল কুমী। প্রচুর উৎসাহ নিয়ে কথাটা বলার জন্য পালসাহাবের কাছে এসেছিল। কিন্তু এখন সাহস হারিয়ে ফেলছে।

পালসাহাব তাড়া লাগাল, 'কী হল রে?'

আবছা গলায় কুমী বলল, 'কিন্তুক—'

এবার পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, লেকিন ফেকিন কুছ নেহী। জলদি কর শালী।'

কি ভেবে কুমী হঠাৎ উঠে পড়ল।

পালসাহাব বলল, 'উঠলি যে?'

কুমী জবাব দিল না। পালসাহাবকে পিছনে রেখে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিল।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল পালসাহাব। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে গিয়ে কুমীকে ধরে ফেলল।

কুমীর একটা হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে ঝুপড়িটার সামনে নিয়ে এল পালসাহাব। চিল্লাতে লাগল, 'মাগী মুহিনী-যুগিনী, বাত বলতে এসে না বলে চলে যাবি! ও হবে না।'

ভীত চোখে পালসাহাবের দিকে তাকাল কুমী। বলল, 'কমু, হগল কথা কমু। কিন্তুক আইজ না। অন্য দিন।'

'আজই তোকে বলতে হবে, আভী বলতে হবে।' এক ঝটকায় কুমীকে বসিয়ে দিল পালসাহাব। বলল, 'দিল্লাগী পেয়েছিস! বল্ শালী।'

একটুক্ষণ চুপচাপ।

নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করে নিল কুমী। তারপর শুরু করল, 'হে কথা কইতে বড় সরম লাগে পালসাহাব। আপনে সামনে রইছেন—' কথা পুরা না করেই থেমে গেল কুমী।

পালসাহাব বলল, 'আমি সামনে থাকলে সরম লাগে?'

'হ পালসাহাব।'

'তা হলে আমার দিকে পিছন ফিরে বস।'

কথামত বসল কুমী।

পালসাহাব বলল, 'এবার বল্—'

কুমী বলল, 'কথাটা কিন্তুক বড় গুপন। আপনে বিশ্বাস করবেন না।'

'হাঁ হাঁ গোপন। তোর কথা জরুর বিশোয়াস করব। বল্ তুই।'

অনেক ভনিতার পর কুমী বলল, 'উই হরিপদর বউ তিলি, উই মাগীর কথা—'

'উই মাগী কী করল?'

'কী করতে বাকী রাখছে?' উত্তেজনায় ঘুরে বসল কুমী। ফিস ফিস করে বলল, 'উই মাগী লষ্ট—'

'লষ্ট!' পালসাহাব চমকে উঠল।

'হ পালসাহাব, উই মাগীর শরীল লষ্ট হইয়া গেছে।'

'বুঝলি কেমন করে?

'কী যে কন বাবা, সারা জনম এই কইরা কাটাইলাম।' বলে চোখ মটকাল কুমী। ধূর্ত শব্দ করে একটু হাসল। বলল, 'পালসাহাব, আমার চৌখেরে ফাকি দিয়া লাগর লইয়া চলাইব ওমুন মাগী ডিগালিপুরের এই কোলোনিতে নাই।'

একদৃষ্টে কুমীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পালসাহাব। নাকের রোঁয়াগুলো একটু একটু নড়ছে।

এবার পালসাহাবের কানে মুখটা গুঁজে দিল কুমী। গলা নামিয়ে বলল, 'রোজ রাইতে যহন পিরথিমী ঘুমে নিঝাম হইয়া থাকে তহন তিলি লাগরের কাছে যায় পালসাহাব।'

'লাগরটা কোন শালা?'

'উই জামাই।'

'জামাই! যোগেনের কথা বলছিস?'

'হ বাবা—'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'ঝুট বাত।'

একটু সরে বসল কুমী। বলল, 'মিছা আমি কই না পালসাহাব। নিজের চৌখে রাইতের পর রাইত তিলিরে জামাইর কাছে যাইতে দেখছি। চৌখে তো আর ছানি পড়ে নাই। নিজের চৌখেরে অবিশ্বাস করি কেমনে?'

'শালী তোর মুখে যত বদ কিস্‌সা। ভাগ মাগী—' পালসাহাব ক্ষেপে উঠল।

আশ্চর্য! কুমী ভয় পেল না। কোমরে ক্ষিপ্ত একটা মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এইর এট্টা বিহিত করলেন না পালসাহাব। ভুল করলেন, জবর ভুল করলেন।'

'যা মাগী, আভী আমার আঁখের সামনে থেকে ভাগ—'

'যাই বাবা, যাই—' পালসাহাবের ঝুপড়ির সামনে ঢালু উতরাই। সেটা বেয়ে নামতে নামতে কুমী বলল, 'আইজ আমারে খেদাইয়া দিলেন। কিন্তুক আমি আবার আহুম। ফিরা ফিরা আহুম।'

'যা শালী তোর কোন বাত আমি শুনতে চাই না।'

'শুনবেন বাবা, এক শ বার শুনবেন। শুনতে হইবই।' হিক্কার মত শব্দ করে টেনে টেনে হাসতে লাগল কুমী। বলল, 'অহন আমার কথা তিতা লাগে। কিন্তুক যেই দিন ফল ফলব, হেই দিন বুঝবেন, মিঠা কথাই কইছিলাম। হেই দিন ফল ফলনের খবর দিতে আহুম বাবা।'

মাথাটা বাঁকিয়ে চুলিয়ে, দুলিয়ে ঘুরিয়ে উতরাই বাইতে বাইতে নিচের দিকে নেমে গেল কুমী।

৪০

পানিকর সেই যে বলে গিয়েছিল সিপি আর লা তে'কে নিয়ে কালই এসে পড়বে তা আর হয়ে ওঠে নি। কানখাজুরার (চেলা জাতীয় সরীসৃপ) কামড় খেয়ে পুরো দু মাস ভুগল সে। কানখাজুরার বিষে সমস্ত শরীটা নীল হয়ে গিয়েছিল।

মায়া বন্দর থেকে পানিকরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পোর্ট ব্লেয়ারের হাসপাতালে। সেখান থেকে খানিকটা সুস্থ হয়ে কাল রাত্রে মায়া বন্দরে ফিরে এসেছে পানিকর। আর আজ সকালেই 'নটিলাস' বোটটা সিপিতে সিপিতে বোঝাই করে লা তে'কে সঙ্গে নিয়ে ডিগলিপুর রওনা হল সে।

পানিকররা নিত্য ঢালীর ঘরে এসে যখন পৌঁছল তখন বিকেল।

এখন রোদের তাপ কম, জেল্লা বেশি। উজ্জ্বল রোদে চারপাশের জঙ্গলের গাঢ় সবুজ মাথাগুলি জ্বলছে।

দাওয়ার পাটাতনে বসে ভুক ভুক করে তামাক টানছিল নিত্য ঢালী। বুড়ো বয়সের মুষ্টিযোগ বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, চড়াই বেয়ে আগে আগে আসছে পানিকর। তার পেছনে বিরাট একটা টিনের তোরঙ্গ মাথায় চাপিয়ে লা তে।

পানিকরদের দেখে হুঁকো নামিয়ে নিত্য ঢালী ছুটে এল। বলল, 'আহেন পানিকর বাবা, আহেন।'

পানিকরকে নিয়ে দাওয়ায় গিয়ে বসল নিত্য।

উঠোনের এক ধারে টিনের তোরঙ্গটা নামাল লা তে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে নিত্য ঢালীর পাশে গিয়ে বসল।

নিত্য বলল, 'হেই যে কইয়া গেলেন রাইত পুয়াইলেই আইবেন, আর তো আইলেন না। দিনের মনে দিন যায়। রাইতের মনে রাইত যায়। কাপাসী আর আমি এট্টা এট্টা কইরা দিন গনি (গুনি)। দিন গনি আর চিন্তায় মরি! কিন্তুক কই পানিকর বাবা!'

'কী করব চাচা! আমাকে কানখাজুরায় কাটল। পুরো দুটো মাস সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) কাটালাম।'

'বেশ মানুষ আপনে।' বেজার মুখে নিত্য ঢালী বলতে লাগল, 'আমরা যে এই ডিগলিপুরে আছি, এট্টা খবর তো পাঠাইতে হয়। আসলে আপনে আমাগো আপনজন ভাবেন না। আমরা পানিকর বাবা পানিকর বাবা কইরা মরলে কি হইব!' কথাগুলির মধ্যে প্রাণের তাপ রয়েছে।

পানিকর কিছু বলল না, অল্প একটু হাসল।

নিত্য ঢালী আবার বলল, 'অহন কেমুন আছেন পানিকর বাবা?'

'এখন তবিয়ত ভালই—' পানিকর বলতে থাকে, 'তবে কানখাজুরার বিষে কাবু হয়ে পড়েছি।' বলতে বলতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল পানিকর, 'এরিয়াল বে'তে মোটর বোট বেঁধে এসেছি। বোটে আরো সিপি আছে। সিপিগুলো আনতে হবে।

চুপচাপ দুই হাঁটুতে থুতনি গুঁজে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল লা তে। পানিকরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বলল, 'আমি যাই মালেক, সিপিগুলো নিয়ে আসি।'

কোনো ব্যাপারেই ক্লান্তি নেই লা তে'র। দিনরাত সে অসুরের মত খাটতে পারে। খানিকক্ষণ আগেই ছ মাইল পাহাড় জঙ্গল ঠেঙিয়ে বিরাট একটা টিনের তোরঙ্গ নিয়ে এসেছে। একটু জিরিয়েই সব অবসাদ ঝেড়েঝুড়ে আবার সিপি আনতে ছুটছে। তার ধাতে চুপচাপ বসে থাকা নেই। একটা কিছু না কিছু নিয়ে সব সময় মেতেই আছে সে। তার মধ্যে এমন একটা প্রাণশক্তি আছে, যা কোনো সময় ফুরোয় না।

পানিকর বলল, 'তুই কি এত সিপি আনতে পারবি লা তে?'

'এক দফে পারব না। বার বার গিয়ে আনব।'

'তবে যা।'

সামনের উতরাই বেয়ে লা তে চলে গেল। সে চলে যাবার পর চনমনে চোখে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল পানিকর।

নিত্য ঢালী বলল, 'কি খোজেন পানিকর বাবা?'

'কুছু না, কুছু না—' পানিকর নিত্য ঢালীর দিকে মুখ করে বসল।

নিত্য ঢালী বলল, 'আপনেরা আইলেন, ভালই হইল। এইবার কামের কথা কওয়া যাউক।'

'হাঁ হাঁ চাচা, বল—'

'কই কি, আমার তো একখান মোটে ঘর। এক ঘরে এত জনের জায়গা হইব না।'

'ঠিক বাত, ঠিক বাত—' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে পানিকর। নিজের অজান্তেই এদিক সেদিক তাকাতে থাকে।

পানিকরকে চারদিকে তাকাতে দেখে মনে মনে কি একটু ভেবে নেয় নিত্য ঢালী। ফিস ফিস করে বলে, 'কিছু দরকার পানিকর বাবা?'

'অ্যাঁ, নেহী নেহী—'

চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নেয় পানিকর। নিজের মতলবটা এত তাড়াতাড়ি ফাঁস করতে রাজী নয় সে। কিছুক্ষণ পর শুধোয়, 'বল চাচা, কি যেন বলছিলে--'

'হ বাবা, কই।' পানিকরের ভাবগতিক ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না নিত্য ঢালী। সে বলতে থাকে, 'এক ঘরে তো এত জনের কুলাইব না। আর একখান ঘর বানাইয়া লইতে হইব।'

'হাঁ, জরুর।' ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে পানিকর সায় দিল, 'তুমি কোঠি বানাও চাচা। যা খরচ লাগে আমি দেব।'

নিত্য ঢালী উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'কাল থিকাই ঘর বানান শুরু করুম।'

'বহুত আচ্ছা।'

খানিকটা এ-কথা সে-কথার পর আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে পানিকর। নিত্য ঢালীর ঘরের আনাচ কানাচ, উঠোন, দূরের ঢালু উতরাই—চারপাশে তার চোখদুটো চরকির মত ঘুরতে থাকে।

নিত্য ঢালী বলে, 'কী দ্যাখেন বাবা?'

'কুছু না, কুছু না।' পানিকর ভালমানুষের মত মুখ করে নিত্যর দিকে তাকায়।

নিত্য ঢালী নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'আপনেরা আইলেন, বড় ভাল হইল, বড় বাহারের হইল। কত বল ভরসা পাইলাম।'

'হাঁ—'

'পাচ মুখে পাচ কথা রটব—'

'হাঁ—'

'কিন্তুক আমি কারোরে ডরাই না। ক্যান ডরামু? আমি কি কারো কাছে দুই খান পয়সা ধারি? না কেউ দুই দিন আমারে খাওয়াইছে? উল্টা আমার ঘরে আইসা আমার মাইয়ার নামে আকথা কুকথা কইয়া যায়।' বকতে

বকতে হঠাৎ হুঁশ হল নিত্য ঢালীর। পানিকর তার কথা শুনছে না। অগত্যা বকবকানি থামিয়ে সরাসরি পানিকরের চোখের দিকে তাকাল সে।

দূরে উতরাইর দিকে তাকিয়ে আছে পানিকর। এক দৃষ্টে কি যেন দেখছে। তার চোখ দুটো ধক ধক করছে।

কী দেখছে পানিকর? তার দেখাদেখি উতরাইয়ের দিকে চোখ ফেরাল নিত্য ঢালী।

খানিকটা আগে জল আনার জন্য কিলপণ্ড নদীতে গিয়েছিল কাপাসী। ভেজা কাপড়ে কাঁখে কলসী নিয়ে এখন উতরাই বেয়ে উঠে আসছে সে। কলসী থেকে জল ছলকে ছলকে পড়ছে।

কাপাসীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার পানিকরের দিকে তাকাল নিত্য ঢালী। সোজা সহজ মানুষ সে। তবু কিছু একটা আন্দাজ করল। একটা কিছুর গন্ধ পেল যেন।

৪১

বর্ষা নামার আগে লাঙলের ফলায় ফলায় জমি চৌরস হয়ে গিয়েছিল। তারপর বীজদানা বোনা হয়েছিল।

কিন্তু লাঙল দিয়েও জঙ্গল পুরোপুরি মারা গেল না। হাজার হাজার বছর ধরে এই দ্বীপের অস্তিত্বের সঙ্গে অরণ্য মিশে আছে। এত সহজে একবার মাত্র লাঙল চালিয়ে সেই অরণ্যকে উৎখাত করা যায় না।

বর্ষার মেয়াদ ফুরিয়েছে। মাটির গর্ভ চিরে চিরে মাথা তুলেছে সবুজ নধর ধানের চারা।

দ্বীপের কুমারী মাটি এই প্রথম গর্ভিণী হয়েছে। সেই গৌরবে উত্তর আন্দামান লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে।

যতদূর তাকানো যায়, গাঢ় সবুজ রঙের ধানবন। ধানের গোছাগুলি কি সতেজ, কি পুষ্ট! ধানগাছ দেখেও সুখ।

কিন্তু পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ সুখ বলে বুঝি কিছুই নেই। সুখের সঙ্গে চিরদিনই দুঃখের খাদ মেশানো। না হলে ধানের সঙ্গে সঙ্গে কেন হাওয়াই বুটি জলডেঙ্গুয়া আর নানান জাতের আগাছা মাথা তুলবে?

সারাদিন ডিগলিপুরের বাসিন্দারা জমিতে নিড়ান দেয়। আগাছা পরিষ্কার করে। জলডেংগুয়া আর হাওয়াই বুটির চারাগুলি শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে। ধানের পাশে আগাছা থাকলে ফসলের জোর কমে যাবে।

সমস্ত দিন নিড়ান দিয়ে' সন্ধের মুখে সবাই জমি থেকে উঠে কিলপণ্ড নদীতে যায়। পাহাড় ফুঁড়ে নেমে আসা ঠাণ্ডা হিমাক্ত জলে গায়ের মাটি ধুয়ে সরাসরি উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে গিয়ে জমা হয়।

সরকার থেকে খোল করতাল দিয়েছে। উদ্ধবের ঘরে সারাদিন কাজকর্মের পর গানের আসর বসে।

গানের ব্যাপারে ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের প্রচুর উৎসাহ। সমস্ত দিন খাটুনির পর যে জীবনীশক্তি তারা ক্ষয় করে, এই গানের আসরে এসে আবার তা ফিরে পায়। এখানে এসে ক্লান্ত অবসন্ন শ্রান্ত মানুষগুলি সতেজ হয়ে ওঠে।

গানের ব্যাপারে সবচেয়ে যার বেশি উৎসাহ সে হল পালসাহাব। পাল-সাহাব আজ নেই। সেটেলমেন্টের কি একটা জরুরি কাজে পোর্ট ব্লেয়ার গেছে। অগত্যা তাকে বাদ দিয়েই আজ আসর বসল।

ঘরের দুই কোণে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে দুটো কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। আবছা আলো আর ছায়া ছায়া অন্ধকারে এই ঘরের কিছুই স্পষ্ট নয়। মানুষগুলির ছায়া অস্বাভাবিক লম্বা আর বিকৃত হয়ে ঘরের বেড়ায় কাঁপছে।

কেরোসিনের ডিবে থেকে যত আলো পাওয়া যায়, তার হাজার গুণ বেশি মেলে ধোঁয়া। এই ধোঁয়ার গন্ধ বড় উগ্র, বড় তীব্র। নাকে ঢুকলেই মানুষগুলো খক খক কাশে।

ধোঁয়াটে আলোতে মানুষগুলোর চেহারা বোঝা যায়। কিন্তু নাক চোখ বা চোখের ভাষা, কিছুই বোঝা যায় না।

উদ্ধবের ঘরে তামাকের সরঞ্জাম আছে। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরছে।

বুড়ো রসিক শীলই প্রথম বলল, 'লাগা রে উদ্ধব, একখান বাহারের গান ধর।'

'না না—' উদ্ধব বলল, 'পরথমে আমি না। পরথমে গান গাইব গুপী। দ্যাখ না, গুপী গাওয়ার লেইগা কেমুন ছোক ছোক করতে আছে।'

গুপীর গান গাওয়ার প্রচণ্ড শখ। তার নামটা উচ্চারণ করামাত্র ঘরের এক কোণ থেকে মাঝখানে উঠে এসে দাঁড়াল সে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় তিন লহর রুদ্রাক্ষের মালা। ভারি সরল মানুষ গুপী।

বাঁ হাতে বাঁ কানটা চেপে ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে খ্যাসখেসে ভোঁতা গলায় গান জুড়ে দিল গুপী:

তোমার চরণ তলে
হে গুরুচান রেইখো—
রেইখো আমারে—

গুপীর গানের মধ্যেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল হারাণ। একটা হাত ধরে তাকে টেনে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আর গাইতে হইব না সোনা।'

'ক্যান ?' গুপীর মুখখান বড় করুণ দেখায়।

ততক্ষণে উদ্ধবের ঘরে হাসির রোল উঠেছে। হেসে হেসে ঢলে ঢলে একজন আর একজনের গায়ে গড়াগড়ি খায়।

রোজই গুপীকে নিয়ে রঙ্গ করে হারাণরা। রোজই প্রথমে তাকে গান গাইবার জন্য তুলে দেয়। আর সে গলা ছাড়লেই টেনে বসিয়েও দেয়।

দোষের মধ্যে গুপী হল নিপাট ভাল মানুষ। কোনো প্যাঁচের কথা জানে না। কারো কোনো কথায় বা কোনো ব্যাপারেই নেই। জীবনে একটা মাত্র শখই আছে তার। একটু গান গাওয়ার শখ।

প্রাণে শখ থাকলেই গলায় গান আসবে এমন কথা নেই। হাঁ করলেই গুপীর গলা থেকে সরু-মোটা-মিহি—নানা জাতের চার পাঁচটা আওয়াজ এক-সঙ্গে বেরোয়। মনে হয়, তিনটে কুকুর আর দুটো ঘোড়া পাল্লা দিয়ে কাঁদছে!

এই মানুষগুলি, যারা পদ্মা মেঘনার দেশ থেকে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে আশ্রয়ের আশায় আশায় এসে পড়েছে তাদের জীবনে রঙ কোথায়? রস কোথায়? সাত পুরুষের বাস্তু থেকে উৎখাত হয়ে আসার পর তাদের জীবনের সব রস, সব কৌতুক, সব আনন্দের উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রাণধারণের অন্তহীন যন্ত্রণা নিয়েই তাদের দিন কাটে। জীবনে যন্ত্রণা তো আছেই। দুঃখ কষ্ট এবং দুর্ভাবনার পারাপার নেই।

দুঃখ এদের নিয়ত সঙ্গী। রোগ-ভোগ-শোকের মত নিয়তির অমোঘ বিধানে দেশভাগের পর থেকে কষ্ট এদের সঙ্গে লেগেই আছে।

তবু মাঝে মাঝে মনকে চোখ না ঠেরে উপায় কী। বিশেষ এই আন্দামানে, বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ নিদারুণ দ্বীপে।

গুপীকে নিয়ে রঙ্গ করে কিছু সময়ের জন্য জীবনের অন্য চিন্তাগুলিকে তারা ভুলে থাকে। সামান্য ব্যাপার দিয়ে প্রচুর হাসাহাসি করে এরা নিজেদের সরস সজীব রাখে।

করুণ চোখে হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল গুপী। এবার সে বলল, 'রোজ তরা অমুন হাসাহাসি করস ক্যান ?'

'তর গলা শুইনা।'

'ক্যান, আমার গলায় হইছে কী ?'

'তুই যহন গাস—'হাসতে হাসতে হারাণ বলে, 'মনে হয়, এক লগে তিনটা খাটাস আছে। বুঝলি ?'

গুপী আর কিছু বলে না। সবাইকে ডিঙিয়ে ঘরের একটি কোণায় গিয়ে বিষণ্ণ মুখে বসে থাকে। ভাবে, কাল আবার যখন তাকে গান গাইতে ডাকবে

কিছুতেই সে উঠবে না। অবশ্য এই প্রতিজ্ঞাটা রোজই করে গুপী ; রোজই ভাঙে।

গুপীকে নিয়ে হাসাহাসি এক সময় থামল।

হারাণ বলল, 'অনেক হইছে। এই দিকে রাইতও হইল। এইবার গান ধর বৈরোগী দাদা।'

'হ-হ, গান ধর—' সবাই সায় দিল।

হারাণ বলল, 'আইজ রাধাতত্ত্বের গান শুনুম।'

ইতিমধ্যে খোল তুলে নিয়েছে রসিক শীল। টাটুম-টুটুম-টুম—খোলে শব্দ ওঠে। করতাল তুলে নিয়েছে যোগেন। ঢিমে তালে করতাল বাজে—ঝমর-ঝমর-ঝম।

গুন্ গুন্ করে সুর ভেঁজে ভেঁজে উদ্ধব গান ধরে :

না পুড়াইও রাধা অঙ্গ
না ভাসাইও জলে—
মরিলে তুলিয়া রেখো
তমালেরই ডালে।

রাধাতত্ত্বের গান ধরেছে উদ্ধব। সুরকে হৃদয়ের রসে জারিয়ে সে গায়। গলা থেকে মানিনী রাধার বেদনা যেন ক্ষরে ক্ষরে পড়ে।

রসিক শীল খোলে চাঁটি মারতে মারতে বলে, 'আহা কি গান শুনালি উদ্ধব, পরাণ জুড়াইয়া গেল।'

আসর-ভরা মানুষ বিভোর হয়ে গান শোনে। সবাই মজে আছে যেন। সুরের মধ্য দিয়ে মধুর এক বেদনাকে মানুষগুলির অনুভূতির ভিতর ছড়িয়ে দিচ্ছে উদ্ধব :

মরিলে তুলিয়া রেখো
তমালেরই ডালে—এ-এ-এ—

সুরটাকে খাদে নামিয়ে চূড়ায় তুলে দীর্ঘ টান দেয় উদ্ধব। সোজা সেটা যেন বুকের মধ্যে বিঁধে যায়। প্রাণের ভেতর কোন একটা অবুঝ তার যেন তির তির করে কাঁপে।

ঘরের এক কোণে বসে বসে বুড়ী বাসিনী, মনোরঞ্জন সানা, অক্রুর বিশ্বাস, এমনি অনেকেই হাতের পিঠে চোখ মুছছে।

রাধাতত্ত্বে আসর যখন মেতে আছে, ঠিক সেই সময় চিকন মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে আঙুল মটকাতে মটকাতে উদ্ধবের ঘরে ঢুকল কুমী। টেনে টেনে বলল, 'খুব তো আসর জমাইছ!'

কুমীকে ঢুকতে দেখেই গান থামিয়ে দিয়েছে উদ্ধব। গান থেমেছে কিন্তু তার রেশটা এখনও যায় নি।

একটু আগে এই ঘর, ডিগলিপুরের এই সেটেলমেণ্ট, এই দ্বীপ—সমস্ত কিছু

উদ্ধবের গানের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। এই ঘরের মানুষগুলো চিরকালের এক ব্যথায় মগ্ন হয়ে ছিল। কিন্তু উদ্ধবের গানই তো শেষ কথা নয়। তার পরেও অনেক কিছু আছে। আছে জীবন। গানের স্বপ্নলোক কতক্ষণ আর মানুষগুলোকে আচ্ছন্ন রাখতে পারে!

কুমী আবার বলল, 'খুব তো আসর জমাইছ! উই দিকে কি হইছে, খবর রাখ?'

কোল থেকে খোল নামাতে নামাতে রসিক শীল বলল, কী হইছে লো কুমী?'

'কী হইতে বাকি আছে!' মাজা বাঁকিয়ে গালে একখান হাত রেখে কুমী দাঁড়াল।

কুমীকে দেখলেই ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের বুক কাঁপে। তার সঙ্গে গূঢ় গোপন এবং ভয়ানক সব খবর ঘোরে। পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত দুঃসংবাদ নিয়ে তার কারবার।

নানা জাতের নোংরা খবর যোগাড় করে সেটেলমেণ্টের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় কুমী। সবার কানে খবরগুলি না দেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

কুমীর রকম সকম দেখে এবং তার কথা শুনে মানুষগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে।

বুড়ো রসিক শীল বলল, 'রঙ্গ করবি না আসল কথাখানা ক'বি?'

কুমী ঠোঁট টিপে হাসে। কিছুই বলে না। এটা তার স্বভাব। একবারে খবরটা দেয় না সে। রসিয়ে রসিয়ে মজিয়ে মজিয়ে মানুষের উদ্বেগকে শীর্ষবিন্দুতে পেঁছে দিয়ে খবরটা সে ফাঁস করে। এতেই তার সুখ।

রসিক শীল অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'হাসন রাখ কুমী, কথাখান কইয়া যত পারস হাস।'

রসিক শীলই এতক্ষণ কথা বলছিল। আর সকলে চুপচাপ বসে ছিল।

এবার বুড়ী বাসিনী মুখ খুলল, 'মাগী রঙ্গী ঢঙ্গী। রঙ্গ কইরাই বাচে না! অনেক হইছে, এইবার ক'।'

আসরের ওপর দিয়ে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে গেল কুমী। বুঝল, মানুষগুলো উদ্‌গ্রীব এবং অস্থির হয়ে উঠেছে। বিচিত্র এক তৃপ্তিতে তার মনটা ভরে গেল। এবার খবরটা ফাঁস করা যায়।

আসরসুদ্ধ মানুষ এবার তাড়া লাগাল, 'কও-কও, তরাতরি কও। মাইনষেরে তুমি বড় জ্বালা দিতে পার। কমু কমু কইরাও কও না। মন খান উচাটন কইরা রাখ।'

চোখের তারা দুটো কাঁপিয়ে অল্প হাসল কুমী। এতক্ষণ দুয়ারের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। এবার আসরের মাঝখানে ঢুকে বসে পড়ল!

পানের রসে জিভ লাল করে এসেছিল কুমী। জিভটা সরু করে বার করে

শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে চেটে ভেজাল। তারপর বলল, কমু, কমু। কিছুই লুকামু না।'

এবার আর কেউ কিছু বলল না।

কুমী শুরু করল, 'আঁই গো রসিক খুড়া, আঁই গো বাসিনী মাউই, তোমরা তো ডিগলিপুর কোলোনির মাথা—'

রসিক শীল বলল, 'তাতে হইছে কি ?'

'হইব আবার কি।' কুমী ঝেঁঝে উঠল, 'হইছে, সব্বনাশের মাথায় বাড়ি।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ কুমীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রসিক শীল। মেয়েমানুষটার রকম সকম কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। আস্তে আস্তে সে বলল, 'কী ক'স তুই !'

'ঠিক কথাই কই—' কুমী বলতে লাগল, 'তোমরা তো চোখ বুইজা আছ। উই দিকে কোলোনিতে কি হইয়া গেল খোঁজ রাখ ?'

'কোলোনিতে আবার কি হইল !'

'হইছে হইছে, ট্যার পাও নাই।' চোখ মটকে মটকে কুমী হাসে। বলে, 'উই যে নিত্য তালই, উপুর থিকা দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছখান উল্টাইতে জানে না কিন্তুক তলে তলে মানুষখান সোজা না।'

'বুঝলি কেমনে ?'

'বুঝলাম, বুঝলাম—' চোখের পাতা নাচিয়ে নাচিয়ে হাসতেই থাকে কুমী। তার হাসিতে ধার আছে কিন্তু শব্দ নেই।

রসিক শীল বলে, 'নিত্য আবার কী করল ?'

'বিদেশীরে ঘরে আইনা তুলছে।'

'বিদেশী !' আসরভরা মানুষগুলো তাজ্জব বনে যায়।

কুমী থামে না, 'খালি বিদেশী না, বিজাত-কুজাত। শুনলাম—'

'কী শুনলি ?

'শুনলাম, নিত্য তালই বিদেশীরে ঘরেই রাখব।'

'ঘরে রাখব !'

'হ। শুনলাম আর একখান ঘর তুলব।'

উদ্ধবের ঘরে প্রথমে ভনভনানি শুরু হল। মনোরঞ্জন, অক্রুর, বুড়ী বাসিনী, হারাণ, যোগেন— সবাই একসঙ্গে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। অদ্ভুত এক উত্তেজনায় ডিবের ধোঁয়া ধোঁয়া তামাটে আলোতে মানুষগুলোর মুখ চকচক করে।

রসিক শীল ক্ষেপে উঠল, 'এ কেমুন কথা, আমরা কি মরছি ! আমাগো জানাইল না, শুনাইল না, লুকাইয়া ছাপাইয়া বিদেশীরে বিজাতিরে ঘরে আইনা তুলল ! আমরা থাকতে বিদেশী-বিজাত আপন হইল ! মানের ডর নাই ! ধম্মের ডর নাই !'

কুমী জুড়ে দিল, 'তার উপুর ঘরে ডাকাবুকো যুবুতী মাইয়া আছে। ডর নাই গো খুড়া, শরম-ভরমের ডর নাই।'।

'এইর একখান বিহিত করন লাগে।' সবাই রুখে উঠল।

'কী বিহিত করবা? নিজের ঘরে যদি কেও অজাত-বিজাত আইনা তোলে, তুমি আমি কি করতে পারি খুড়া?' বলে আর মিটি মিটি হাসে কুমী।

খবরটা এনে সবাইকে দিতে পেরেছে এতেই কুমীর শখ মিটেছে। আর এই শখটা মিটিয়েই তার যত সুখ, যত আনন্দ। এর পর চুলোচুলি লাঠালাঠি যা করতে হয়, রসিক শীলরাই করবে। তার কাজ শেষ। কাজেই কুমী উঠে পড়ল। মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে যেমন এই ঘরে ঢুকেছিল ঠিক তেমনিভাবেই চলে গেল।

কী বিহিত করা উচিত, ঠিক এই মুহূর্তে ভেবে উঠতে পারল না রসিক শীল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে শাসাতে লাগল, 'সোমাজের ডর নাই? সোমসারের ডর নাই? নিত্যার বুকের পাটাখান কত বড় হইছে, দেখুম। আহুক পালসাহাব, আহুক '

ঘরের এক কোণে ঝিম মেরে বসে আছে হারাণ। কুমী বিদেশীর নাম বলে যায় নি। তবু তার মনে কু-ডাক উঠেছে। কেন জানি তার মনে হচ্ছে, সেদিনের সেই কুচকুচে কালো পুরু-ঠোঁট কোঁকড়ানো-চুল লোকটা, নাম যার পানিকর, তাকেই ঘরে এনে তুলেছে নিত্য ঢালী।

৪২

সমস্ত রাত ঘুমোতে পারল না হারাণ। মাথাটা গরম হয়ে রইল। মগজের ভেতর এত তাপ নিয়ে ঘুমনো যায় না।

এমনিতে বিছানায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জুড়ে যায়। নাকের ডাক শুরু হয়। কিন্তু আজকের কথা আলাদা।

বুকের মধ্য থেকে একটা অবুঝ অসহ্য কান্না দুর্জয় বেগে উঠে এসে কণ্ঠার ঠিক কাছে ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। কান্নাটা গলা ফেঁড়ে বেরোয় না, নামেও না। অনড় নিরেট হয়ে থাকে।

গলাটা ভারী হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলতেও পারছে না হারাণ। মনে হয়, একরাশ তেতো ধারাল বালি তালুতে আটকে আছে। চোখদুটো জ্বালা জ্বালা করছে।

ঠিক শিয়রের ওপরেই একটা বাঁখারির জানলা। সেটার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল হারাণ।

এটা বছরের মধ্য ঋতু। এখন শীতের গাঢ়তা নেই, কুয়াশায় ঘনত্ব নেই। জানলাটার ওপাশ থেকেই একটা মিহি আবছা পর্দা ঝুলছে। এখনকার কুয়াশা বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে না। তার গায়ে আলগা উদাসভাবে জড়িয়ে থাকে।

আজ কি তিথি হারাণ জানে না। দ্বীপের মাথায় চাঁদির থালার মত গোল একটি চাঁদ দেখা দিয়েছে। ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্নায় ডিগলিপুরের এই সেটেলমেণ্টটা ভেসে যাচ্ছে। দূরের টিলা জঙ্গল আর পাহাড়ের মাথাগুলি চকচক করছে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হারাণ। জানালার ঠিক ওপাশে ঝোপগুলো পুরুষ জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে। জ্বলে জ্বলে উড়ে উড়ে তারা মেয়ে জোনাকিদের ফুসলোচ্ছে যেন। দ্বীপের মাটি থেকে ভেজা ভেজা বুনো গন্ধ উঠে আসছে।

ফিনিক-ফোটা চাঁদের আলো, পুরুষ জোনাকিদের জ্বলা আর নেবা, দ্বীপের মাটির সিক্ত শীতল গন্ধ—কোনো দিকেই মন নেই হারাণের।

বাতাসে হিমের আমেজ মিশতে শুরু করেছে। কেমন যেন শীত শীত করে। পায়ের কাছ থেকে কাঁথাটা তুলে গলা পর্যন্ত টেনে দিল হারাণ।

ঘরের ওপাশে আর একটা মাচান। সেখানে বুকে হাঁটু গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে উজানী বুড়ী ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত মন্থর বড় বড় শ্বাস ফেলছে। বুকের মধ্য থেকে কেমন একটা অনুচ্চ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে।

কান খাড়া করে অনেকক্ষণ উজানী বুড়ীর নিশ্বাসের শব্দ শুনল হারাণ। শ্বাস ফেলা আর শ্বাস টানাই না, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে উজানী বুড়ী। কেন কাঁদছে কে জানে?

হারাণের একবার মনে হল, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে উজানী বুড়ী কাঁদছে। বুড়ো মানুষ কি স্বপ্ন দেখে কাঁদে? হয়তো বা। কিন্তু না, কোনো ভাবনাই মনের সেই আসল চিন্তাটা সরিয়ে দিতে পারল না। দাবিয়ে রাখতে পারল না। বার বার ঘুরে ঘুরে সেই ভাবনাটা মাথায় পাক খেতে লাগল। না, আজ আর হারাণের ঘুম আসবে না।

একবার উঠে কলসী থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ছিটিয়ে এল হারাণ। কিন্তু যে চোখ জেদ ধরেছে ঘুমাবে না, জোড়া লাগবে না, হাজার জল ছিটিয়েও কি তা জোড়া লাগানো যায়।

অগত্যা আবার মাচানে এল হারাণ। টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকার পরই ছটফটানি শুরু হল। মাচানের ওপর এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে।

সেই দুঃখের দিনগুলি হুবহু মনে করতে পারে হারাণ। কষ্টের দিন মানুষ

কি ভোলে, না ভুলতে পারে ? থেকে থেকে সে যে সূঁচের মুখের মত বিঁধতে থাকে।

সুখের দিনের কথা মানুষ হয়তো ভোলে। কিন্তু দুঃখের দিনের বড় জ্বালা, বড় পোড়ানি। অস্তিত্বের সঙ্গে ধারাল কাঁটা হয়ে তা মিশে থাকে। একটু নিরালা বসে বসে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু করলেই সেই কাঁটাটা খচখচ করে ওঠে।

বছর দুই আগে শীতের এক ভোরে গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটাটা কুয়াশা আর গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল।

স্টীমার থেকে নেমে একদল মৃত-মুখ নিঃস্ব মানুষ—মেয়ে-পুরুষ-জোয়ান-বুড়ো-বউ-বাচ্চা, সকলে মিলে একাকার হয়ে বসে ছিল। তারা জানে না, সাতপুরুষের ভিটেমাটি ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে কোথায় কত দূরে কোন্ অন্ধ নিয়তির টানে তারা চলেছে।

শুধু এটুকু তারা জানে, যেমন বাতাস তেমনি আছে, যেমন নদী তেমনই বইছে, মাটির ওপর দাগ পড়ে নি, তবু নাকি দেশখানা দু-ভাগ হয়ে গেছে। আর জানে, সাতপুরুষের ভিটেমাটির ওপর তাদের আর দাবি নেই। দেশের সঙ্গে বত্রিশ নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা ভেসে পড়েছে।

আপাতত তারা গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটায় এসে পৌঁছেছে। এখান থেকে বর্ডার অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলার ট্রেন ধরবে। বর্ডার পর্যন্তই তাদের জানা আছে। বর্ডারে পৌঁছে তারা কোথায় যাবে সে ঠিকানা সম্পূর্ণ অজানা।

জড়াজড়ি গাদাগাদি করে মানুষগুলো চুপচাপ বসে ছিল। তাদের নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। চারপাশে প্রচুর জায়গা। তবু কেন যে মানুষগুলো গাদাগাদি করে ছিল, তারাই জানে।

হঠাৎ তাদের ভয়ানকভাবে চমকে দিয়ে তীব্র অবুঝ হাসির শব্দ উঠেছিল। সেই মেয়েটাই বুঝি হাসছে। এই দুঃসময়ে সে ছাড়া কে-ই বা হাসতে পারে!

মানুষের পিণ্ডটার মধ্যে হারাণ আর উজানী বুড়ীও ছিল। কনুই দিয়ে হারাণকে আস্তে একটা ঠেলা মেরে উজানী বুড়ী ফিস ফিস করে বলেছিল, 'হেই মাগীটা রে হারাইণা, হেই হাসনি চলানি—'

'হুঁ—' অস্ফুট একটা শব্দ করে হারাণ চুপ করে গিয়েছিল।

উজানী বুড়ীর গজগজানি থামে নি, 'সারাটা ইস্টিমার মাগী জ্বালাইতে জ্বালাইতে আইছে।'

একই স্টীমারে মুন্সীগঞ্জ থেকে তারা গোয়ালন্দে এসেছে। অন্য মানুষ যখন দেশ হারানোর শোকে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে, ঐ মেয়েটা তখন সারা শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে হেসে গেছে সমানে। গোয়ালন্দে নেমেও সে হাসি থামে নি।

উজানী বুড়ী বলেছিল, 'শরম নাই, ভরম নাই—ডাকাবুকা মাগী হগল কিছুর মাথা খাইয়া হাসে। আমরা মরি আমাগো জ্বালায়। দ্যাশ গেল,

ভিটা গেল। কুনখানে যাইতে আছি, জানি না। ডরে বুকখান কলার পাতের লাখান থরথরাইয়া কাঁপে। আর মাগী কিনা হাসে! হা ভগমান, কত নীলাই না দেখাইলা!'

আশে পাশে অগুনতি মানুষের পিণ্ড। ঠিক কোথা থেকে যে মেয়েটা হাসছে, দেখা যাচ্ছিল না।

মাথা তুলে বার দুই দেখার চেষ্টা করেছে হারাণ, কিন্তু অন্ধকার আর কুয়াশা ফুঁড়ে নজর চলে নি।

একসময় মেয়েটার অবুঝ অস্বাভাবিক হাসি থেমে যায়।

অনেক দূরে স্টীমার ঘাটায় আলো জ্বলছিল। সেই আলো এতদূরে এসে পৌঁছয় নি।

পরিচিত পৃথিবীর ওপর সমস্ত দাবি এবং দখল ছেড়ে মানুষগুলো পালিয়ে যাচ্ছে। আলোর সীমানার বাইরে এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে তারা নিঃশব্দে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না বর্ডারের গাড়ি আসবে এই মানুষগুলো ডেলা পাকিয়ে বসে থাকবে।

এই মানুষগুলোর আলাদা আলাদা নাম ছিল, আলাদা আলাদা চেহারা ছিল, অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু দেশভাগ তাদের সবাইকে একটি মাত্র নাম, একটি মাত্র অস্তিত্ব দিয়ে একাকার করে ফেলেছে। তারা শরণার্থী।

একসময় কুয়াশা কেটে গেলে অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে পূবের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছিল। স্টীমার ঘাটায় তখনও আলো জ্বলছে। গাধাবোটের জেটিটা অল্প অল্প দুলছে। আলো পড়ে নদীর জল কালো কাচের মত ঝকমক করছে।

ঘাড় গুঁজে সবার সঙ্গে একাকার হয়ে বসে ছিল হারাণ। আগের দুটো রাত একটুও ঘুমাতে পারে নি। চোখ ঢুলে আসছিল। ঘাড়টা আপনা থেকেই হাঁটুর ওপর ভেঙে পড়ছিল। পৃথিবীর সব ঘুম হারাণের চোখে যেন ভর করেছে তখন।

হঠাৎ গম্ভীর কর্কশ শব্দ উঠল। স্টীমারের ভোঁ। দৈত্যের মত বিশাল চাকার ঘা খেয়ে স্টিমার ঘাটার জল গেঁজে উঠতে লাগল। স্টীমার নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছিল। আবার বুঝি নারায়ণগঞ্জেই ফিরে যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ—দিবারাত্রি স্টীমারটার যাতায়াতের কামাই নেই। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ভাগ্যকুল—নানা ঘাট থেকে পেট বোঝাই করে করে মানুষ এনে গোয়ালন্দে ঢালছে। এটাতে চেপেই হারাণরা এসেছে দিন দুই আগে।

স্টীমারের আওয়াজে মাথা তুলেছে হারাণ। তুলেই চমকে উঠেছে। আবছা আলোতে চোখে পড়েছিল, বাঁ পাশে রেলের লাইন।

তখনও কলকাতার ট্রেন আসে নি। গাড়ি আসতে আসতে দুপুর হয়ে যাবে।

রেল লাইনের ওপর অনেক মানুষ বসে আছে। তাদের মধ্য থেকে সেই যুবতী মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ তীব্র অস্বাভাবিক শব্দ করে হেসে হেসে ঢলে পড়েছিল।

নদীর দিক থেকে জলো বাতাস হু হু করে ছুটে আসছিল। মানুষগুলো হি হি কাঁপছিল।

কনুই দিয়ে হারাণের পাঁজরে আস্তে ঠেলা মেরেছিল উজানী বুড়ী। বলেছিল, 'উই যে রে হারাইণা, মাগীটা আবার হাসে।'

হারাণ কিছু বলে নি।

উজানী বুড়ী সমানে বকে গিয়েছিল, 'মাগী এত ঢলায় কেমনে ? দ্যাশ গেল, ভিটা গেল, মাটি গেল, হগল খাইয়া আইসাও মাগীর বুক কাপে না!'

হারাণ হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'চুপ মার ঠাকুরমা—'

হারাণের মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝেছে, উজানী বুড়ীই জানে। থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল।

মেয়েটা তখনও হাসছে। কলকলিয়ে, মেতে মেতে, শরীরটাকে দুলিয়ে, বাঁকিয়ে চুরিয়ে অবিরাম হাসছে। হারাণের মনে হয়েছে, হাসা বুঝি মেয়েটার ব্যারাম।

ঠাসবোনা অন্ধকার আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল। কুয়াশার পর্দাটা আর নেই। তখন পুবের আকাশে দিনের প্রথম সূর্য সবে মাথা তুলছে। স্নিগ্ধ নরম আলো ফুটেছে। সে আলোতে তাপ নেই, জ্বালা নেই। বড় কোমল, বড় মধুর এই আলো।

নারায়ণগঞ্জের স্টীমারটা কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে।

এখন জোয়ারের মাতানাতি নেই, ভাটার টান নেই। জোয়ার আর ভাটার ঠিক মাঝামাঝি নদী এখন স্থির, নিরুত্তেজ। ছোট ছোট পলকা ঢেউগুলো দূর থেকে তরল কাচের মত দেখাচ্ছিল। ছোট ঢেউয়ের ছোট খেয়ালে জেলেডিঙি-গুলি টলমল করছিল।

হারাণ নদী দেখছিল না। সকালের প্রথম নরম আলো কি জেলেডিঙি দেখছিল না। একদৃষ্টে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ছিল। মেয়েটা ঘোরের মধ্যে হেসেই চলেছে।

একটা মধ্যবয়সী লোক, মাথায় যার কাঁচা পাকা চুল, চোখা চোখা নোংরা গোঁফদাড়ি, গোরুর মত অবোধ চাউনি—মেয়েটার হাত ধরে বলছে, 'অমুন করে না, অমুন হাসে না। থির হ কাপাসী, থির হ।'

মেয়েটার নাম জানা গিয়েছিল। মধ্যবয়সী লোকটার কথায় কাপাসী স্থির হয় নি। কলকলিয়ে হাসতে হাসতে বলেছে, 'নিজের ইচ্ছায় কি হাসি বাবা!

বুকের ভিতর থিকা হাসন উথলাইয়া উথলাইয়া ওঠে। পারি না বাবা, হেই হাসনেরে ঠেকাইয়া রাখতে পারি না।'

কাপাসীর হাত ছেড়ে লোকটা হাউ হাউ করে কেঁদেছে। কেঁদেছে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছে, 'ভগমান আমার আর বাচনের সাধ নাই। আমারে শ্যাষ কর। এই দুঃখু আর সইতে পারি না।' তার চোখ ফেটে টস টস করে নোনা জল ঝরে যাচ্ছিল।

কখনও কলকাকলিয়ে হেসে, কখনও চুপচাপ উদাস চোখে আকাশ কি নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছে কাপাসী।

দুপুরের তীব্র উত্তেজক রোদে গোয়ালন্দের স্টীমারঘাটা, নদীর ঢেউ আর আকাশ যখন জ্বলছে, ঠিক সেই সময় বর্ডারের গাড়ি এল।

মানুষগুলো ঝিম মেরে বসে ছিল। মাঝে মাঝে অনুচ্চ অস্ফুট শব্দ করে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছিল। ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল।

সাতপুরুষের ভিটেমাটি হারিয়ে এসেছে। সেই শোকে দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা শেষবারের মত কাঁদছে। বর্ডারের ওপারে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তারা জানে না। সেই ভয়ে কাঁদছে। মিশ্র কান্নার শব্দে গোয়ালন্দের স্টীমারঘাটা এখন সুবিশাল এক শোকসভা।

আকাশটা গলা কাঁসার মত ঝঝঝক করছিল। তার নিচে অমোঘ নিয়তির মত বর্ডারের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পুঁথিপুস্তকে কয়েকটা অক্ষর বসল। আর সেই অক্ষরগুলির কারসাজিতে নিজের দেশ আর নিজের রইল না। সাতপুরুষের ভিটেমাটির ওপর নিজের দাবি কি দখল থাকল না। এখন পৃথিবীর কোথাও এই মানুষগুলির নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উন্মূল হয়ে তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চলে যেতে হচ্ছে।

এই মানুষগুলো জানল না, বুঝল না, কেন তাদের দেশ হারাতে হচ্ছে। কি এক অসহ্য তাড়নায় চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে, ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ট্রেনের কামরাগুলিতে ঢুকে পড়েছিল।

হাজার চেষ্টা করেও হারাণ নজর রাখতে পারে নি। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে কাপাসী আর সেই মধ্যবয়সী লোকটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

দুপুরে ট্রেন এসেছিল। ছাড়ল সন্ধের পর। মানুষ না, যেন দেশভাগের মর্মান্তিক শোকটাকে বয়ে বর্ডারের ট্রেন অন্ধকার ফুঁড়ে ছুটে যাচ্ছিল।

মানুষগুলো আর কিছু জানুক আর নাই জানুক, সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝেছে, এই যাত্রা অনন্ত অফুরন্ত অশেষ দুঃখের যাত্রা।

দেশের মাটির বাইরে কোনোদিন তারা পা বাড়ায় নি। সেই তাদের প্রথম

বাইরে বেরুনো। তারা বুঝতে পারছিল, এই পদ্মা-মেঘনার দেশে আর কোনোদিনই তারা ফিরবে না। বর্ডারের ট্রেন দেশের বাইরেই ফেলে আসে, আর ফিরিয়ে আনে না।

বাইরে কালো নিরেট অন্ধকার. সেদিন কী তিথি, কে জানে! খুব সম্ভব অমাবস্যা। অমাবস্যার অন্ধকার একটা অসহ্য শোককে, একটা নিদারুণ দুর্ভাগ্যকে ঢেকে পৃথিবীর সব কিছু থেকে আড়াল করে বর্ডারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

মানুষগুলো তার মধ্যেই জেনে ফেলেছে, তাদের আর আলাদা আলাদা জাত নেই, আলাদা আলাদা নাম নেই। বুঝিবা আলাদা চেহারাও না. একই দুর্ভাগ্য তাদের সবাইকে একটা মাত্র নাম দিয়েছে। সেটা হল 'রিফুজি'। বর্ডারগামী ট্রেনের সমস্ত মানুষই তখন এক। তাদের শোক দুঃখ যন্ত্রণা—সমস্ত কিছুই অভিন্ন।

বাংক, বেঞ্চের ওপরে এবং নিচে অজস্র মানুষ। পা ছড়িয়ে যে বসবে তার উপায় নেই। হাঁটু আর মাথা এক করে কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল সবাই।

মানুষগুলো চুপচাপ নিঃশব্দে বসে থাকে। মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রিটাকে চমকে দিয়ে ভোঁতা খ্যাসখেসে গলায় বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। আশ্চর্য, একই দুর্ভাগ্যের শরিক হয়ে তাদের কান্নার শব্দও হুবহু একইরকম হয়ে গেছে।

এক কোণে বসে বসে হারাণ ঢুলছিল। হাঁটুর চোখা হাড়ে কপালটা বার বার ঠুকে যাচ্ছিল। তার গা ঘেঁষে বসে ছিল উজানী বুড়ী।

কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে মানুষগুলো এক একবার থামে; কিছুক্ষণ পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু করে।

হারাণ ভাবতে চেষ্টা করল, কখন থেকে এই মানুষগুলো কাঁদছে। উজানী বুড়ী আর সে মুন্সীগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দের স্টীমারে উঠেছিল। সেখান থেকেই মানুষগুলোকে কাঁদতে দেখেছে। তাদের কাঁদতে দেখে নিজেরাও কেঁদেছে। তারপর স্টীমারটা তারপাশা, ভাগ্যকুল, রাজবাড়ি—নানা ঘাটে চড়ে আরো অনেক মানুষ তুলে গোয়ালন্দ রওনা হয়েছিল। যত বারই লোক উঠেছিল ততবারই স্টীমারে নতুন করে কান্নার শোর পড়ে গিয়েছিল।

উজানী বুড়ী হঠাৎ ডেকে উঠেছে, 'হারাণ—'

'কী ক'স?' হাঁটুর ওপর থেকে মাথা না তুলেই হারাণ সাড়া দিয়েছে।

'কী আর কমু ভাই, হেই পুরান কথা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উজানী বুড়ী বলেছিল, 'এই যে অচিনা দ্যাশে যাইতে আছি, আমাগো কী হইব রে ভা?'

'হগলের যা হইব, আমাগোও হেয়াই হইব।'

'ঠিকই। কিন্তুক—'

'কিন্তুক আবার কী?' মাথা তুলেছিল হারাণ। চোখদুটো টকটকে লাল,

যেন দু পিণ্ড রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সে বলেছে, 'কিস্তুকের আবার কী হইল ?

'বাপ শ্বউরের ভিটায় আবার ফিরা আইতে পারুম তো ?'

হারাণ জবাব দেয় নি। জানালার বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

উজানী বুড়ী খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'ড্যাকরা কথা ক'স না ক্যান ? এই যাওনই কি আমাগো শ্যাষ যাওন ?'

'কী জানি ?'

'আর কি আমরা ফিরুম না ?' হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করেছিল উজানী বুড়ী। কেঁদেছে আর বলেছে, 'ড্যাকরারা, যমের অরুচিরা—যারা আমাগো ভিটামাটি থিকা খেদালি, পাতা সোমসার ভাইঙ্গা দিলি, তারা কুনোদিন সুখ পাবি না। তোগো ভরা ভোগে ছাই পড়ব! তোগো সোমসার ছারেখারে যাইব। আমাগো লাখান তরাও বুক থাপড়াবি, কানবি। তরা মর, গুষ্টিসুদ্ধা নিঃবংশ হ।'

উজানী বুড়ী জানে না, কে তাদের সাজানো সংসার ভেঙে দিল, কে তাদের সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করল, কে তাদের বড় সুখের বড় সাধের জীবনটাকে এমন তছনছ করে দিল। না জেনেও সে শাপশাপান্ত করে ; চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদে।

মানুষগুলো কেঁদে কেঁদে একসময় ঝিমিয়ে পড়েছিল। গাড়ির দোলানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চোখে তাদের ঢুলুনি এসেছিল। উজানী বুড়ীর কান্নার শব্দ শুনে সবাই চোখ মেলে তাকিয়েছে এবং আরো বিমর্ষ হয়ে পড়েছে।

মধ্যরাতে বর্ডারগামী ট্রেনটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খুব সম্ভব লাইন ক্লিয়ার নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে গাড়িটা। ইঞ্জিনের ক্লান্ত হৃৎপিণ্ডটা ধস্ ধস্ করে আওয়াজ করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাইরের গাঢ় অন্ধকার আর সীমাহীন মাঠকে ভয়ানক ভাবে চমকে দিয়ে শব্দ উঠল। সেই হাসির শব্দ। শব্দটা পাশের কামরা থেকে আসছে।

হারাণের কাঁধে মাথা রেখে উজানী বুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছিল। হাসির আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, 'সেই হাসনি ঢলানি মাগীটা, বুঝলি হারাইণা ? মাগীর হাসন ঘোচে না। কুন চুলায় যাইতে আছি, জানি না বাচুম না মরুম, তার দিশা নাই। মাগী তবু হাসে!'

অনেকেই সায় দিয়েছে, 'হ-হ, এমুনি বের্তারবত মাইয়ামানুষ বাপের বয়সে দেখি নাই।'

'ডাকাবুকা মাগী।'

'ডাকাবুকা না ডাকাবুকা! মাগী যত অমঙ্গলের হাসন হাসে!' উজানী বুড়ী গজ গজ করে যাচ্ছিল।

হারাণ বলেছে, 'থাম দেখি ঠাকুরমা। হাসে হাসুক, কান্দে কান্দুক, পরাণে যা চায় করুক। তর আমার কী?'

উজানী বুড়ী ঘোলা ঘোলা চোখে একবার হারাণের মুখের দিকে তাকিয়ে টেনে টেনে বলেছিল, 'হাসনি মাগীর লেইগা বড় যে টান।'

'হ টান! তুই এইবার থাম বুড়ী।' হারাণ ধমকে উঠেছিল।

ভোরের দিকে বর্ডারের ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে।

বানপুর, দর্শনা—নানা স্টেশনে ঠেক খেতে খেতে বর্ডার পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা রাণাঘাট এল।

হারাণের মাথার মধ্যে সেই তীব্র অবুঝ অস্বাভাবিক হাসিটা বিঁধেই ছিল। কিন্তু রাণাঘাটে এসে হাসনি মেয়েটাকে কোথাও খুঁজে পেল না সে।

অসংখ্য অজস্র মানুষ।

কামরা, পা-দানি—শুধু কি তাই, ট্রেনের মাথায় উঠে ঝুলতে ঝুলতে এসেছে মানুষগুলো। প্রাণ বাঁচাবার একটা অন্ধ তাগিদ ঝাপটা মারতে মারতে সাত-পুরুষের ভিটেমাটি থেকে তাদের উৎখাত করে এনেছে।

বউ-বাচ্চা, জোয়ান-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ—যতদূর তাকানো যায়, অগণিত জীবাণুর মত মানুষ কিলবিল করছে। এর মধ্যে কাপাসীকে কোথায় খুঁজে পাবে হারাণ!

বর্ডারের স্লিপ নেবার পর হারাণরা শুনল, রাণাঘাটের রিফুজি ক্যাম্পে জায়গা নেই। পরের ট্রেনেই তাদের কলকাতা যেতে হবে।

কলকাতার ট্রেন যখন শিয়ালদা এসে পেঁছিল তখন সন্ধ্যা।

দিনটা মরে মরে অন্ধকার হয়ে গেছে। স্টেশনে হাজারটা আলো জ্বলে উঠেছে।

গাড়ির ঘসঘস, ইঞ্জিনের কান-ফাটা আকস্মিক হুইসিল, গিজ গিজে ভিড়, ট্রেনের শব্দ, মানুষের হাঁকাহাকি, চিল্লাচিল্লি, ছোটাছুটি, সারি সারি চোখ ধাঁধানো আলো—চারদিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল হারাণ। কোনোদিন এত আলো, এত শব্দ, এত মানুষ দেখে নি সে! কখন যে ভিড়ের মধ্যে ভাসতে ভাসতে উজানী বুড়ীর একটা হাত ধরে প্ল্যাটফরমের বাইরে এসেছিল খেয়াল নেই।

ভয়ে ভয়ে উজানী বুড়ী ডেকেছে, 'হারাইণা রে—'

'কী ঠাকুরমা?'

'এই আমরা আইলাম কুন খানে?'

হারাণও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় সে বলেছিল, 'এই বুঝি কইলকাতা ঠাকুরমা।'

'এইখানে আমরা থাকুম কুন খানে?'

'হগলে যেইখানে থাকব।'

হারাণের কথা শেষ হবার আগেই কে যেন পেছন থেকে ডেকেছে, 'এই যে বাবা, এইদিকে…একখান কথা শুনবা ?'

উজানী বুড়ী আর হারাণ ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়েছে, তাদের ঠিক মুখোমুখি সেই মধ্যবয়সী লোকটা কাপাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

হারাণ বলেছে, 'আমারে কিছু কইলেন ?

'হ বাবা।'

'কী ?'

লোকটা বলেছে, 'তোমাগো লাখান আমরাও রিফুজি।'

লোকটা কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থেকেছে হারাণ।

লোকটা ফের বলেছে, 'ভালই হইল। বিদ্যাশ জায়গা। চিনা পরিচয় কইরা রাখন ভাল। কহন কুন বিপদ আহে, কে কইব! আমাগো তো অহন কথায় কথায় বিপদ, উঠতে বইতে বিপদ। কপাল ভাঙল, দ্যাশ ছাইড়া আইলাম। কুনো দিন যে আবার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগব, এমুন ভরসা নাই।

হাউ মাউ করে বকে যায় লোকটা। খানিকটা হাঁপায়। টেনে টেনে দম নেয়। আবার শুরু করে, 'আমার নাম নিত্য ঢালী, এই হইল আমার মাইয়া কাপাসী। তোমার নামখান কি বাবা ?'

'হারাণ।'

উজানী বুড়ীকে দেখিয়ে নিত্য ঢালী বলল, 'এনি তোমার কে ?

'ঠাকুরমা।'

'ভালই হইল। মাথার উপুর একজন বুড়া মানুষ থাকলে বুকে বল পাওন যায়।'

উজানী বুড়ী কিছুই বলছিল না, কিছুই শুনছিল না, একদৃষ্টে শুধু কাপাসীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

নিত্য ঢালী বলল, 'অহন করণ কি ? যামু কুন খানে ?' একটু থেমে কি যেন সে ভেবেছে। ফের বলেছে, 'ভাবনা তো লগে লগে আছেই। অহন লও যাই উই কোণায় গিয়া এট্টু স্থির হইয়া বহি। দুই দিন প্যাটে কিছু পড়ে নাই ; এট্টু পা পাইতা বইতে পারি নাই।'

চারজনে প্ল্যাটফরমের এক কোণে চলে গিয়েছিল।

সম্বলের মধ্যে খান দুই ছেঁড়া কাঁথা, একখানা চট, দুখানা কাপড় আর খুচরো এবং নোটে মিলিয়ে সাত টাকা কয়েক গণ্ডা পয়সা। দেশ থেকে নিত্য ঢালী এইটুকু বিত্তই আনতে পেরেছে।

নিত্য ঢালী কাঁথা পেতে দিল। পুরো দুদিন পর চারজনে পা ছড়িয়ে তার ওপর বসতে পেরেছে।

নিত্য ঢালী বলেছে, 'অহন কিছু খাইতে না পারলে বাচুম না।'

'ঠিক কথা।' বাকি তিনজনে সায় দিয়েছে।

'লও যাই, কিছু চিড়ামুড়ি কিনা আনি।' হারাণকে সঙ্গে নিয়ে নিত্য ঢালী উঠে পড়েছিল।

কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। শ্বাস যখন আছে বাঁচার আশাও আছে। অন্তত বাঁচার জন্য যোঝাযুঝিটা তো আছে।

সেই যে হারাণরা শিয়ালদা স্টেশনে এসেছিল, তারপর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল। তবু প্ল্যাটফর্মের সেই কোণটি ছেড়ে তাদের কোথাও যাওয়া হল না। প্রথম প্রথম শুনেছিল, তাদের রিফুজি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু দিন যায়, মাস ফুরোয়, বছর ঘুরে আসে। প্রায় রোজই 'রিফুজি' অফিসে খোঁজ নেয় হারাণ। রোজই এক জবাব মেলে। ক্যাম্পে জায়গা নেই। ক্যাম্পে তাদের পাঠানো হবে না। একেবারে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। হারাণরা মাটি পাবে, ঘর পাবে। পদ্মা-মেঘনার দেশে যা যা হারিয়ে এসেছে, সবই ফিরে পাবে।

রোজই আশায় আশায় 'রিফুজি' অফিসে যায় হারাণ। বেজার মুখে ফিরে আসে। কবে যে পুনর্বসতি হবে, আদৌ হবে কিনা, কে বলবে।

প্ল্যাটফর্মের ওপর হাত চার পাঁচেক জায়গা দখল করে এক একজন ইঁট দিয়ে সীমানা ঠিক করে নিয়েছে। ঐ নিরাবরণ নগ্ন জায়গাটুকুর মধ্যে বউ-ঝি মেয়ে-পুরুষ গাদাগাদি করে পড়ে থাকে। গোপনতা নেই, আব্রু নেই। ওখানেই যুবতী নারী গর্ভিণী হচ্ছে, মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষ মরছে। ওখানেই ঘর-সংসার, জীবনমৃত্যু, সব কিছু।

হাজার হাজার যাত্রী দিনরাত পাশ দিয়ে যাতায়াত করছে, তাদের সহানুভূতির ওপর করুণভাবে নিজেদের উলঙ্গ জীবনের সমস্ত লজ্জা সম্ভ্রম আর অসহায়তাকে সঁপে দিয়ে একদল ক্ষুধার্ত বাস্তুহীন জীব পড়ে থাকত।

হারাণও হাত পাঁচেক জায়গা দখল করেছিল। তার পাশের জায়গাটা নিত্য ঢালীর।

এই এক বছরে সুখে-দুঃখে আশায়-নিরাশায় পাশাপাশি থেকে হারাণদের সঙ্গে নিত্য ঢালীদের যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল তা বড় ঘনিষ্ঠ।

বাঁচার কথা, ভবিষ্যতের কথা কি জীবনের হাজারটা সমস্যার কথা ভেবে যখন আর থই পায় না, তখন একজন আর একজনের কাছে এসে বসে, পরামর্শ করে। একজন যখন হতাশ হয়ে পড়ে, আরেকজন ভরসা দেয়।

স্টীমারে, গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটায় এবং মাঝরাত্রে বর্ডারের ট্রেনে যে তীব্র অবুঝ এবং অস্বাভাবিক হাসি হারাণ শুনেছিল, শিয়ালদা স্টেশনে প্রায়ই তা শোনা যায়।

এমনিতে নিত্য ঢালীর মেয়ে কাপাসী সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতই কথা বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে স্টেশনটাকে চমকে দিয়ে কলকলিয়ে হেসে ওঠে।

হাসির দাপটে গলার শিরগুলি দড়ির মত পাকিয়ে ওঠে চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ে।

আর সব কিছুই সইতে পারে উজানী বুড়ী। কিন্তু এত বড় বিয়ের যোগ্য মেয়ের এমন হাসাহাসি মাতামাতি তার দু চোখের বিষ

উজানী বুড়ী বলত, 'মাইয়ার হাসন সামলা নিত্য।

নির্জীব গলায় নিত্য ঢালী বলত, 'কি করুম মাসি, আমি কি করতে পারি? তোমারে তো হগলই কইছি। যত দিন কাপাসী বাইচা আছে অর হাসনও আছে। তুমি আমি, পিরথিমীর কেউ অর হাসন থামাইতে পারুম না।' নিত্যর বুকটা উথলপাথল করে দীর্ঘশ্বাস পড়ত।

উজানী বুড়ী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ত। গাঢ় গলায় বলত, 'হগলই বুঝি নিত্য। আমরা না হয় বুঝলাম কিন্তুক মানুষে তো হেয়া মানব না। মানুষের মন বড় কু।'

অসহায় মুখে নিত্য বলেছে, 'তুমিই কইয়া দাও, কি করুম।'

উজানী বুড়ীদের সব কথাই জানিয়েছে নিত্য ঢালী। সেই হীরাকুপি গ্রামখানার কথা, দামিনী বউর কথা, নিশিরাতে যারা এসে বাপমায়ের বুক থেকে কাপাসীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কথা। কোনো কথাই সে বাদ দেয় নি।

নিত্য ঢালী আবার জিজ্ঞেস করেছে, 'কী করুম মাসি?'

জবাব দেবার মত একটা কথাও খুঁজে পায় নি উজানী বুড়ী।

মাঝে মাঝে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছে কাপাসী। ঝিম দুপুরে অনেক উঁচুতে চিল ওড়ে। কিংবা সন্ধে হলে ধোঁয়াধুলোর শহরের মাথায় প্রথম তারাটি ফুটতে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবত মেয়েটা।

ঠিক সেই সময় হয়ত শিয়ালদা বাজারে ঘেয়ো আনাজ কি পচা মাছ কুড়োতে গেছে উজানী বুড়ী। কিংবা জলের কলের দখল নিয়ে চুলোচুলি বাধিয়েছে।

সুযোগ বুঝে কাপাসীর কাছে এসে বসত হারাণ। ফিস ফিস করে ডাকত, 'কাপাসী—'

আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে হারাণের মুখের ওপর ফেলত কাপাসী। কিছু বলত না। তার চোখে অদ্ভুত একটা ঘোর লেগে থাকত।

হারাণ আবার ডাকত, 'কাপাসী—'

'কও—' খুব আস্তে সাড়া দিত কাপাসী।

'কি ভাবতে আছ?'

'একখান কথা কি আর ভাবি! বুঝলা পুরুষ- চিন্তার আমার পারকূল নাই।'

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ হারাণ বলত, 'একটা কথা জিগামু কাপাসী ?'

'একখানা ক্যান, দশখান জিগাও—'

এক একদিন কাপাসীর মনটা খুবই ভাল থাকত, সহজ ভাবে কথা বলত। সব কথার ঠিক ঠিক জবাব দিত।

হারাণ বলত, 'অমুন হাস ক্যান কাপাসী ?'

'বড় সুখে হাসি পুরুষ। ক্যান যে হাসি, কেউ বুঝব না। পিরথিমীর কেউ না।' দু হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এক একদিন কেঁদে উঠত কাপাসী।

হারাণ অবাক হয়ে যেত। তবে কি তারা যা বুঝেছে সেটুকুই সত্যি না! কাপাসীর হাসির অনেক স্তর নিচে বুঝিবা অফুরন্ত দুঃখ জমা হয়ে আছে।

একটু একটু করে একদিন কাপাসীর সেই দুঃখটাকে ছুঁয়ে ফেলল হারাণ। সেই দুঃখ—উন্মাদ হাসির নিচে যা গোপন হয়ে আছে।

প্রায়ই হারাণ বলত, 'অমুন হাইসো না কাপাসী।'

'ক্যান ?'

'মাইনষে মোন্দ কয়।'

কি একটু যেন ভেবে নিত কাপাসী। তারপর হঠাৎ বলত, 'মাইনষে মোন্দ কয়, হেয়াতে তোমার কি ?'

'আমার যে কি, বোঝ না কাপাসী ?' হারাণের গলা গাঢ় শোনাত।

'না-না-না—' তীক্ষ্ন গলায় একনাগাড়ে বলে যেত কাপাসী, 'কও পুরুষ, আমারে মোন্দ কইলে তোমার কি হয় ?' অদ্ভুত জেদই ধরত সে।

বিব্রত মুখে কাপাসীর দিকে তাকিয়ে থাকত হারাণ। তারপর চোখ বুজে বলে ফেলত, 'তোমারে মোন্দ কইলে আমার যে মোন্দ লাগে।'

'মিছা কথা!' কাপাসী হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠত।

'মিছা না কাপাসী।' কথাটা বলতে হারাণের গলা কাঁপত।

'সত্য কও পুরুষ ?' কী ভেবে হারাণের পাশে আরো একটু ঘন হয়ে আসত কাপাসী।

নরম গলায় হারাণ আবার বলত, 'সত্য কই।'

কাপাসী এরপর আর কিছু বলত না। কোনো দিন হারাণের একটা হাত আঁকড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। তবে বেশির ভাগ দিনই যখন তখন কলকলিয়ে হেসে উঠত।

ফাঁক বুঝে উজানী বুড়ীকে লুকিয়ে চুরিয়ে কাপাসীর কাছে আসত হারাণ। কিন্তু হাজার লুকোলেও এক একদিন ধরা পড়ে যেত। বুড়ী বলত, 'তরে না কইছি, কাপাসীর কাছে যাবি না।'

'গেলে কি হয় ?'

'লক্ষ্মী দাদা আমার, অবুঝ হইস না। শোন, উই কাপাসীর শরীলখান

নষ্ট, মাথাখান খারাপ। তার উপর বয়স্যের মাইয়া (যুবতী)। অর কাছে বেশী যাইতে নাই।'

অনেক বয়স হয়েছে উজানী বুড়ীর। জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। আগে থেকেই অনেক কিছুর গন্ধ পায় সে।

কথায় বলে যুবতী মেয়ে হল আগুন আর পুরুষ হল ঘি। আগুনের কাছ থেকে ঘি'কে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল।

তা ছাড়া কাপাসী যদি সুস্থ হত, স্বাভাবিক হত, তার শরীর যদি পবিত্র থাকত, তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু এই কাপাসী, যার শরীর নষ্ট, মাথা খারাপ, সে সমাজ সংসারের কোনো কাজেই আসবে না। কাজেই আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল। কাপাসী আর হারাণের মধ্যে যাতে মাখামাখি না হয়, সে জন্য সব সময় নজর রাখত উজানী বুড়ী। হারাণকে আগলে আগলে রাখতে চাইত। কাপাসী সম্পর্কে তার সহানুভূতি আছে, মমতা আছে, কিন্তু সব জেনেশুনে তাকে নাতির বউ করে আনা যায় না।

উজানী বুড়ীর এত পাহারাদারি সত্ত্বেও হারাণকে এবং তার বয়সের ধর্মকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

এই ভাবে শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পুরো একটা বছর গেটে গেল।

আগে আগে লঙ্গরখানা থেকে খিচুড়ি দিত। একদিন তা বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে সরকারী খয়রাত অর্থাৎ মাথা পিছু ক্যাশ ডোল দেওয়া শুরু হল।

নিত্য ঢালী বলত, 'এই কয়খানা টাকায় প্যাটের ভাত পাছার কাপড় যোগান যাইব না। কী করণ যায়!'

হারাণও সায় দিত, ঠিক কথা তালুই। চাউলের দর তিরিশ টাকা। একখানা মোটা কাপড় ছয় সাত টাকা। বাচুম কেমনে আমরা?'

'হেই তো—'নিত্য ঢালীর মুখেচোখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটত।

উজানী বুড়ী, নিত্য ঢালী, হারাণ আর কাপাসী—চারজন প্রায় মুখোমুখি বসে ছিল একদিন। হারাণ আর নিত্য ঢালী কথা বলছিল। উজানী বুড়ী ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করছিল। কাপাসী দুই হাঁটুর মধ্যে থুতনি ঢুকিয়ে প্ল্যাটফরমে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখছিল।'

হঠাৎ ঘুরে বসেছে কাপাসী। বলেছে, 'উই ডোলের টাকা তো আছেই, আরো কিছু কামাই কর। তা হলেই সোংসার চলব।'

হারাণ বলেছে, 'কামাই করনের পথ নাই। কুলীর কাম করতে গেছিলাম। পশ্চিমা কুলীরা মাইর দিয়া হটাইয়া দিল। এই দ্যাশের কিছু জানি না। কেউ আমাগো চিনে না। কে কাম দিব!

'বাচনের চেষ্টা করতে হইব না? কাম দিব না, এই কথা ভাব ক্যান? মহাজনগো গদীতে বার বার যাও। দুয়ারে দুয়ারে ঘোর। চিনাশুনা হউক জানাশুনা হইতে হইতেই কাম পাইবা।'

অবাক হয়ে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে হারাণ। এ যেন আর এক কাপাসী। যে কাপাসী অবুঝ অস্বাভাবিক হাসিতে মেতে থাকে, এ যেন সে নয়। এই কাপাসী দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, দুশ্চিন্তার দিনে পাশে এসে দাঁড়ায়। পরামর্শ দেয়। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যোঝার উপায় বলে দেয়।

কাপাসীর কথামত ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত হারাণ আর নিত্য ঢালী কাজ জুটিয়ে ফেলেছিল। বিড়ি বাঁধার কাজ।

প্রথম দিন কাজ সেরে কাপাসীর কাছে এসে বসেছিল হারাণ। বলেছিল, 'তোমার লেইগাই কামটা পাইলাম।'

কাপাসী কিছু বলে নি।

হারাণ ফের বলেছে, 'কথা কও না ক্যান কাপাসী?

এবারও কিছু বলে নি কাপাসী। উদাস বিষণ্ণ মুখটা তুলে ধরেছে। কি যেন ভাবছিল সে।

হারাণ আবার বলেছে, 'দিনরাইত অত কী ভাব কাপাসী?'

'কী ভাবি শুনতে চাও?'

'হ।'

'ভাবি তমস্ত জনম কি এমন কইরা কাটামু? কুত্তা বিড়ালের লাখান কত কাল কাটান যায়?'

এ প্রশ্নের জবাব হারাণের জানা নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে সে কাপাসীর মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে

কাপাসী বলেই যাচ্ছিল, 'আর কি আমরা মাটি পামু না? আর কি আমরা ঘর দুয়ার সোংসার পাততে পারুম না?'

'কি জানি!' অস্ফুট গলায় হারাণ জবাব দিয়েছে।

'কুনোখানে যদি থিতু হইয়া বইতে পারি, বড় ভাল হয়। তোমরা আমরা পাশাপাশি থাকুম। পাশাপাশি ক্যান, এক লগেই থাকুম।' হারাণের একটা হাত ধরে কাপাসী নিজের খুশিতে বলে যেত, আর হারাণের বুকের ভিতরটা বিচিত্র সুখে কাঁপতে থাকত।

এমন করেই দিন যায়, মাস যায়, ঋতুর চাকায় সময় পাক খায়।

কাপাসী কখনও আশার কথা শোনায়। কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হেসে নিরাশ করে। এই আশা, এই নিরাশা।

আশায় নিরাশায় দোল খেতে খেতে আরো একটা বছর পার হল।

দু বছর পর খবর এল, কালাপানি অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দিয়ে আন্দামান দ্বীপে গেলে পুনর্বসতি মিলবে। জমি-জিরেত, হাল-হালুটি বাস্তু—বর্ডারের ওপারে তারা যা হারিয়ে এসেছে, সব ফিরে পাবে।

খবরটা নিয়ে এসেছিল নিত্য ঢালী।

সেদিন বিড়ি বাঁধার কাজে যায় নি সে। 'রিফুজি' অফিসে ক্যাশ ডোল আনতে গিয়ে এই খবরটা শুনেছে। আর শুনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসেছে।

নিত্য ঢালী বলছিল, 'আন্ধারমান দ্বীপে গেল হগল মিলব। বাস্তু, চাষের জমিন বেবাক। অহন কী করণ?'

উজানী বুড়ী শুধিয়েছিল, আন্ধারমান দ্বীপ কুন খানে?'

'হেই কালাপানি, সমুন্দর পাড়ি দিয়া যাইতে হয়। জাহাজে ইস্টিমারে পাচ দিন লাগে।'

'ক'স কী নিত্যা?'

'ঠিকই কই। যা শুইনা আইলাম হেয়া মিথ্যা না।'

'জানি না, শুনি না, এমুন জায়গায় যাওন কি ঠিক হইব নিত্যা?'

'হেই কথাখানই তো ভাবি।' নিত্য ঢালী বলেছিল, 'একদিন দুইদিনের পথ না। জলের উপর দিয়া পুরা পাচ দিনের পথ। হে কি এইখানে মাসি!'

দু জনেই কথা বলছিল। কাপাসী স্টেশনের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। হারাণ তখনও কাজ থেকে ফেরে নি।

উজানী বুড়ী বলেছে, 'না রে নিত্যা, অতদূরে যাওনের কাম নাই। এই বেশ আছি।'

এই দু বছর ইঁট দিয়ে ঘেরা চার পাঁচ হাত বে-আব্রু খোলা জায়গায় আর সামান্য কয়েক টাকা ক্যাশ ডোলের মাপে জীবনটাকে আশ্চর্য ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে উজানী বুড়ীরা। প্রথম প্রথম ভারী অসুবিধা হত, পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই পাঁচ হাত জায়গার ওপর বড় মায়া তখন তাদের।

আশ্চর্য মানুষের জীবন! আশ্চর্য তার খাপ খাওয়াবার ক্ষমতা।

আগে আগে বাপ-শ্বশুরের বাস্তুর জন্য উজানী বুড়ী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত। দু বছরের মধ্যেই শিয়ালদা স্টেশনের সেই পাঁচ হাত জায়গার জন্য তার বড় টান দেখা গিয়েছিল। এ জায়গা ছেড়ে আন্দামান দ্বীপের অনিশ্চিত জীবনে সে ঝাঁপ দিতে চায় নি।

অনেক রাত্রে সেদিন হারাণ ফিরে এসেছিল।

উজানী বুড়ী শিয়ালদা বাজারে প্যাকিং বাক্সের টুকরা টাকরা কাঠের খোঁজে বেরিয়েছিল। জ্বালানির কাজে লাগবে। নিত্য ঢালীও ছিল না, সে কোথায় যেন গিয়েছিল।

কাপাসী একা একা বসে ছিল প্ল্যাটফর্মে, তাদের নির্দিষ্ট সীমানায়।

কোনোদিন নিজে থেকে যেচে কথা বলত না কাপাসী। সেদিন কিন্তু বলেছিল।

উজানী বুড়ীকে না দেখে হারাণ চলে যাচ্ছিল। কাপাসী ডেকেছে,

'শোন—'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে হারাণ। তারপর আস্তে আস্তে কাপাসীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কী কও ?'

'বস, কামের কথা আছে।'

হারাণ বসে পড়েছে।

কাপাসী বলছিল, 'একখান নয়া খবর আছে।'

'কী খবর ?' উৎসুক চোখে কাপাসীর মুখের দিকে তাকিয়েছে হারাণ।

'বাপে খবর আনছে, পাচ দিন সমুন্দর পাড়ি দিয়া যাইতে পারলে আন্ধারমান দ্বীপ মিলে। হেইখানে গেলে ঘরদুয়ার, জমিন, হালহালুটি মিলব'

খবরটা হারাণও শুনেছে।

শিয়ালদা স্টেশনে তো তারা আর কাপাসীরা, এই দু ঘর রিফুজিই নেই। আরো অনেক বাস্তুহারা দুর্ভাগা মানুষ গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে পড়ে আছে। এর মধ্যেই আন্দামান দ্বীপের খবরটা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কাজ থেকে ফেরার পথে হারাণ সবই শুনে এসেছে। সে বলেছিল, 'আন্ধারমান দ্বীপের কথা আমি শুনছি।'

কাপাসী বলেছিল, 'বাপে আর তোমার ঠাকুরমায় তো যাইতে চায় না।'

'ক্যান ?'

'ডরে।' কাপাসী বলেছে, জলের উপুর দিয়া পাচ দিনের পথ। তার উপুর অচিনা দ্যাশ। ডর তো লাগেই।'

হারাণ কিছু বলে নি, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়েছে।

কাপাসী থামে নি, 'কিন্তুক ডর লাগলে তো চলব না! এমুন কইরা এই পাচ হাত জায়গায় কত কাল থাকন যায়! দুই দিন, দশ দিন, বড় জোর দুই এক বছর। তমস্ত জনম কী চলে!'

প্রথমটা অবাক হয়ে গেছে হারাণ। কাপাসীর কাছ থেকে এ জাতীয় কথা সে আশা করে নি। পরক্ষণে সায় দিয়ে বলেছে, 'ঠিকই তো।'

'যদি বোঝ ঠিক, তা হইলে বাপেরে আর ঠাকুরমায়েরে বুঝাও। এমুন ভাবে বাচনের থিকা মরণ ভাল। ঘর গেছে, বাস্তু গেছে, আন্ধারমানে গেলে যদি বেবাক ফিরা পাই, যাইতে দোষ কী ?'

'ঠিক—' হারাণ মাথা নেড়েছে, 'মইরাই তো আছি। আন্ধারমান দ্বীপে যদি জমি জিরাত পাই, বাচনের চেষ্টা তো করতে পারি।'

'তা হইলে হেই ব্যবস্থাই কর।' কি যেন একটু ভেবে কাপাসী বলেছিল, 'আমার বাপ আর তোমার ঠাকুরমা কয়দিন বাচব ? তাগো দিন তো ফুরাইয়া আইছে। কিন্তু তুমি আমি আরো অনেক বচ্ছর বাচুম। এই পাচ হাত জমিনে আমাগো তমস্ত জনম চলব না।'

'ঠিকই—'

কাপাসীর গলা এবার গাঢ় শুনিয়েছে, 'কম কইরা একখানা ঘর চাই। চাইর পাশে চাইর খান বেড়া আর উপুরে চালের আবডাল থাকব। হেই ঘরে তুমি আমি সোংসার পাতুম। এত মানুষের মইধ্যে এই আ-ঢাকা, বে-আবডাল জায়গায় কী সোংসার পাতা যায়। তুমিই কও পুরুষ?'

'ঠিকই' অস্ফুট গলায় হারাণ বলেছে।

তাকে নিয়ে কাপাসী সংসার পাতবে। কথাটা শুনতে শুনতে বুকের ভেতর শিহরণ খেলে গিয়েছিল হারাণের।

কাপাসীকে যেন কথায় পেয়েছে সেদিন। সে থামে নি, 'সোংসারে কত কিছুই তো গোপন রাখতে হয়। কিন্তুক এইখানে কিছুই গোপন নাই। যা করবা, যা কইবা, হগলই মাইনষের চৌখে পড়ব, মাইনষের কানে যাইব।'

কাপাসীর জেদের ফলেই হারাণরা একদিন জাহাজে উঠল। পদ্মা মেঘনার দেশ কোথায় পড়ে রইল। মাটির আশায়, বাঁচার আশায়, হাজার মাইল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে তারা আন্দামান দ্বীপে রওনা হল।

বাইরে ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্না। চাঁদের আলোতে পাহাড়-জঙ্গল-টিলা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আবছা কুয়াশায় বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা কেমন যেন মায়াবী মনে হয়।

নাঃ, এখনও ঘুম আসছে না। ঘুম বুঝি আজ আর আসবে না। বুকের ভিতরটা খা খা করতে থাকে।

কাপাসী আশা দিয়েছিল, তাকে নিয়ে সংসার পাতবে। সেই আশায় বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে এসেছে হারাণ। কিন্তু সব কথা বুঝি ভুলে গেছে কাপাসী। না হলে তার সায় না থাকলে নিত্য ঢালী কি বিদেশী বিজাতিকে ঘরে এনে তুলতে পারত? কথাটা যতই ভাবল, মাথার ভিতরটা গরম হয়ে উঠল। কপালে তামার তারের মত সরু সরু অসংখ্য শিরা চিন চিন করছে।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। সেই বাতাস হারাণের জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারল না।

শিয়রের জানালার ওপরে জোনাকিগুলো এখনও জ্বলছে, নিবছে। শূন্য ফাঁকা চোখে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল হারাণ।

গলার কাছটা ভারী, ব্যথা ব্যথা। বুকের ভিতর থেকে একটা অসহ্য কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে গলার কাছে এসে আটকে ছিল। এতক্ষণে সেটা পথ পেয়েছে। মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে হতাশায় দুঃখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল হারাণ। কান্নার দমকে শরীরটা থরথর কাঁপতে লাগল।

উদ্ধব বৈরাগীর ঘরে কথা হয়েছিল, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পালসাহাব ফিরে এলে যা হোক একটা বিহিত করা হবে। কিন্তু হারাণের তর সইল না। সকালে উঠেই মাথায় অসহ্য তাপ, বুকের ভিতর অফুরন্ত দুঃখ, উত্তেজনা আর ক্ষোভ নিয়ে নিত্য ঢালীর ঘরের দিকে ছুটল।

নিত্য ঢালীর ঘরে যেতে হলে উতরাই বেয়ে উঠতে হয়। উতরাইটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা আধপোড়া প্যাডক গাছ। ডালপালা আর ছাল পুড়ে গাছটা কবন্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে।

ওপরে উঠতে উঠতে আধপোড়া গাছটার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হারাণ এখান থেকে নিত্য ঢালীর ঘর এবং উঠোন পরিষ্কার দেখা যায়।

সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। উঠোনে সেই পুরু-ঠোঁট, কুচকুচে কালো. কোঁকড়ানো-চুল লোকটা অর্থাৎ পানিকর ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হারাণের ইচ্ছা হল, ছুটে গিয়ে লোকটাকে থাপ্পড় মেরে আসে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো আর তা করা যায় না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হারাণ কি যেন ভাবল, তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

অনেক কথাই ভেবে এসেছিল হারাণ। ভেবেছিল, কাপাসীকে জিজ্ঞেস করবে, কেন সে বিদেশী বিজাতিকে ঘরে জায়গা দিল? জিজ্ঞেস করবে, শিয়ালদা স্টেশনে যে কথা কাপাসী বলেছিল, এই দ্বীপে এসে সে সব কি একেবারেই ভুলে গেছে?

ভেবে এসেছিল অনেক কিছুই কিন্তু বলা আর হল না। টলতে টলতে উতরাই বেয়ে নামতে লাগল সে।

হারাণ যখন ঘরে ফিরল, রোদ বেশ তেতে উঠেছে। জঙ্গলের মাথা টপকে সূর্যটা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে।

উঠোনে পা দিয়েই হারাণ চমকে উঠল। আর এক মাথায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে উজানী বুড়ী আর কুমী।

উজানী বুড়ী মেটে পাতিলে জাউ বসিয়েছে। উনুনের মুখে শুকনো পাতা গুঁজতে গুঁজতে গুজ গুজ করে সে কুমীর সঙ্গে কথা বলছে। কি বলছে, এত দূর থেকে হারাণ বুঝতে পারে না।

কুমীর চোখ দুটো চরকির মত ঘোরে। ইন্দ্রিয়গুলো তার খুবই প্রখর। বুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেমন করে যেন সে হারাণের অস্তিত্ব টের পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা ঘুরিয়ে তাকায়।

হারাণকে দেখেই ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় কুমী। উজানী বুড়ীকে বলে, 'অখন যাই গো মাসি। সুযুগ পাইলে আবার আসুম।' আজ মোহিনী সেজেছে কুমী।

হারাণ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়েই পথ। মোহিনী কুমী চিকন মাজা বাঁকাতে বাঁকাতে হারাণের সামনে এসে একটু দাঁড়াল। সেই হাসিটা হাসল যাতে ধার আছে কিন্তু শব্দ নেই। তারপর সারা দেহে ঢেউ তুলে আবার চলতে শুরু করল।

কুমী যেই চোখের আড়াল হল, অমনি জাউ ফেলে ছুটে এল উজানী বুড়ী হারাণের হাত ধরে টানাটানি শুরু করল।

হারাণ অবাক হয়ে আছে। কাপাসীর ব্যাপার নিয়ে সেদিন ঝগড়া হয়েছিল। তারপর থেকে পারতপক্ষে উজানী বুড়ী তার সঙ্গে কথা বলে না! আজ তার কি হয়েছে কি জানে! হাত ধরে টানতে টানতে হারাণকে জাউয়ের পাতিলটার কাছে এনে বসাল। হাউ হাউ করে খুব একচোট কাঁদল। শুকনো কোঁচকানো গাল বেয়ে টস টস করে ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল ঝরতে লাগল তার।

হারাণের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে উজানী বুড়ী বলতে লাগল, 'লক্ষ্মী, সুনা ভাই। আমার কাছে আয়, আমার বুকে আয়—'

বিস্ময়ের ঘোর খানিকটা কেটে গেলে হারাণ বলল, 'হইছে কী? অত সুহাগ ক্যান?'

'তরে সুহাগ করুম না তো করুম কারে?' দু হাতে হারাণের গলাটা জড়িয়ে ধরে উজানী বুড়ী বলে, 'আছে কে আমার? তুই ছাড়া পিরথিমীতে আমার কেও নাই রে হারাইণা। তুই ছাড়া আমার বেবাক আন্ধার। তুই আমার চোখের মণি—' বলেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে।

'হগলই বুঝলাম। কিন্তুক—' বিরক্ত গলায় হারাণ বলে, 'অত সুহাগ এই কয়দিন আছিল কুন খানে? মতলবখান কী তর?'

'মতলব আবার কী রে হারাইণা? নিজের নাতিরে এট্টা সুহাগ আহ্লাদ করতে পারুম না?'

হারাণ জবাব দিল না।

উজানী বুড়ী বলতে থাকে, 'আপনজন কইতে তুই। বান্ধব কইতে তুই। তুই যদি অমুন বিবাগী হইয়া ঘুইরা বেড়াস, আমার ভাল লাগে? তুই ক'?'

দু হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরেছে উজানী বুড়ী। আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে হারাণ উঠে পড়ল।

মনে সুখ নেই। সুখ না থাকলে হাজার মিঠে কথা, হাজার সোহাগ—কিছুই ভাল লাগে না।

উঠোনের এক কিনারে একটা প্যাড়ক গাছ। দুপুরে তার ছায়ায় খেতে বসেছিল হারাণ। হারাণের পাতে জাউ আর মায়া মাছের ঝোল দিতে দিতে উজানী বুড়ী ডাকল, 'সুনা ভাই—'

হারাণ জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মত জাউ নাড়াচাড়া করতে লাগল।

উজানী বুড়ী আবার ডাকল, 'লক্ষ্মী দাদা, আমার কথাখান শোন—'

হারাণ মুখ তুলল। চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'কী ক্যাচর ক্যাচর লাগালি ঠাকুরমা?'

নিদাঁত ফোকলা মুখে একটু হাসল উজানী বুড়ী। তারপর খুব উৎসাহিত হয়ে বলল, 'একখান খপর শুনছস ভাই?'

'কী খবর?'

'থাউক থাউক, মোন্দ কথা শুইনা তর কাম নাই।' একটু দম নিয়ে উজানী বুড়ী বলতে থাকে, 'বিহানে কুমী আইছিল। হেই মাগীই কইয়া গেল। সত্য-মিথ্যা ভগমান জানে।'

পাত থেকে হাত গুটিয়ে নিল হারাণ। চড়া গলায় বলল, 'কুমী মাগীরে তো দেখলাম। তরে কী কইছে?'

হারাণের মারমুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে বুড়ী ভয় পেয়ে গেল। তবে ভয়টা বুঝতে দিল না। রুক্ষ কোঁচকানো মুখটাকে মধুর একটি হাসিতে ভরিয়ে বলল, 'বড় মোন্দ কথা, তর শোননের কাম নাই। কুমী কইছে—'

'কী কইছে কুমী?' হারাণকে রীতিমত উত্তেজিত দেখায়।

'ঐ নিত্যা নিকি বিদেশী বিজাতিরে ঘরে আইনা তুলছে। কুমী কইল—বলতে বলতে থেমে গেল উজানী বুড়ী।

'এট্টু কইরা ক'স, বাকিটুক প্যাটের ভিতর রাখস! একলগে পুরাটা কইতে তর হয় কী?' হারাণ খেঁকিয়ে উঠল।

ভীরু গলায় উজানী বুড়ী এবার বলে, 'কুমী কয়, নিত্যা নিকি কাপাসীর লগে বিদেশীর বিয়া দিব।'

তীক্ষ্ন গলায় হারাণ চেঁচিয়ে উঠল, 'মিছা—'

'সাচা হউক, মিছা হউক, তর আমার কী?' হারাণের একটা হাত ধরে উজানী বুড়ী বলে, 'তর খাওয়া তুই খা। নিজের মাইয়া হেয় অজাত-বিজাত-কুজাত—যার হাতে দেউক, তর আমার কী?'

হারাণ পাতে হাত দেয় না। ঘাড়টা গোঁজ করে বসে থাকে।

উজানী বুড়ী বোঝায়, 'পরের উপুর তো হাত নাই। নিজের মাইয়ারে যদি নিত্যা লুটাইয়া দ্যায়, পুড়াইয়া দ্যায়, কী করণ?' দু হাত ঘুরিয়ে বলে,

'কিছুই না। বুড়া বয়সে নিত্যার মতিগতি খারাপ হইয়া গেছে। না হইলে বিজাতিরে ঘরে আইনা তোলে, না তার লগে মাইয়ারে বিয়া দিতে চায়! হা ভগমান, কত লীলাই দেখাইলা।'

হারাণ জবাব দেয় না। ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকে সে। উজানী বুড়ীর দিকে একবারও তাকায় না।

উজানী বুড়ী নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'উই নষ্ট-শরীল, মাথা-খারাপ মাগীটার লেইগা মন খারাপ করিস না দাদা। উই মাইয়া নিয়া কী হইব? সোমাজ-সংসারে কোনো কামেই আইব না। অরে যদি ঘরের বউ কইরা আনি হগলে গায়ে ছ্যাপ (থুতু) দিব। কাপাসীর চিন্তা তুই ছাড় হারাইণা।'

একসঙ্গে অনেকক্ষণ বকেছে। উত্তেজনায় পরিশ্রমে হাঁপাতে থাকে উজানী বুড়ী। নাকের ডগায় কপালে কণা কণা ঘাম দেখা দেয়। হাঁপানির তালে তালে শুকনো বুকটা কাঁপতে থাকে। টেনে টেনে দম নেয় সে। হাঁপানির দাপট একটু কমলে আবার শুরু করে, 'আমার সুনা ভাইর আবার বিয়ার চিন্তা! উই মাগী ছাড়া পিরথিমীতে য্যান আর মাইয়া নাই! ভগমান যেন ঐ একখান মাইয়াই বানাইছে!'

গোয়ালন্দের স্টীমারে কাপাসীর হাসি শুনে মনটা বিরূপ হয়ে গিয়েছিল। এতদিনেও সেই বিরূপ ভাবটা কিছুতেই ঘুচল না উজানী বুড়ীর। তার ওপর যেদিন শুনল, কাপাসীর শরীর নষ্ট, মাথাটা খারাপ, সেদিন থেকেই হারাণকে তার সঙ্গে বেশি মিশতে দেয় নি। সব সময় আগলে আগলে রেখেছে।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক যে মেয়ের শরীর নষ্ট হয়ে গেছে সমাজে ধর্মে সে অচল। তার দাম কানাকড়িও না। তাকে নিয়ে কী করবে উজানী বুড়ী?

হঠাৎ হারাণ ডাকল, 'ঠাকুরমা—'

'কী ক'স?'

'তুই সত্যই জানস নিত্য তালুই বিদেশীর লগে কাপাসীর বিয়া দিব?'

'কুমী তো হেই কথাই কইল।' উজানী বুড়ী বলে যায়, 'উই ভাবনা ছাড় দাদা। অঘ্রাণ মাসে ধান উঠলে আমিও তরে বিয়া দিমু। চন্দরের কাছে আমি আইজই যামু। তার মাইয়া পাখি বড় সোন্দর, বড় ভাল। তার পাশে যা মানাইব। যুগল মিলন হইব।' ফোকলা মুখে হাসে উজানী বুড়ী।

হঠাৎ পাতের সামনে থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় হারাণ। চেঁচাতে থাকে, 'থাম বুড়ী। পাখির লগে আমার বিয়ে দিতে চায়! আহ্লাদ কত!' চেঁচাতে চেঁচাতেই হারাণ ঘরে গিয়ে উঠল।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল উজানী বুড়ী। একটু ধাতস্থ হয়ে চিলের মত ধারাল গলায় চিল্লাতে শুরু করল, 'জানি জানি, উই মাগী তর মাথা খাইছে। অর মইধ্যে কি মধু পাইছস, তুই-ই জানস। উই পেত্নী ঘাড় থিকা না

নামা ইস্তক তর মতিগতি কি ভাল হইব ? উই মাগী তরেও সোয়াস্তি দিব না, আমারেও না। হা ভগমান—' চেঁচাতে চেঁচাতে নিজের শুকনো অস্থিসার বুকে দুম দুম করে কিল মারতে থাকে উজানী বুড়ী।

৪৪

দিন তিনেকের মধ্যে মোটামুটি একখানা ঘর তুলে ফেলল নিত্য ঢালী। প্যাডক কাঠের খুঁটি, ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া আর বেতপাতার চাল। চালটা এখনও পুরোপুরি ছাওয়া হয় নি।

এখন সকাল।

উঠোনের এক পাশে কাঁচা বেতপাতা স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। নিত্য ঢালী চাল ছাইছে। পানিকর নিচ থেকে বেতপাতার গোছ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

উঠোনের আর এক পাশে একটা ঝাঁকড়া চুগলুম গাছ। তার ছায়ায় বসে সিপি সাফ করছে লা তে। টার্বো, ট্রোকাস, নটিলাস, নী-ক্লাম—নানা জাতের সমুদ্রচর কড়ি আর শামুক। তাদের শক্ত খোলের ওপর চুন আর নুন জমাট বেঁধে আছে। লা তে সিপিগুলোর গায়ে অ্যাসিড ঢালে। সঙ্গে সঙ্গে নুন আর চুনের কঠিন আবরণটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেঁজে উঠতে থাকে। অ্যাসিডে-পোড়া নুন এবং চুনের উগ্র উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

নিত্য ঢালীকে বেতপাতা যোগান দিতে দিতে ফুরসুত বুঝে লা তে'র কাছে আসে পানিকর। তাকে তালিম দেয়, 'জেয়াদা অ্যাসিড ঢালবি না লা তে। সমঝালি ?'

'হাঁ—' ঘাড় কাত করে লা তে বলে।

'ইয়াদ রাখবি, জেয়াদা অ্যাসিড ঢাললে সিপি টুটাফাটা হয়ে যাবে।'

অল্পক্ষণ লা তে'র কাছে বসেই উঠে পড়ে পানিকর। অস্থির পায়ে উঠোনময় পায়চারি করে। চনমন করে এদিক সেদিক তাকাতে থাকে।

ঘরের মাথা থেকে নিত্য ঢালী ডাকে, 'পানিকর বাবা—'

'হাঁ হাঁ—' পানিকর ছুটে আসে।

'পাতা দ্যান—'

একসঙ্গে পানিকর অনেকগুলো বেতপাতার গোছা ছুঁড়ে দেয়, যাতে নিত্য ঢালী বেশ কিছুক্ষণ তাকে ডাকতে না পারে।

বেতপাতা দিয়ে এসেই আবার ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় পানিকর। এদিক সেদিক কাকে যেন খোঁজে।

ঘাড় গংজে সিপি সাফ করছিল লা তে। হঠাৎ সে ফিস ফিস করে ডাকল, 'মালেক—'

'কী-কী-কী—' এক দৌড়ে লা তে'র কাছে চলে এল পানিকর। বলল, 'অত ডাকাডাকি করছিস কেন ? হয়েছে কী ?'

বর্মী লা তে'র চাপা কুতকুতে চোখে, থ্যাবড়া নাকে, পুরু তামাটে ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসি খেলে বেড়ায়।

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'কুত্তা, হাসছিস কেন ?'

নিপাট ভাল মানুষের মত লা তে জবাব দেয়, 'হাসছি না তো মালেক—'

'ডাকছিলি কেন ?'

পানিকরের কানে মুখটা গংজে খুব আস্তে লা তে বলে, 'কাকে খংজছেন ?'

পানিকর ক্ষেপে উঠল, 'যাকেই খংজি তোর তাতে কি রে হারামীর বাচ্চা ?'

'কুছু না, কুছু না—' লা তে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসতে লাগল। একসময় হাসিটা থামিয়ে হঠাৎ বলল, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না—'

পানিকর গর্জে উঠল, 'কী ভাল না রে শালে—'

লা তে জবাব দেবার আগেই ঘরের চাল থেকে নিত্য ঢালী ডাকল, 'পানিকর বাবা—'

'কী ?' পানিকর ফের ওদিকে ছুটে গেল, 'এই তো বেতপাত্তি দিয়ে গেলাম। আবার ডাকছ কেন ?'

'দড়ি দ্যান।'

এক লাছি নারকেল দড়ি ছংড়ে দিল পানিকর।

একদিকে নিত্য ঢালী, আর একদিকে লা তে। তাঁতের মাকুর মত দুজনের মধ্যে পানিকর ছোটাছুটি করে। এরই ভিতর একসময় তার নজর পড়ে যায়। চাল ধুতে কিলপণ্ড নদীতে গিয়েছিল কাপাসী। এইমাত্র ফিরেছে। উতরাই বেয়ে বেয়ে সে ওপরে উঠে আসছে।

উঠোনের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পানিকর। তার চোখ দুটো ছুরির ফলার মত ঝকমক করতে থাকে।

চালের হাঁড়ি নিয়ে পানিকরের পাশ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল কাপাসী। একটু পর ফাঁক বুঝে হংকো-কলকে—তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে কাপাসীর কাছে এল পানিকর।

উঠোনের শেষ মাথায় ক্যাঁচা বাঁশের বেড়ায় ঘিরে একটা দোচালা তুলে দিয়েছে নিত্য ঢালী। এটাই কাপাসীর রান্নাঘর। সেখানে এসে উবু হয়ে বসল পানিকর।

প্রথমে পানিকরকে দেখতে পায় নি কাপাসী। পেছন ফিরে বসে উনুনের

মুখে শুকনো পাতা আর সরু ডাল গুঁজে দিচ্ছিল সে। মেটে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। সরার ফাঁক দিয়ে হাল্কা সাদা ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে যাচ্ছে।

উদাস চোখে হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজের খেয়ালে কি যেন বিড় বিড় করে বকে যায় কাপাসী।

ফিস ফিস করে পানিকর ডাকল, 'কাপাসী—'

'কে?' চমকে ঘুরে বসল কাপাসী। হঠাৎ ডাকটা শুনে সে বুঝি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তার চোখমুখ থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে যায়। খুব নরম গলায় সে বলে, 'পানিকর ভাই—'

'হাঁ—'

'বসেন বসেন—' কাপাসী বলতে থাকে, 'তামুক খাইবেন? আগুন চাই?'

পানিকর মাথা নাড়ে, হাসে। এতক্ষণ সে উবু হয়ে বসেছিল, এবার পা ছড়িয়ে জুত করে বসল।

তামাক পোরা কলকেটা কাপাসীর হাতে এগিয়ে দেয় পানিকর। কাপাসী উনুনের ভেতর থেকে খানিকটা গনগনে আগুন তাতে তুলে দেয়।

তামাক খাওয়ার অভ্যেস কোনোকালেই ছিল না পানিকরের। নিত্য গলীই তাকে এই নেশাটা ধরিয়েছে। নেশা ধরা সোজা, কিন্তু ছাড়া কঠিন। আজকাল তামাক ছাড়া পানিকরের চলে না। সময়মত এক ছিলিম না পেলে গলাটা কেমন যেন খুচখুচ করে।

হুঁকো টানতে টানতে মৌতাত ধরে যায়। তামাকটা বেশ কড়া। যত কড়াই হোক, শুধু তামাকে পানিকরের শানায় না। তাতে খানিকটা গাঁজা মিশিয়ে নিয়েছে সে।

গাঁজা মেশানো তামাকের গুণ আছে। নেশাটা যখন চরমে ওঠে, মাথার সরু সরু রগগুলি চিন চিন করতে থাকে। তখন চোখের সামনের দুনিয়াটা আসল রং হারিয়ে ফেলে, ঘোর ঘোর নেশাময় এক রঙীন স্বপ্ন হয়ে ওঠে।

হুঁকো টানে আর ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ে পানিকর। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জড়ানো গলায় ডাকে, 'কাপাসী—'

'কী ক'ন পানিকর ভাই?'

'তুমি মাদ্রাজ শহরে গেছ?'

'না, গেলাম আর কই?'

'যাবে?'

'কে লইয়া যাইব?'

পানিকর এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'কেন, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

'সাচা ক'ন? ঘাড়টা বাঁকিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকায় কাপাসী।

'হাঁ হাঁ, জরুর সচ্।' পানিকর আরো একটু ঘন হয়ে বসে। আস্তে

আস্তে বলে, 'মাদ্রাজ শহরে গেলে তোমার বহুত ভাল লাগবে।'

রান্নাঘরের সামনেটা জুড়ে বসে আছে পানিকর। তার মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে বাইরে, অনেক অনেক দূরে পাহাড়-টিলা জঙ্গল পেরিয়ে কোথায় যেন পৌঁছে দেয় কাপাসী। আকাশটা আশ্চর্য নীল। মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। শুধু একঝাঁক কী যেন পাখি ডানা মেলে বাতাসে ভাসছে।

অনেক দূরে দৃষ্টিটাকে হারিয়ে কী দেখছে কাপাসী? আকাশ? পাখি? টিলা-জঙ্গল-পাহাড়? কাপাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল পানিকর, পারল না। কাপাসীর চোখদুটো বড় দুর্বোধ্য।

পানিকর ডাকল, 'কাপাসী—'

কাপাসী সাড়া দিল না।

পানিকর নিজের খেয়ালে বকে যায়, 'দো মাহিনার অন্দর সিপি সাফ হয়ে যাবে। সিপিগুলো এজেন্টের কাছে বেচে তোমাকে আর নিত্য চাচাকে মাদ্রাজ নিয়ে যাব। হাঁ, জরুর—'

এবারও কিছু বলে না কাপাসী। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

পানিকর থতমত খায়। থতিয়ে থতিয়ে বলে, 'হাসছ কেন? তোমার বুঝি বিশোয়াস হচ্ছে না?'

আস্তে আস্তে হাসছিল কাপাসী। হঠাৎ হাসিটা কলকলিয়ে মেতে উঠল। বরাবর যেমন হয়, হাসির দাপটে তার শরীরটা বেঁকে দুমড়ে ডেলা পাকিয়ে যেতে থাকে।

কী বুঝল পানিকরই জানে। বেজার মুখে উঠে পড়ল। মনে মনে কী একটা গূঢ় মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে উঠোনে চলে এল।

চুগলুম গাছটার মাথায় একটা ভীমরাজ পাখি ডেকে ডেকে খুন হচ্ছে। নিচে ঘাড় গুঁজে সিপি সাফ করছে লা তে। হঠাৎ সে মুখ তুলল। ডাকল, 'মালেক—'

কাছে এসে পানিকর বলল, 'কী বাত?'

'একটাই বাত।'

পানিকর দেখল, বর্মী লা তে'র চাপা কুতকুতে চোখদুটো ঝিক ঝিক করছে। থ্যাবড়া নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে। খাড়া চোয়াল এখন শক্ত। একটু যেন ভয়ই পেল পানিকর। কাঁপা গলায় বলল, 'কী বাত, জলদি বল।'

'বলব, জরুর বলব মালেক। থোড়া বসুন তো।'

অগত্যা কি ভেবে যেন পানিকর লা তে'র পাশে বসেই পড়ে। বলে, 'বল—'

কাপাসীর হাসি এখনও থামে নি। রান্নাঘরে তীব্র অস্বাভাবিক শব্দ করে সে হেসেই চলেছে।

লা তে ফিস ফিস করে বলে 'মালেক, নিত্য ঢালীর লেড়কী অ্যায়সা হাসছে কেন ?'

পানিকর খেঁকিয়ে উঠল, 'হাসছে কেন, আমি তার কী জানি রে কুত্তা ?'

গালাগালিটা গায়ে মাখে না লা তে। দাঁত বার করে টেনে টেনে কেমন করে যেন হাসে। পানিকরের বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

লা তে বলে, 'সচ্ বলছেন, আপনি জানেন না ?'

'না রে হারামী, না।' পানিকর গজরাতে থাকে।

'তামাকের আগ আনতে গেলেন আর নিত্যর লেড়কী হাসতে লাগল। আমি সোচলাম জরুর আপনি কুছ তামাসার কথা বলেছেন কাপাসীকে। না হ'লে হাসবে কেন ?'

পানিকর আর কিছু বলে না। গজরাতে গজরাতে উঠে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে লা তে'ও উঠে দাঁড়ায়। পানিকরের কানে মুখটা গুঁজতে গুঁজতে বলে, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না। বহুত বুরা (খারাপ) কাম।'

এমন করেই দিন যায়।

একদিন নিত্য ঢালী ঘর বানানো শেষ করে সিঁপি সাফের কাজে লাগে।

আজকাল চুগলুম গাছটার ছায়ায় বসে তিন জনে সিঁপি সাফ করে। লা তে পানিকর আর নিত্য ঢালী।

সিঁপি পরিষ্কার করতে করতে ফুরসত পেলেই উঠে পড়ে পানিকর। কাপাসীর কাছে গিয়ে বসে। তাকে মাদ্রাজ শহরের গল্প শোনায়। বলে, 'কাঞ্জিভরম শাড়ি কিনে দেব। মাদ্রাজী কাঙনা আর হাঁসলী কিনে দেব।'

এ-কথা সে-কথা বলে আর হাজারটা লোভের ফাঁদ পাতে পানিকর। তার কথা শুনতে শুনতে কোনোদিন কাপাসীর চোখদুটো চক চক করে। সে বলে, 'সত্যই আমাগো মাদ্রাজ নিয়া যাইবেন পানিকর ভাই ? না মিছা আশা দ্যান ?'

পানিকর বলে 'না না, মিছা বাত আমি বলি না। আমি যখন আছি, নিত্য চাচাকে আর কাম করতে হবে না। বুড়ঢা মানুষ। কাম করতে কত তখলিফ হয়। একটু থেমে বলে, 'মাদ্রাজ শহরে আমার কোঠি আছে। সিঁপিগুলো সাফ করে নি। তারপরেই মাদ্রাজের জাহাজে উঠবে।'

কোনোদিন বা পানিকরের কথা শুনে শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে হেসে ওঠে কাপাসী।

কাপাসীর কাছ থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে লা তে পানিকরকে ডাকে। তার কানে মুখটা ঢুকিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'এ ভাল না মালেক, ভাল না।'

এমন করেই দিন যায়।

পোর্ট ব্লেয়ারের কাজ চুকিয়ে দিন কয়েক পর পালসাহাব ফিরে এসেছে।

এখন বিকেল। তার নিজের ঝুপড়ির সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পালসাহাব।

সামনে জঙ্গলের মাথায় এক ঝাঁক কাটৌরা পাখি উড়ছে, কখনও পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। ছোট ছোট ডানায় ঘা মেরে বাতাস তোলপাড় করছে।

এই দ্বীপে এর আগে কোনোদিন কাটৌরা পাখি দেখেছে কী? পালসাহাব মনে করতে পারল না। না পারার জন্য অবশ্য তার মাথাব্যথাও নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে পাখিদের নাচানাচি ওড়াওড়ি দেখতে থাকে সে।

এমন সময় তারা এসে পড়ল। তারা বলতে রসিক শীল, বুড়ী বাসিনী, হারাণ, যোগেন, উদ্ধব—ডিগলিপুর সেটেলমেণ্টের প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন বাসিন্দা।

পালসাহাব খুশি গলায় বলল, 'আও, আও শালে লোগ—'

সকলে কাছে এসে দাঁড়াল।

পালসাহাব আবার বলল, 'তোরা ভাল আছিস তো? দিল-তবিয়ত আচ্ছা?'

'কই আর ভাল রইলাম সাহাব বাবা? ভাল থাকনের কী জো আছে?' বুড়ো রসিক শীলের গলাটা বেজার শোনাল।

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'আবার কী হল তোদের।'

পালসাহাবের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল রসিক শীল।

পালসাহাব আবার চিল্লাল, 'কি রে, কথা কইছিস না কেন?'

ভয়ে ভয়ে রসিক শীল বলল, 'কি কমু সাহাব বাবা? আপনেরে কিছু কইতে ডর লাগে।'

এবার পালসাহাব হেসে ফেলে। নরম গলায় বলে, 'বল বল, ডর নেই।' হাত বাড়িয়ে রসিক শীলকে নিজের দিকে টেনে নিল সে।

সাহস পেয়ে রসিক শীল বলল, সাহাব বাবা, আপনে পুট বিলাস গেছিলেন, এই ফাকে নিত্য ঢালী বিদেশী-বিজাতি ঘরে আইনা তুলছে। ঘরে তার বিয়ার যুগ্যি মাইয়া।'

পালসাহাব কয়েকদিন পোর্ট ব্লেয়ারে ছিল। এর মধ্যে ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্টে কী ঘটেছে, কিছুই জানে না। আস্তে আস্তে সে বলল, 'নিত্য বুড্‌ঢা বিদেশী বিজাতিকে ঘরে এনে তুলেছে!'

'তবে আর কি কই সাহাব বাবা—'নতুন উদ্যমে শুরু করে রসিক শীল, 'ডর নাই, নিত্যার পরানখানে এতটুক ডর নাই।' বলে একটু থামে। কি যেন ভেবে আবার বলে, 'ঘরে ডাকাবুকা পাগল মাইয়া, তার উপুর দুই দুইটা জুয়ান বিদেশীরে ঘরে আইনা রাখছে। ভাবলেই তো বুক কাঁপে।'

অস্পষ্ট একটা শব্দ করে পালসাহাব। বিড় বিড় করে কি যে বলে, ঠিক বোঝা যায় না।

ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল হারাণ। এবার কনুই দিয়ে সবাইকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'এইর একখান বিহিত করতে হইব পালসাহাব। কোলোনিতে এই হগল চলব না।'

'কোন সব ?'

এই ক'দিন রাগ দুঃখ হতাশা এবং অসহ্য এক যন্ত্রণার মধ্যে কাটছে হারাণের। ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না, কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। সাতবার জিজ্ঞেস করলে একটা কথার হয়ত জবাব মেলে। মাথার চুল উড়ু উড়ু, রুক্ষ। চোখদুটো টকটকে লাল। চোখের নিচের হনুদুটো ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

হারাণ বলল, 'বদ মতলব নিত্য তালুইয় মনে। ক্যান উই বিদেশীরে ঘরে জায়গা দিছে, আমরা বুঝি। কিন্তুক পালসাহাব কোলোনিতে এই বদ কাম চলবে না। হ—সিধা কথা। আপনের কাছে এইর বিহিত চাই।

খানিকটা চুপচাপ। তারপর একসময় পালসাহাব বলল, 'সবই তো শুনলাম। লেকিন বিদেশী-বিজাতি কারা ?

'উই পানিকর আর লা তে।'

'ও! আভি সমঝা।' পালসাহাব বলতে লাগল, 'যার কাছে নিত্য বুড্‌ঢা কাজ করত, সেই পানিকর ?'

'হ।'

কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে রইল পালসাহাব। তারপর গাঢ় নরম গলায় বলল, 'দ্যাখ হারাণ, নিত্য বুড্‌ঢা বড় দুঃখী। ওর জিন্দগীতে সুখ নেই। এক রোজ আমাকে সব বলেছে নিত্য। ওর বিবি মরেছে, ওর লেড়কী পাগল বনে গেছে।' গলা ধরে যায় পালসাহেবের। কেশে কণ্ঠস্বর সাফ করে সে বলতে থাকে, 'বিদেশীকে ডেরায় রেখে ও যদি খুশি হয় তো হোক না। তবে হাঁ, যদি বেচাল করে শালের বাচ্চার জান তুড়ব। হাঁ—জরুর—নিত্য ঢালী সম্পর্কে পালসাহাবের অদ্ভুত এক দুর্বলতা আছে।

সাত পুরুষের ভিটেমাটি খুইয়ে, হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপের নতুন মানুষগুলি উপনিবেশ গড়তে এসেছে। বাস্তু তো সবাই হারিয়েছে। কিন্তু নিত্য ঢালীর মত বউ হারিয়েছে কে ? মেয়ে পাগল হয়েছে

কার ? এখনও যে নিত্য ঢালীর মাথাটা ঠিক আছে, এই কথাটা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে তাজ্জব বনে যায় পালসাহাব।

যে মানুষ বাস্তুভিটে এবং বউকে হারিয়ে, সর্বস্ব খোয়ানো একটা পাগল মেয়েকে নিয়ে বাঁচার আশায় এতদূরে এই দ্বীপে আসতে পারে, তার জন্য পালসাহাবের অফুরন্ত মমতা।

পালসাহাব বলল, 'এখন তোরা যা, আমি নিত্য ঢালীর সাথ মুলাকাত করব।

সবাই চলে গেল।

বড় আশা নিয়ে পালসাহাবের কাছ এসেছিল হারাণ। ভেবেছিল, বিহিত একটা কিছু হবে। তার বিশ্বাস ছিল, শোনা মাত্রই পালসাহাব নিত্য ঢালীর ডেরায় ছুটবে। বিদেশী-বিজাতিদের কলোনি থেকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু না, কিছুই হল না। একা একা টলতে টলতে চড়াই আর উতরাই বেয়ে কখন যে হারাণ কিলপঙ নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, নিজেরই হুঁশ ছিল না।

মধ্য ঋতুর দিনটা এখন মরতে বসেছে। রোদের তাপ নেই, তেজ নেই, জেল্লা নেই। চারদিক কেমন যেন বিষণ্ণ, উদাস।

গাছের যে পাতাগুলি এতক্ষণ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে রোদের আসব শুষছিল, সেগুলো যেন ঢলে পড়েছে। যে পাখিরা সমুদ্রে গিয়েছিল তারা দ্বীপে ফিরতে শুরু করেছে।

নদীর পাড়ে বাদামী রঙের ছোট ছোট নুড়ি পাথর। তার ওপর দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে চুপচাপ বলে রইল হারাণ।

পানিকররা নিত্য ঢালীর ডেরায় আসার পর কত বার যে কেঁদেছে হারাণ! একটু যেই নিরালা হয়, যেই কাপাসীর কথা মনে আসে, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে আকণ্ঠ অসহ্য একটা কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে হুড়মুড় করে গলা-নাক-মুখ-চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

চুপচাপ বসে বসে কাঁদছে হারাণ। কান্নার দমকে শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। সূঁচের মুখের মত একটা তীক্ষ্ন ধারাল যন্ত্রণা তাকে ক্রমাগত বিঁধছে যেন। টস টস করে চোখ থেকে নোনা জল ঝরতে থাকে তার।

কান্নার বুঝি শেষ নেই। চোখের জল হয়ত কোনোদিনই ফুরোয় না।

হাঁটুতে মাথা গুঁজে কতক্ষণ যে হারাণ বসে ছিল, খেয়াল নেই। জঙ্গলের মাথা থেকে মলিন আলোটুকু কখন মুছে গেছে, কখন ফিকে ধোঁয়া রঙের সন্ধ্যা নেমেছে, আর আবছা সন্ধ্যাটা কখন গাঢ় রাত্রি হয়ে গেছে, কে জানে!

'হারাইণা রে—' সমস্ত সেটেলমেণ্টে নাতিকে খুঁজতে খুঁজতে উজানী বুড়ী কখন যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, হারাণ টের পায় নি।

তার প্রথম ডাকটা হারাণের কানে যায় নি। ঘাড় গ‍ুঁজে যেমন ছিল, তেমনি বসে থাকে হারাণ।

এবার হারাণের কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল উজানী ব‍ুড়ী। ফের ডাকল, 'হারাইণ!—'

আস্তে আস্তে মাথা তুলল হারাণ। নাতিকে মাথা তুলতে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল উজানী ব‍ুড়ী, 'আমার কি সর্বনাশ হইল রে! হা ভগমান, রাইক্ষসী ডাকিনী হারাইণার মাথা খাইল। আমার কি হইব!' কাঁদতে কাঁদতেই হারাণকে টেনে তুলল উজানী ব‍ুড়ী। বলল, 'ঘরে চল সুনা ভাই, আমার লক্ষ্মী দাদা।

হারাণ নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়।

আগে আগে চলেছে উজানী ব‍ুড়ী, পিছনে হারাণ।

উজানী ব‍ুড়ী হাঁটে আর ব‍ুক থাপড়ায়। বিড় বিড় করে বলে, সব্বনাশী, তর মনে এই আছিল! তর পরানে এত বিষ, এত মারপ্যাচ। ভাল হইব না। আমি রাঢ়ী হইয়া কই, তর ভাল হইব না। জ্বইলা প‍ুইড়া মরবি। আমার ভাল নাতিটারে তুই বিবাগী করলি। এই অধম্ম সইব না। ভগমান এর বিচার করব লো কালসাপের ছাও—'

৪৬

খিলাফৎ পাঠান সেই যে এসেছিল, আর তার যাওয়া হল না! উত্তর আন্দামানের এই সেটেলমেন্টেই সে থেকে গেল।

মান‍ুষের প্রতি চরম অবিশ্বাস নিয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরী সাজা খাটতে এসেছিল খিলাফৎ। তারপর পঞ্চাশ ষাটটা বছর পার হয়ে গেছে। এতগ‍ুলো বছরে মান‍ুষের প্রতি খিলাফতের অবিশ্বাস ঘ‍ৃণা সন্দেহ একটু একটু করে বেড়েই চলেছিল। মান‍ুষের কাছ থেকে অনেক দ‍ূরে সরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সে আশ্রয় নিয়েছিল।

আন্দামানের জঙ্গলে কত বছর যে কাটিয়ে দিয়েছে, সে হিসাব কি খিলাফৎ নিজেই জানে! শ‍ুধ‍ু এটুকু জানে, জঙ্গলে ঘ‍ুরে ঘ‍ুরে দিদ‍ু চুগল‍ুম প্যাডক কি পপিতার মত সেও একটা গাছ হয়ে গিয়েছে।

ফরেস্টের কুলী হয়ে খিলাফৎ দক্ষিণ আন্দামানের জঙ্গলে ঢুকেছিল। সেখান থেকে এল মধ্য আন্দামানের লং আইল্যান্ডে। লং আইল্যান্ড থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে ইদানীং এই ডিগলিপ‍ুরের জঙ্গলে।

আজকাল খিলাফৎ ফরেস্টের কুলী নয়, গার্ড। পঞ্চাশ ষাট বছরে একবার

মাত্র পারমোশ বা প্রোমোশন হয়েছে। কুলী থেকে গার্ড। এ জন্য দুঃখ আপসোস বা ক্ষোভ নেই তার।

ক্রমাগত দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলেছে খিলাফৎ পাঠান। নিছক প্রয়োজনটুক ছাড়া মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। সম্পর্ক নেই। যখনই সে বোঝে মানুষ তার কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখনই জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে খিলাফৎ। জঙ্গলের মত সহৃদয় বন্ধু তার আর নেই। মানুষকে এড়িয়ে এড়িয়ে প্রায় পুরো জীবনটা কাটিয়ে ফেলল খিলাফৎ।

দক্ষিণ আন্দামানের জঙ্গল কাটতে কাটতে একদিন সে দেখল, পেনাল কলোনি বসেছে। দিন দিন এখানে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রান্সফার নিয়ে সে এল মধ্য আন্দামানে। জঙ্গল 'ফেলিং' হবার পর সেখানেও মানুষ এল। খিলাফৎ ছুটল মায়াবন্দর। মায়াবন্দরেও মানুষ এল। খিলাফৎ ছুটল ডিগলিপুর। ডিগলিপুরের জঙ্গল সাফ করে রিফুজি সেটেলমেণ্ট বসেছে।

মানুষের তাড়া খেতে খেতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটছে খিলাফৎ পাঠান। ডিগলিপুরের নতুন বাসিন্দাদের দেখে সে ঠিক করেছিল উত্তরে আরো উত্তরে যেখানে কোনোদিন কোন মানুষ যাবে না, সেই ল্যাণ্ডফল দ্বীপে চলে যাবে সে।

তার সাদি-করা বিবি আর চাচাতো ভাই তাকে ঠকিয়েছে। জীবনে এই দু'জনের কাছে চরম মার খেয়ে মানুষ সম্বন্ধে খিলাফতের ধারণাটা হয়ে গেছে একরোখা, ভয়ানক। তার বিশ্বাস, পৃথিবীর সমস্ত মানুষই বিশ্বাসঘাতক। মানুষ সম্বন্ধে এই ধারণাটা খিলাফতের জীবনে একটা অন্ধ সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে।

ল্যাণ্ডফল দ্বীপেই চলে যেত খিলাফৎ। কিন্তু তার আগেই রোগে কাবু হয়ে পড়ল।

খিলাফৎ খান তার সারা জীবনে মানুষের প্রীতি ভালবাসা বা বন্ধুত্বের তাপ কোনোদিনই পায় নি। জীবনের বাকি দিনগুলি ল্যাণ্ডফল দ্বীপে প্রীতিহীন নীরস নিঃসঙ্গভাবেই কেটে যেত। কিন্তু রোগটা সব হিসেবে গোলমাল করে দিল। জীবনটাকে যে ছকে খিলাফৎ বেঁধেছিল সেই ছকটাই একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পালসাহাব সেই যে তাকে রামকেশবের বউ ক্ষিরির কাছে রেখে গিয়েছিল, তারপর থেকেই মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণাটা বদলাতে শুরু করেছে।

রামকেশবের বউ ক্ষিরির মাথাটা একরকম খারাপই হয়ে গেছে। মাথাটা ঠিক থাকাই তো অস্বাভাবিক। যার ছেলে মরে, দেশভাগ কারসাজি করে যার মেয়েকে মারে, তার মাথা ঠিক থাকে কেমন করে!

শুধু মাথাই খারাপ হয় নি, পরী আর সুবলকে হারিয়ে মানুষের প্রতি

স্নেহ মমতা করুণা—জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ সে খুইয়ে ফেলেছিল। দিনরাত সে উকুন বাছত আর মানুষকে অভিসম্পাত দিত। নিজে ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার করতে পারে নি। অন্য কাউকে সংসার করতে দেখলে সে ক্ষেপে উঠত। আশ্চর্য! সেই ক্ষিরি খিলাফৎ পাঠানকে পেয়ে মেতে উঠল। তার উকুন বাছা ঘুচল। শাপাশাপি বন্ধ হল।

প্রথম প্রথম খুব একটা কাছে ঘেঁষত না ক্ষিরি। দূর থেকে খিলাফৎকে দেখত।

সত্তর না আশি, তার সঠিক বয়স যে কত, খিলাফৎ খান নিজেই জানে না। অনেক বছর আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে কখন যে দেহটা অশক্ত জীর্ণ এবং পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, হুঁশ নেই।

অসুখে বেজায় কাবু হয়ে পড়েছে খিলাফৎ।

দিনরাত্রি রামকেশবের ঘরের মাচানে শুয়ে থাকে সে। দুর্বল বুকটা শ্বাস টানার তালে তালে তোলপাড় হয়, ওঠানামা করে। চোখ দুটো অর্ধেক বোজা, মুখটা অল্প হাঁ হয়ে আছে।

প্রথম দিকে দূরে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত ক্ষিরি।

শ্বাস টানতে বড় কষ্ট হত খিলাফতের। গলার মধ্যদিয়ে অনুচ্চ ঘড়-ঘড়ে হাঁপির টানের মত শব্দ বেরুত। কান খাড়া করে শুনত ক্ষিরি।

এই অসহায় বুড়ো পঙ্গু মানুষটাকে দেখতে দেখতে পাগলী ক্ষিরি হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড করে বসল। ছুটে গিয়ে দুহাতে খিলাফতের মুখটা তুলে ধরে কঁকিয়ে উঠল, 'আমার সুবলা রে, তুই কই গেলি রে বাপ! আমার পরী লো, তুই কই গেলি মা! আমার বুক যে খা খা করে, আমার পুরী যে আন্ধার।'

ফিস ফিস, দুর্বল গলায় খিলাফৎ বলে, 'বহুত তখলিফ মাঈ, বহুত তখলিফ, আমার শির ফেটে যাচ্ছে, বুক টুটে যাচ্ছে।'

মাথাটা টিপে আর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ক্ষিরি।

যন্ত্রণা একটু কমলে আস্তে আস্তে চোখ বুজল খিলাফৎ খান।

শুধু মাথাই টেপে না, বুকেই হাত বুলোয় না, এই দুর্বল পঙ্গু মানুষটাকে নিয়ে কি করব, ভেবেই পায় না ক্ষিরি। এই অসুস্থ বুড়ো মানুষটা তার সুবলের চেয়ে অসহায়। একে খাইয়ে না দিলে খেতে পারে না। হাত ধরে না ওঠালে উঠতে পারে না।

বুক কি মাথায় যন্ত্রণা হলে কিংবা খিদে পেলে মানুষটা শিশুর মত গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে।

কান্নার শব্দটা শুনতে শুনতে কখনও বিরক্ত হয় ক্ষিরি। কখনও সস্নেহে হাসে। বলে, 'কান্দে না বুড়া বাবা। অমুন অবুঝ হয় না।'

আস্তে আস্তে একদিন রোগ সারল। ক্ষিরির কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে

এল খিলাফৎ খান। বলল, 'মাঈ, আমি তুমার কাছ থেকে যাব না।'

'এই শরীল নিয়া কই যাইবেন বুড়া বাবা? ক্ষিরি বলতে থাকে, 'কুনো খানে যাইতে হইব না আপনের। এই বয়সে এই শরীলে গিয়া কি মরবেন! তার থিকা আমার কাছেই থাকেন।'

কথা ক'টা বলেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ক্ষিরি। উদাস বিষণ্ণ চোখে অনেক দূরে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে থাকে, 'আমার সুবলা রে, আমার পরী রে, তরা কুন খানে গেলি? আমার বুক যে খা খা করে।'

খিলাফৎ খান বলে, 'কি বলছ মাঈ?'

'না বাবা কিছু না, আপনেরে কিছু কই না। কই আমার অদিষ্টের কথা।' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যায় ক্ষিরি।

এতকাল মানুষের কাছ থেকে ক্রমাগত পালাতে চেয়েছে খিলাফৎ। পালাতে পালাতে জীবনের সত্তর আশিটা বছর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই ফিরে এসেছে সে।

মানুষকে এতকাল সন্দেহ করেছে, ঘৃণা করেছে, অবিশ্বাস করেছে খিলাফৎ। কিন্তু ক্ষিরির সেবা স্নেহ এবং প্রাণের উত্তাপ পেয়ে মানুষ সম্বন্ধে তার ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। মানুষের মধ্যে আবার বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে সে।

আরো খানিকটা সুস্থ হয়ে একদিন ফরেস্টের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এল খিলাফৎ। রামকেশবের ডেরাটার পাশে একটা ঝুপড়ি তুলে নিল।

একে বয়স হয়েছে। তার ওপর শরীরটা খুবই শীর্ণ এবং অশক্ত। এই শরীর নিয়ে ল্যাণ্ডফল দ্বীপের নির্জন বন্য জীবনে যেতে আজ আর তার সাহস হয় না।

ক্ষিরিও অনেক কিছুই ফিরে পেয়েছে।

পরী কি সুবলকে সে পায় নি। কিন্তু তাদের হারিয়ে যা সে খুইয়েছিল, সেগুলি ফিরে পেয়েছে। একটা অসহায় বুড়ো রুগ্ন মানুষের সেবা করতে করতে স্নেহ মমতা করুণা—জীবনের খোয়ানো মহার্ঘ জিনিসগুলো আবার তার কাছে ফিরে এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে অনেকদিন পর রামকেশবদের কাছে এল পালসাহাব। অবাক হয়ে দেখল, উঠোনের এক কিনারে একটা নতুন ঝুপড়ি উঠেছে! সেটার সামনে বসে রয়েছে খিলাফৎ পাঠান আর ক্ষিরি।

পালসাহাবকে দেখে খিলাফৎ ডাকল, 'আ যা দোস্ত—'

পালসাহাব সামনে এগিয়ে এসে বলে, 'কি করছ খান সাহাব?

'এই মাঈর সাথ থোড়া বাতচিত করছি।'

'তোমার বুখার সেরেছে?'

'আরে হাঁ হাঁ—' খিলাফৎ বলতে লাগল, 'এই মাঙ্গির জন্যেই তো এবার বেঁচে গেলাম। নইলে জরুর ফৌত হয়ে যেতাম।'

'বুখার সেরেছে। এবার ল্যাণ্ডফল জাজিরায় যাবে তো?'

'নেহী।' ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাতে থাকে খিলাফৎ খান।

'কাহে?'

'এই মাঙ্গিকে ছেড়ে যেতে পারব না। এই দ্যাখ না পালসাহাব, নয়া ঝোপড়ি তুলে নিয়েছি।'

পালসাহাব অল্প অল্প হাসে। বিচিত্র সুখে তার বুকের ভিতরটা কাঁপে। অস্থির গলায় সে বলে, 'তুমি না বলতে মানুষ বেইমান, দুশমন!

'সব মানুষ না রে পালসাহাব।'

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে খিলাফৎ খান। পালসাহাব যতবার কথাটা ভাবল, অদ্ভুত খুশিতে প্রাণটা তার ভরে যেতে লাগল।

৪৭

পালসাহাবের জীবন থেকে সেই কৃষাণ গ্রামের ঠিকানাটা একেবারেই হারিয়ে গেছে। কোথায় কবে যেন দুপুরটাকে উদাস করে ঘুঘু ডাকত। তকতকে করে নিকানো উঠোনে জাম গাছের ছায়া পড়ত। ঝকঝকে মাটির দেওয়াল নাদুস-নুদুস গোলগাল শিশু, কপালে মেটে সিঁদুর, পায়ে মল একটি বউ—কতকাল আগের সেই ছবিটা ধু-ধু হয়ে গেছে।

যখন কাছাকাছি কেউ থাকে না, সেই ছবিটা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই শিশু সেই বউ, ঘুঘুর ডাক—কোথায় যে তারা হারিয়ে গেছে, কে তার হদিস দেবে! যতবার পালসাহাব তাদের কথা ভাবে, চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরটা বোবা ব্যথায় টনটন করতে থাকে। নিজের মনেই খেঁকিয়ে ওঠে পালসাহাব, 'শালে বেদর্দ কিসমত—'

আজ সকালে উঠেই দুলতে দুলতে ধানক্ষেতের দিকে চলেছে পালসাহাব।

এখনও ঠিকমত রোদ ওঠে নি। পুব দিকের আকাশে আবছা আবছা, বড় নরম একটু আলো ফুটেছে। জঙ্গলের মাথায় এখনও ফিকে কুয়াশা ঝুলছে।

কোনোদিকে খেয়াল নেই পালসাহাবের। সকালের প্রথম আলো, কুয়াশা, জঙ্গল, চড়াই-উতরাই, পাহাড়-টিলা—এই দ্বীপের কিছুই যেন সে দেখছে না। তার চোখের সামনে সেই ধু-ধু কৃষাণ গ্রাম, সেই মল-বাজানো বউ, সেই দুপুর, নাদুস নুদুস ছেলে—অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া ছবিটা ভেসে উঠেছে।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলেছে পালসাহাব। একসময় ধানক্ষেতে এসে পড়ল সে।

জঙ্গলের কাছ থেকে যে মাটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সবুজ সতেজ ধানে তা এখন ছেয়ে গিয়েছে।

ধান থেকে সবেমাত্র শিষ বেরুতে শুরু করেছে। দু এক মাসের মধ্যেই শিষে শিষে ক্ষেত ভরে যাবে। সবুজ তুঁষের ভেতর দুধ আসবে। একদিন দুধ ঘন হয়ে পুষ্ট নিটোল এক দানা শস্য হয়ে যাবে। সবুজ তুঁষে হলুদ রং ধরবে।

ধানবনের ওপর দিয়ে মৌসুমী বাতাস সির সির করে বয়ে যায়। ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে পালসাহাব। ধান দেখতে দেখতে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই কৃষাণ গ্রামের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়।

'পালসাহাব—' কে যেন ফিস ফিস করে পিছন থেকে ডাকল।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল পালসাহাব। চোখের সামনে থেকে কৃষাণ গ্রামের ছবিটা হারিয়ে যায় মুহূর্তে। ঠিক পিছনে কুমী এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সে যোগিনী সেজেছে।

কুমীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিলির স্বামী হরিপদ বারুই। দুর্বল দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বুকে একটা হাত চেপে টেনে টেনে হাঁপাচ্ছে। অনেকখানি চড়াই-উতরাই ভেঙে এসেছে হরিপদ। উত্তেজনায় ক্লান্তিতে বুকটা তোলপাড় করে শ্বাস পড়েছে। কপালে, নাকের ডগায় কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

কুমী চতুর ঠোঁটে অস্ফুট শব্দ করে হাসে। তার ধূর্ত চোখ দুটো ঝিক ঝিক করতে থাকে।

পালসাহাব বলল, 'কি রে মোহিনী-যোগিনী, মতলব কী? সকালে উঠেই হরিপদ কুত্তাটাকে নিয়ে এসেছিস যে?'

কুমী-র ঠোঁটের হাসি মরে না। আস্তে আস্তে সে বলে, 'ক্যান আইছি, হরিপদ ভাইরে জিগান পালসাহাব।'

পালসাহাব বলল, 'কি রে হরিপদ, কী হয়েছে?'

বুকে হাত চেপে এতক্ষণ টেনে টেনে হাঁপাচ্ছিল হরিপদ। পালসাহাবের কথার জবাব না দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

কান্নার দাপটে তার গলার শিরগুলি দড়ির মত পাকিয়ে ওঠে। ঘোলা চোখ থেকে টস টস করে জল ঝরতে থাকে।

খুব জোরে কাঁদার মত বুকের জোর নেই হরিপদর। গুঙিয়ে গুঙিয়ে দুর্বল শব্দ করে সে কাঁদে। যত না কাঁদে, তার চেয়ে অনেক বেশি হাঁপায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'আমার কি সবনাশ হইল সাহাব বাবা! কারো কাছে

যে আমার মুখ দেখানোর জো নাই। আমারে মারেন, শ্যাষ করেন। না মরা ইস্তক আমার শান্তি নাই।'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'কাঁদো মাত।'

অন্য দিন হলে থেমে যেত হরিপদ। কিন্তু আজ সে মরিয়া হয়ে কাঁদছে।

বিরক্ত গলায় পালসাহাব বলল, 'খালি খালি কাঁদবি, না আসল কথা বলবি ?'

'কি আর কমু সাহাব বাবা! হগলই অদিষ্ট—'

অস্থির অবুঝ শব্দ করে কাঁদতেই থাকে হরিপদ। কপাল থাপড়ায়, চুল ছেঁড়ে, উন্মাদের মত চিল্লায়, 'আমারে মারেন সাহাব বাবা। না মরলে এই জ্বালা আমার জুড়াইব না। হা ভগবান!'

এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কুমী। হাসছিল। হরিপদর কান্নাটা যতই বাড়ছিল, তার হাসি ততই সারা মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এবার সে মুখ খুলল, 'পালসাহাব, আমার কথা তো বাসি হইলে মিঠা হয়। হেইবার খপর দিতে আইছিলাম, আপনে বিশ্বাসই করলেন না।'

'কিসের খবর!'

চোখের তারা দুটো নাচাতে নাচাতে কুমী বলে, 'আন্দাজ করেন দেখি, কিসের খপর ?'

'শালী তামাসা করবি, না বলবি—'

'কই পালসাহাব। অত উচাটন হইলে চলে! রসের কথা রসাইয়া রসাইয়া কইতে হয়। রসাইয়া রসাইয়া শুনতে হয়।' বলে একটু চুপ করে কুমী; কেমন করে কথাটা পাড়বে, মনে মনে ভেঁজে নেয়। তারপর গলা নামিয়ে শুরু করে, 'হেই দিন আপনেরে তিলি আর জামাইর কথা কইছিলাম, মনে পড়ে ?'

'হাঁ।'

'হেইদিন আপনে বিশ্বাস করলেন না। আমারে খেদাইয়া দিলেন। কিন্তুক অহন—'

'এখন কী ?'

কুমী বলে, 'হেইদিন কইছিলাম, যেদিন ফল ফলব, হেইদিন আপনেরে কাছে আসুম! অহন সত্যই ফল ফলছে গো পালসাহাব।'

'কী বলছিস কুত্তী ?' কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না পালসাহাব। হরিপদর কান্না আর তিলির রকম সকম দেখে সে তাজ্জব বনে গেছে।

কুমী বলল, 'তা হইলে সিধা কথাখান সিধা কইরাই কই। আপনে তো হেইদিন আমার কথায় গাও করলেন না। বিশ্বাস করলেন না। যদি বিশ্বাস কইরা বিহিত করতেন, তিলি পোয়াতী হইত না। তিলির প্যাটে ছাও আইত না।'

'কী বলছিস শালী! শাদি-হওয়া লেড়কির পেটে বাচ্চা আসবে না! এ তো দুনিয়ার কানুন।'

'ঠিক কথা পালসাহাব। তবে—'

'তবে আবার কী?'

'তিলির প্যাটের ছাও হরিপদ ভাইর না।'

'তবে কার?'

'জামাইর—উই স্বগেনের।'

'ঝুট।' পালসাহাব গর্জে উঠল।

'মিছা আমি কই না পালসাহাব। আমার কথা বিশ্বাস না হয় হরিপদ ভাইরে জিগান।'

হরিপদর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল পালসাহাব। বলল, 'কি রে কুত্তা, কথাটা সচ্ না ঝুট?'

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল হরিপদ। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলল, 'হ বাবা, সত্যই।'

'তুই ঠিক জানিস, তিলির পেটের বাচ্চা তোর না?'

হরিপদ ককিয়ে উঠল, 'না-না-না, ঐ ছাও আমার না। আইজ পাচ মাস আমরা একঘরে থাকি না। হেয়া ছাড়া—' বলতে বলতে সে থেমে গেল!

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'সাহেব বাবা, আমি ব্যারামী মানুষ। পোলার সাধ আমার আছে, কিন্তুক সাধখান মিটানের উপায় নাই।'

আগেই দুহাতে মুখ ঢেকেছিল হরিপদ; এবার বসে পড়ল। ফোঁপানির দমকে তার রুগ্ন শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কুমী বলল, 'এইবার বিশ্বাস হইল তো বাবা?'

'থাম মাগী!' পালসাহাব চিৎকার করে উঠল। তার চোখের তারা দুটো জ্বলতে থাকে। নাকের পাশুটে রোঁয়াগুলো নড়তে থাকে। ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে একটা জখমী জানোয়ারের মত সে ফোঁসে আর গজরায়, 'ঐ কুত্তা আর কুত্তীর জান তুড়ব। জরুর।'

বেলা অনেকটা বেড়েছে। রোদ চড়ছে দ্রুত। নোনা জলের মাঝখানে মিঠে মাটির দ্বীপ তেতে উঠতে শুরু করেছে।

গজরাতে গজরাতে এবং ফুঁসতে ফুঁসতে একসময় হরিপদর দিকে তাকাল পালসাহাব। দু হাতে তাকে টেনে তুলল। বলল, 'চল, শালীকে তুড়ে আসি।'

'না বাবা, আমি আর ঐ পুরীতে যামু না। আমি মরতেই চাই। মরণের লেইগাই আমি বাইর হইছি। যেইদিকে দুই চোখ যায়, আমি চইলা যামু। ঐ শ্মশানে আর ফিরুম না। হরিপদর গলাটা হঠাৎ বড় দৃঢ় শোনায়। এ ব্যাপারে সে যেন মনঃস্থির করে ফেলেছে।

পালসাহাব তার ওপর জোর খাটাল না। সস্নেহে কোমল গলায় বলল,

'ঠিক হ্যায়, তিলির কাছে তোর যেতে হবে না। আমিই যাব। তুই আমার ঝুপড়িতে চল, সেখানেই থাকবি।'

হরিপদ আর কুমীকে নিয়ে নিজের ঝুপড়িতে ফিরল পালসাহাব।

হরিপদকে মা-তিনের জিম্মায় রেখে কুমীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পালসাহাব।

কিন্তু সেটেলমেন্টের কোথাও যোগেনকে পাওয়া গেল না। উদ্ধব বৈরাগী বলল, যোগেন নাকি সকালে উঠে এরিয়াল উপসাগরে মাছ মারতে গেছে।

যোগেনকে না পেয়ে তিলির কাছে এল পালসাহাব।

এখন দুপুর। সূর্যটা সরাসরি দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে।

তিলি উঠোনের এক পাশে চুপচাপ বসে ছিল। পালসাহাবকে দেখে খুব শান্ত গলায় বলল, 'আমি জানতাম, আপনে আইবেন। আহেন আহেন।'

পালসাহাব সামনে এসে দাঁড়াল। পিছু পিছু কুমীও এসেছে।

একদৃষ্টে তিলির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে পালসাহাব। আশ্চর্য! সে মুখে ভয়-ডর, লজ্জা সরম—কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। একেবারেই নিরেখ নির্বিকার কঠিন একটি মুখ।

পালসাহাব বলল, 'আমি কিসের জন্যে এসেছি, জানিস মাগী?'

'জানি।'

'শালী তোর ডর নেই?'

'কিসের ডর?' ঘাড়টা বাঁকিয়ে তাকাল তিলি।

'মাগী রেণ্ডি—কিসের ডর, পুছতে সরম লাগে না?'

'না।' বেপরোয়া গলায় বলে তিলি, 'কোনো কিছুতে আমার ডর নাই, সরম নাই।'

পালসাহাব অবাক হয়ে যায়। স্বামী থাকতে পরের ছেলে নিজের পেটে ধরে এতখানি ডাকাবুকো হবার সাহস কেমন করে পায় তিলি! সে বলে, 'জানিস, তুই যে কামটা করেছিস বহুত বুরা?'

'জানি।'

'সব জেনেশুনে অ্যায়সা কাম করলি!'

'করলাম।' তিলির কটা চোখের তারায় অদ্ভুত একটু হাসি চিক চিক করে। তীক্ষ্ম ধারাল গলায় সে বলে, 'করলাম তো।'

'শালী রেণ্ডি, করলি তো!' পালসাহাব ফুঁসে উঠল। নাকের পাশুটে রোঁয়াগুলো জোরে জোরে নড়তে লাগল তার।

লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতে করতে সে গজরায়, 'মাগী, এ হল ডিগলিপুর আমার এলাকা। এখানে বদ কাম চলবে না। হাঁ—'

পায়চারি করতে করতে তিলির সামনে এসে দাঁড়ায় পালসাহাব। তার দিকে তাকিয়েই থাকে। কিন্তু তিলির এতটুকু অনুতাপ নেই। সে গর্ভিণী হয়েছে কিন্তু এই গর্ভিণী হওয়ায় গৌরব নেই, মহিমা নেই। তবু তার বুক কাঁপে না। তার গর্ভিণী হওয়ার খবর কুমীর মারফত ডিগলিপুরের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তিলির।

পালসাহাবের গজরানি ফোঁসানি শাসানি—কিছুই পরোয়া করে না সে। লজ্জা-নিন্দা-ভয়-ধিক্কার সব কিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে মেয়েটা বসে আছে।

পালসাহাব তাজ্জব বনে যায়।

হোক নিন্দার, হোক লজ্জার, হোক ধিক্কারের—তবু তো গর্ভিণী হয়েছে তিলি। আর সেই গৌরবে পৃথিবীর কোনো কিছুকে, এমন কি পালসাহাবকে পর্যন্ত গ্রাহ্যেই আনছে না যেন। মনের এতখানি জোর কোত্থেকে পেল তিলি?

একদৃষ্টে তিলির মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে পালসাহাব।

হঠাৎ তীব্র রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠল তিলি। বলল, 'কী দ্যাখেন পালসাহাব? সোয়ামী থাকতে পরের পুত প্যাটে ধরলে মাইয়ামানুষরে কেমুন দেখায়?'

পালসাহাব থতমত খায়। কী করা উচিত, কী বলা উচিত, ঠিক করে উঠতে পারে না।

তিলি বলে, 'কথা কন না ক্যান পালসাহাব? মুখে বুঝি কথা যোগায় না?'

একটু চুপ।

তারপর হঠাৎ খুব গাঢ় গলায় পালসাহাব বলল, 'তুই অ্যায়সা বদ কাম করলি কেন তিলি?'

তিলি হাসি থামিয়ে বলল, 'বহেন পালসাহাব, বহেন। আমি বেবাক কমু। কিছু লুকামু না।'

তিলির পাশে ঘন হয়ে বসল পালসাহাব। কুমী দাঁড়িয়ে ছিল। পালসাহাবের দেখাদেখি সেও বসে পড়ল।

তিলি বলতে লাগল, 'এক দিন না, দুই দিন না, পনের বচ্ছর আমাগো বিয়া হইছে। এতগুলান বচ্ছরে সোয়ামীর মুখ থিকা একখান মিঠা কথা শুনি নাই। সোয়ামী-সুখ কারে কয়, কুনো দিন বুঝলাম না। ভাবছিলাম, পুতের সুখ দিয়া সোয়ামীর দুঃখু ভুলুম। আশায় আশায় বুক বানছিলাম। কিন্তুক ভগবান সেই আশায় ছাই দিছে।' তিলির গলাটা ভাঙা-ভাঙা, কাঁপা-কাঁপা, আবেগে অস্থির। সে থামে না, 'পনের বচ্ছর ঘর কইরা সোয়ামীর

কাছ থিকা পাইলাম কী? জীবনে সুখের মুখ কুনো দিন দেখলাম না পাল সাহাব।'

বিড় বিড় করে পাল সাহাব কি যেন বকে, বোঝা যায় না।

তিলি আবার শুরু করে, 'আমি জানি, সোমাজের কাছে, সোংসারের কাছে, পিরথিমীর হগলের কাছে আমি যা করছি, তা হইল মোন্দ। কিন্তুক এ ছাড়া আমার যে বাচনের পথ নাই।'

'কাহে?'

ধরা-ধরা গলায় তিলি বলে, 'অহন না পালসাহাব, অন্য সময় কমু। অহন মন আমার বশে নাই।'

সূর্যটা দ্বীপের মাথায় এসে উঠেছে।

যতদূর তাকানো যায়, বিপুল আকাশের কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। শুধু নীল—অফুরন্ত আদিগন্ত সীমাহীন নীল। আকাশের নীল এখন আশ্চর্য ঝকমকে। ঝকমকে অথচ বড় কোমল, বড় নরম।

বিড় বিড় করে পালসাহাব বকে, 'দুনিয়ার সব শালের পিছনে এক কিস্সা। দরদের দুঃখের কিস্সা।'

৪৮

পুরো দিনটা গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদল হরিপদ। নিজেকে আঁচড়াল, কামড়াল, টেনে টেনে চুল ছিঁড়ল। খেল না, শুল না, কারো কথা কানে তুলল না।

পালসাহাব অনেক বোঝাল, মা-তিন বোঝাল। কিন্তু যে জেদ ধরেছে কিছুই শুনবে না বুঝবে না, তাকে বোঝানো শোনানো সহজ কথা নয়।

পালসাহাব বলে, 'যা হবার তা হবে। আভী কুছ খেয়ে নে হরিপদ। নিজেকে তখলিফ দিয়ে কুছ ফায়দা নেই।'

'না-না—না পালসাহাব, আমার খাওনের সাধ নাই, শোওনের সাধ নাই, বাচনের সাধ নাই। আমি মরুম, মরা ছাড়া আমার গতি নাই। না মরলে আমার জ্বালা ঘুচব না।' হরিপদ যেন উম্মাদ হয়ে গেছে। তার রুক্ষ ফেঁসোর মত চুল উড়ছে। নিজেকে আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছে সে। সারা দেহে রক্ত জমাট হয়ে আছে। চোখ দুটো ঘোলা ঘোলা, লালচে।

হরিপদ কপাল থাপড়ায় আর সরু দুর্বল গলায় চেঁচায়, 'হা ভগবান, আমার কি হইব? মাইনষের কাছে কেমনে বাইর হমু? কেমনে পিরথিমীরে মুখ দেখামু?'

পালসাহাবের ঝুপড়ির বারান্দায় সমস্ত দিন উথল পাথল হয়ে কাঁদল হরিপদ। তার অশক্ত জিরজিরে শরীর নিঙড়ে গোঙানির মত ক্ষীণ অবুঝ এবং একটানা আওয়াজ বেরুতে লাগল।

অনেক বুঝিয়েও যখন কাজ হল না, তখন হরিপদর পাশে চুপচাপ বিষণ্ন মুখে বসে রইল মা-তিন আর পালসাহাব। হরিপদর মত তাদেরও আজ খাওয়া হল না।

মধ্য ঋতুর দিনটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে একসময় ফুরিয়ে গেল। রাত হল। রাতও একসময় শেষ হয়।

সব কিছুর শেষ আছে কিন্তু কান্নার নেই। কান্না কখনও ফুরোয় না।

দু দিন কিছুই খেল না হরিপদ। পালসাহাবের ঝুপড়ির বারান্দায় বসে কখনও গলা ফাটিয়ে, কখনও বা নিঃশব্দে কেঁদে গেল। তার চোখ দিয়ে অবিরাম জল ঝরতে লাগল।

আশ্চর্য! তৃতীয় দিন সকালে উঠে পালসাহাব দেখল, বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে হরিপদ। কাঁদছে না, ককাচ্ছে না। মুখে-চোখে—কোথাও তার একটুকু অস্থিরতা নেই।

পালসাহাবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অল্প একটু হাসল হরিপদ। হাসিটা কেমন যেন।

আস্তে আস্তে হরিপদর পাশে এসে দাঁড়াল পালসাহাব। তার কাঁধে একটা হাত রেখে গাঢ় গলায় বলল, 'কুছ বলবি?'

'হ পালসাহাব—' হরিপদ মাথা নাড়ল। বলল, 'দুই দিন কিছু খাই নাই। বড় খিদা পাইছে।'

'খাবি?'

'খামু না? না খাইলে বাচুম কেমনে?' অদ্ভুত শব্দ করে সে হাসতে থাকে।

তীক্ষ্ন চোখে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ হরিপদর দিকে তাকিয়ে থাকে পালসাহাব। যে হরিপদ এই দুদিন সমানে মরতে চেয়েছে, সে-ই এখন বাঁচতে চায়! পালসাহাব ভাবতে চেষ্টা করল, লোকটার মাথাটা আদৌ ঠিক আছে তো!

হরিপদ বলল, 'কি দ্যাখেন পালসাহাব?'

'কুছু না, কুছু না, তুই খাবি তো। থোড়া ঠার, আমি তোর খানা আনছি।' পালসাহাব ঝুপড়িতে গিয়ে ঢুকল। একটু পর কাঠের থালায় খান কয়েক রুটি আর খানিকটা শুকনো ভাজি নিয়ে বেরিয়ে এল। হরিপদর সামনে থালাটা রেখে বলল, 'খা।'

খাওয়ার পর হরিপদ বলল, 'একখান কথা কমু পালসাহাব?'

'বল।' হরিপদর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল পালসাহাব।

কেশে গলা সাফ করে নেয় হরিপদ। তারপর শুরু করে, 'পালসাহাব, আমি অনেক ভাবলাম। এ ভালই হইল, এ-ই বুঝি ভগবানের মাইর। এই তার বিচার।'

'কি বলছিস!' কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল পাল-সাহাব!

'পালসাহাব, কুনোদিন তিলিরে একখান মিঠা কথা কই নাই। এট্টু সুখ কি একখান পুত, কিছুই দিতে পারি নাই। হেয় আমারে খালি দিছে, আমি নিছি। বদলে তারে আমি সন্দ করছি, দিন রাইত খিচির খিচির করছি, গাইল দিছি, ঘরের বাইর কইরা দিছি।'

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার ধকলে খুব একচোট হাঁপায় হরিপদ। ফের বলে, 'কিছুই তারে দিতে পারি নাই। না একখান ভাল মন, না একখান ভাল শরীল। ব্যারামই আমারে শ্যাষ করল। আমার শরীলে ব্যারাম, মনে ব্যারাম, ব্যারাম আমার সবখানে।'

অস্ফুট একটা শব্দ করে পালসাহাব।

হরিপদর স্বরে আবেগ নেই, অস্থিরতা নেই, কাঁপুনি নেই। শান্ত স্থির উদাসীন গলায় সে বলে যায়, 'এ-ই ভাল হইল পালসাহাব, এ-ই ভাল হইল।'

'কি ভাল হল রে হরিপদ ?'

'আমি তো মইরাই আছি। আমার কুনো আশা নাই। যে কাল ব্যারাম শরীলে বাসা বানছে হেয়া কুনোদিনই সারব না। আমি মরুমই। কিন্তুক তিলি বাচুক। আর ভরা শরীল, ভরা যৈবন, ভরা মন। আমার লেইগা তিলি ক্যান মরব ? না না, তিলি বাচুক। আপনে তার বিহিত কইরা দ্যান।'

'আকি কী করব ?'

'তিলির লগে যুগেনের বিয়া দ্যান। অরা একজন আর একজনেরে ভালবাসে। ওগো অনেক কালের পিরীত, অনেক কালের জানাশুনা, অনেক কালের বুঝাপড়া। অরা বিয়া করলে সুখী হইব, ভইরা উঠব।'

'লেকিন তুই ?'

'আমি কী ? আমি—' ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে। ঘোলাটে চোখের কোল বেয়ে নোনা জল টস টস করে ঝরতে থাকে। গলাটা বুজে আসে হরিপদর। ভাঙা কাঁপা স্বরে সে বলে, 'আমি কিছু না পালসাহাব, কেউ না। আমার লেইগা আপনে ভাইবেন না। আমি—আমি চিরটা কাল তিলির বুকে কাটার মত বিন্ধা (বিঁধে) আছি। আর না। এইবার আমি—' বলতে বলতে গলাটা ধরে যায়। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে হরিপদ। কান্নারাভ গলায় এর পর বিড় বিড় করে কি যে বলে, বোঝা যায় না।

হরিপদর পিঠে একটা হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকে পালসাহাব। সকাল বেলাতেই আজ তার মনটা ভারি খরাপ হয়ে যায়।

বিকেলের দিকে যোগেনের খোঁজে বেরিয়েছিল পালসাহাব। ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতর অন্ধকার গাঢ় হতে শুরু করেছে। আর সেই অন্ধকার বিঁধে বিঁধে হাজারটা জোনাকি জ্বলছে, নিবছে। নিবছে, জ্বলছে।

ঝুপড়ির কাছের সেই ঢালু খাদটার সামনে এসে পালসাহাব ডাকতে শুরু করল, 'মা-তিন, এ মা-তিন—'

জবাব মিলল না।

পালসাহাব গলা চড়াল, 'এ মাগী, জলদি লালটিন (লণ্ঠন) নিয়ে আয়।'

এবারও জবাব নেই।

পালসাহাব গজ গজ করতে লাগল, 'মাগীর সব ভাল। লেকিন নিদটা বহুত খারাব। দিন যেই খতম হল, আন্ধার যেই নামল, অমনি কুত্তীটা বিস্তারায় (বিছানায়) গিয়ে পড়ল।'

আরো কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে খাদে নামল পালসাহাব। খাদ পেরিয়ে ঝুপড়িতে এসে দেখল, মা-তিন নেই, হরিপদও না।

পালসাহাব চিল্লাতে লাগল, 'এ মা-তিন কুত্তী এ হরিপদ কুত্তা—'

অনেকক্ষণ চিল্লাচিল্লি করে হয়রান হয়ে বসে পড়ল পালসাহাব। সেই বিকেল থেকে মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে তার।

অনেক খুঁজেও আজ যোগেনকে পায় নি পালসাহাব। সেই যে দিন দুই আগে ডিগলিপুরের খালে মাছ মারতে বেরিয়েছিল যোগেন, আজও ফেরে নি। মেজাজ খারাপ হওয়ার কারণ সেটা। অথচ তাকে না পেলে সমস্যার সমাধান হয় কী করে?

তিলি যোগেন আর হরিপদ—তিনটি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কটা জটিল এবং অস্বাভাবিক হয়ে রয়েছে, যোগেনকে পেলে তা সহজ এবং স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু তাকে পাওয়া না গেলে কী করা যায়? বিরক্ত গলায় পালসাহাব একা একা বিড় বিড় করতে থাকে।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার আরো ঘন হচ্ছে। জোনাকিরা সমানে জ্বলে আর নেবে। জ্বলা আর নেবায় তাদের ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই।

জঙ্গলের দিক থেকে গান্ধী আর বাড়িয়া পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসছে। চামড়ায় হুল ফুটিয়ে পালসাহাবকে অস্থির করে তুলছে।

জঙ্গলের মাথায় সিন্ধুসারসগুলো ডানা ঝাপটায়। মাঝে মাঝে কর্কশ শব্দ করে ডেকে ওঠে, 'ক্কক—ক্কক—ক্কক—'

হঠাৎ পালসাহাবের চোখে পড়ল, সামনের খাদ বেয়ে একটা মশাল উঠে আসছে। সে হাঁকে, 'কৌন রে?'

'আমি —' গলার স্বরেই চেনা গেল মা-তিন।

একসময় মা-তিন আর মশালটা পালসাহাবের সামনে এসে পড়ল।

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

'হরিপদকে ঢুঁড়তে।'

'হরিপদকে ঢুঁড়তে!' পালসাহাব চমকে উঠল, 'হরিপদ কোথায়!'

'কোথায় আমি কি জানি! মা-তিন বলতে লাগল, 'বিকেলে তুই বেরুবার পর আমি নদীতে পানি আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, ও নেই। ইধর উধর জঙ্গলে বহুত ঢুঁড়লাম, লেকিন হারামীটাকে পেলাম না।' মা-তিনের গলাটা হতাশ শোনাল, 'কোথায় যে ভাগল হরিপদ!'

'চল্-চল্ —' লাফ দিয়ে দাঁড়ায় পালসাহাব। মশাল-সুদ্ধ মা-তিনের একটা হাত ধরে টানতে টানতে সেটেলমেন্টে চলে আসে। হারাণ, চন্দ্র জয়ধর, উদ্ধব বৈরাগী, রসিক শীল—এমনি জন বিশেককে ডাকাডাকি করে বিশটা মশাল ধরিয়ে চারপাশের জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি শুরু করল।

বিশজন মানুষ সমস্ত রাত খুঁজল। কিন্তু হরিপদকে পাওয়া গেল না। বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে কোথাও তার চিহ্ন নেই।

অগত্যা ভোরের দিকে যে যার ঘরে ফিরল।

মা-তিনকে নিয়ে টলতে টলতে নিজের ঝুপড়িতে চলে এসেছে পালসাহাব। বারান্দার পাটাতনে ঝিম মেরে বসে রইল সে।

সমস্ত রাত জঙ্গলে জঙ্গলে কাঁটা আর গোঁজের খোঁচা খেয়ে চামড়া ফেঁসে গেছে। খাবলা খাবলা মাংস উঠে গেছে। পাথরে টক্কর খেয়ে পায়ের নখ থেঁতলে গেছে। সারা দেহে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

চোখা চোখা দাড়িগোঁফে মুখটা কর্কশ হয়ে আছে পালসাহাবের। লম্বা লম্বা তামাটে চুল কপাল চোখ এবং গালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ দুটো টকটকে লাল। মনে হয় দু পিণ্ড তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

এখনও ঠিকমত সকাল হয় নি।

রোদ ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে আকাশটা এখন আবছা আবছা, আলো আর আঁধারিতে দুর্বোধ্য।

আকাশের দিকে তাকিয়ে গাঢ় মন্থর দীর্ঘশ্বাস ফেলল পালসাহাব। হরিপদর জন্য অদ্ভুত এক দুঃখ তাকে অস্থির আর অভিভূত করে ফেলেছে।

রুগ্ন দেহ আর রুগ্ন মন নিয়ে জীবনকে আদৌ ভোগ করতে পারল না হরিপদ। জীবন তার আয়ত্তের বাইরেই থেকে গেল। রোগের জন্য এই পৃথিবীতে কেউ তার আপন না। এমন কি নিজের বউ পর্যন্ত তাকে অগ্রাহ্য

করে পরের ছেলে পেটে নিয়ে গর্ভিণী হয়ে বসেছে। তিলির কাছে চরম মার খেয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের ক্ষীণ অসহায় অস্তিত্বকে সে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলেছে।

কোথায় হরিপদ চলে গেছে, কে জানে! ডিগালিপুরের সেটেলমেণ্ট থেকে এই প্রথম একটা মানুষ হারিয়ে গেল।

বারান্দার পাটাতনে ঝিম মেরে বসে থাকে পালসাহাব। হরিপদর জন্য কষ্ট হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য, সব দুঃখ ছাপিয়ে বিচিত্র এক অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। পালসাহাব ভাবছিল, এ বুঝি ভালই হল। হরিপদকে নিয়ে সে কি করবে? যে মানুষ এক পরল মাটি কোপাতে পারবে না, একটা ঘর ছাইতে পারবে না, উর্বরা নারীর গর্ভে সন্তান আনতে পারবে না, তাকে নিয়ে কি করবে পালসাহাব?

হরিপদ চলে গেছে! এ একরকম ভালই হল।

বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে উপনিবেশ গড়ার ব্যাপারে যার কোনো ভূমিকাই নেই তার চলে যাওয়াই হয়ত ভাল।

যে মানুষ কোনো প্রয়োজনেই আসবে না, শুধু রুগ্ন বিষাক্ত অস্তিত্ব দিয়ে পালসাহাবের এই দ্বীপকে বিষিয়ে রাখবে, তার চলে যাওয়াই মঙ্গল।

পালসাহাবের এই দ্বীপে সুস্থ সবল তাজা মানুষ ছাড়া আর কারো ভূমিকা নেই, প্রয়োজনও নেই।

৪৯

হারাণ হন্যে হয়ে উঠেছে।

বর্ষার গোড়ায় গোড়ায় পানিকররা সেই যে ডিগালিপুর এসেছিল, এখনও যায় নি। নিত্য ঢালীর ঘরে তারা জাঁকিয়ে বসেছে।

এখন আশ্বিন মাস যায় যায়। রোজই একবার নিত্য ঢালীর বাড়ি আসে হারাণ। ঠিক বাড়িতে ঢোকে না। দূরে, সেই ডালপালা-পোড়া কবন্ধ গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করে।

উঠোনে বসে সিপি সাফ করে তিন জন—লা তে, নিত্য ঢালী আর পানিকর। কাজ করতে করতে ফাঁক বুঝে পানিকর উঠে পড়ে। রান্নাঘরের সামনে গিয়ে বসে। রসের কথা রঙ্গের কথা বলে কাপাসীকে মজিয়ে রাখে। শুনতে শুনতে আচমকা তীব্র হাসিতে মেতে ওঠে কাপাসী।

দূর থেকে কাপাসীর হাসি আর মাতামাতি দেখে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে হারাণের। দুঃখ-যন্ত্রণা-কান্নায় মেশা অসহ্য এক অনুভূতি

পাকিয়ে পাকিয়ে গলার কাছে এসে আটকে যায়। হাজার ঢোক গিলেও সেটা নামানো যায় না। হাজার চেষ্টা করে বার করা যায় না।

চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করে। এক সময় নিত্য ঢালীর উঠোন, ঘর, পানিকর, লাতে, কাপাসী—কিছুই যেন দেখতে পায় না হারাণ। চোখের সামনে থেকে সব যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কবন্ধ গাছটার আড়াল থেকে টলতে টলতে কোনোদিন নিজের ঘরে ফেরে, কোনো দিন বা যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে চলে যায় হারাণ।

রোজই তাকে তাকে থাকে হারাণ। কিন্তু না, ঠিক সুবিধামত একদিনও কাপাসীকে ধরতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠল সে।

কি একটা কাজে আজ সকালে তিন জন—অর্থাৎ পানিকর, লাতে আর নিত্য ঢালী মায়া বন্দর গেছে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। সুযোগ বুঝে হারাণ এল।

উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে ছেঁড়া একটা শাড়ি সেলাই করছিল কাপাসী। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'তুমি!'

'হ আমি। চিনতে অসুবিধা হয় নিকি?'

কাপাসী জবাব দিল না। মুখ নামিয়ে শাড়িতে ফোঁড় দিতে লাগল।

নীরস কঠিন গলায় হারাণ বলল, 'শোন—'

মুখ না তুলেই কাপাসী বলল, 'কও—'

'মুখ তোল।'

'মুখ দিয়া তো শুনুম না, শুনুম কান দিয়া। তুমি কও—'

'ভাল কথা।' কাপাসীর মুখোমুখি বসে পড়ল হারাণ। বলল, 'তোমার লগে আমার বুঝাপড়া আছে।'

'কিসের বুঝাপড়া?' দাঁতে সুতো কাটতে কাটতে বার তিনেক একই কথা বলে কাপাসী, 'কিসের আবার বুঝাপড়া? তুমি আমাগো পিছে লাগছ। আমরা নিকি মোন্দ মতলবে পানিকর ভাইগো ঘরে আইনা তুলছি! কোলোনির বেবাক মাইনষের কাছে তুমি আমাগো নামে কুকথা রটাইয়া বেড়াও। হগলই কানে আসে।' বলতে বলতে একটু থেমে কি যেন ভাবে কাপাসী। পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'তোমার লগে কিসের কথা! কুনো কথা নাই, কুনো বুঝাপড়া নাই।'

ভারী থমথমে গলায় হারাণ বলল, 'কি দুঃখে যে তোমাগো পিছে লাগছি তা যদি বুঝতা কাপাসী! তা বোঝনের মন যদি তোমার থাকত!'

'কি কও তুমি!' অবাক হয়ে হারাণের দিকে তাকায় কাপাসী।

'ঠিকই কই।' গাঢ় গলায় হারাণ বলতে থাকে, 'তুমি বেবাক ভুলছ কাপাসী। হেই দিনগুলানের কথা তোমার মনে নাই?'

ফিস ফিস করে কাপাসী বলে, 'কিছুই ভুলি নাই পুরুষ, ভুলি নাই। হগল কথা মনে আছে।'

'ভুইলাই যদি না থাক তবে আমার উপুর এমুন বৈমুখ হইছ ক্যান? আমার লেইগা তোমার হেই টান নাই, হেই তাপ নাই।'

'আছে আছে।' মুখ নামিয়ে আধফোটা গলায় কাপাসী বলতে থাকে, 'তাপ আছে, টান আছে। তোমার লেইগা আমার হগল আছে।'

'ও তো মুখের কথা।'

'না গো, পরাণের কথা।'

'বিশ্বাস হয় না।'

'ক্যান?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারাণ বসে, 'আমার উপুর তোমার টান যদি থাকতই বিদেশী-বিজাতিরে ঘরে জায়গা দিতা না। মন দিতা না।'

'বিদেশী-বিজাতি আবার কে আইল!'

'রঙ্গ কইরো না কাপাসী।' রুক্ষ গলায় হারাণ বলে, 'উই পানিকর আর লা তে বুঝি তোমাগো স্বজাতি! কুন কালের বান্ধব?'

সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছিল দুজনে। হারাণ আর কাপাসী পরস্পরের প্রাণের তাপ পাচ্ছিল। একই আবেগ দুজনের বুকের ভেতর তির তির করে কাঁপছিল যেন।

হঠাৎ তাল কাটল। ভুরু দুটো কুঁচকে চোখের তারা স্থির করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাপাসী। বলল, 'পানিকর ভাই স্বজাতির থিকা বড়। আত্ম বান্ধবের থিকা বড়।'

হারাণ ভেংচে উঠল, 'তা হইলে যা শুনছি মিছা না!'

'কি শুনছ?'

'পানিকর নিকি আর তোমার ভাই থাকব না, অন্য কিছু হইব।'

'বাহারের কথাই তো শুনছ!' আচমকা হারাণকে ভয়ানকভাবে চমকে দিয়ে মেতে মেতে ঢলে ঢলে হেসে উঠল কাপাসী।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল হারাণ।

হাসতে হাসতে কাপাসী বলল, 'চললা?'

'হ চললাম!' দুঃখে ক্ষোভে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে হারাণের। রুঢ় গলায় সে বলল, 'তোমার কাছে আর কুনোদিন আহুম না।' সামনের উতরাই বেয়ে তর তর করে নামতে লাগল হারাণ।

হাসির দাপটে শরীরটা দুমড়ে যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই কাপাসী বলল, 'যাইও না। আমি পাগল মানুষ কি কইতে কি কইছি!'

হারাণ খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি যদি পাগল হও দুনিয়ার বেবাক মানুষ পাগল।' হারাণ চলে গেল।

উঠোনের নরম মাটিতে নখ দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে কাপাসী বিড় বিড় করে, 'বুঝলা না, আমারে বুঝলা না পুরুষ।'

৫০

যে মতলব নিয়ে পানিকর ডিগলিপুর সেটেলমেণ্টে এসেছিল পুরোপুরি তা হাসিল হল না। অথচ এখানে থাকার মেয়াদও তার ফুরিয়ে এসেছে।

বর্ষার মুখে বাক্স বাক্স সিপি আর লা তেঁকে নিয়ে নিত্য ঢালীর ঘরে উঠেছিল পানিকর। এখানে তৃতীয় ঋতু যায় যায়। এর মধ্যে সিপি সাফ হয়ে গেছে।

সিপি সাফ করাটা ছিল অছিলা। এই করে যতদিন ডিগলিপুর থাকা যায়।

পানিকররা কম দিন রইল না সেটেলমেণ্টে। কিন্তু সিপি সাফ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের থাকার মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে।

মেয়াদ ফুরোচ্ছে কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা তা হাসিল হচ্ছে না।

পানিকর অনেকবার বলেছে, 'নিত্য চাচা, কলোনির সবার সাথ আমার জান পয়চান করিয়ে দাও।'

নিত্য ঢালী বলেছে, 'ঐ কথা মুখেও আনবেন না পানিকর বাবা।'

'এ বাত বলছ কেন চাচা?'

'সাধে কি আর এই কথা মুখে আনি বাবা, বড় দুঃখে আনি।' বেজার গলায় নিত্য ঢালী বলেছে, 'আপনে বিদেশী-বিজাতি, আপনেরে কেও দুই চোখে দেখতে পারে না।'

পানিকর জিজ্ঞেস করেছে, 'আমার কসুর কী?'

'তা জানি না বাবা। আপনেরে ঘরে আইনা তুলছি, হেইতেই কোলোনির মানুষ আমার উপুর ক্ষেইপা আছে।'

অস্ফুট শব্দ করে পানিকর কি বলেছে, বোঝা যায় নি।

নিত্য ঢালী থামে নি, 'কাম নাই পানিকর বাবা, কারো লগে আলাপ পরিচয় করনের কাম নাই। যারা আপনের চায় না, তাগো কাছে গিয়া কি লাভ? আপনে আমার কাছেই থাকেন।'

অগত্যা চুপ করে গেছে পানিকর।

নিত্য ঢালীর কথাই ঠিক। ডিগলিপুর সেটেলমেণ্টের কেউ যে তাকে পছন্দ করে না এই সাদামাটা সহজ কথাটা আঁচ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি পানিকরকে।

নিত্য ঢালীর উঠোনে বসলে সামনের ঢাল্ব পথটা দেখা যায়। পথটা দ্বটো টিলার মাথায় পাক খেয়ে কিলপণ্ড নদীর দিকে চলে গেছে। সকাল-বিকেল ডিগলিপ্বরের য্ববতী বৌ-ঝিরা সেই পথটা ধরে কিলপণ্ড নদীতে জল আনতে যায়। একদ্বষ্টে চেয়ে চেয়ে তাদের দেখে পানিকর। চোখে পাতা পড়ে না। চোখের তারা দ্বটো সাপের চোখের মত ঝিক ঝিক করতে থাকে।

ডিগলিপ্বরের বৌ-ঝিদের দেখে আর হতাশায় আক্রোশে হাত-পা কামড়ায় পানিকর। তাদের কাছে ঘে'ষার জো নেই। হাত-পা কামড়ানো ছাড়া পানিকরের উপায়ই বা কী? নিত্য ঢালী যদি সবার সঙ্গে আলাপটা অন্তত করিয়ে দিত!

আধারকর বলেছিল, এক একটা জোয়ানী লেড়কি বাগিয়ে আনতে পারলে এক হাজার করে টাকা মিলবে। আধারকরের কথা ভাবতে ভাবতে উন্মাদের মত হয়ে ওঠে পানিকর।

এখন দ্বপ্বর।

আকাশে দ্ব চার টুকরো হানাদার মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। নৈর্ঋত কোণ থেকে মেঘগ্বলি উঠে এসে বায়্ব কোণে চলেছে।

মেঘের সঙ্গে য্বঝে যেট্বকু রোদ এই দ্বীপে আসতে পেরেছে, তাতে জেল্লা নেই, তাপ নেই। কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে, নিস্তেজ। জঙ্গলের মাথায় ক্বক দিয়ে দিয়ে একটা কাটৌরা পাখি থেকে থেকে ডেকে উঠছে। দ্বপ্বরটা কেমন যেন উদাস হয়ে রয়েছে। উঠোনের এক কিনারে সিপি গ্বছোচ্ছে লা তে। আর এক কিনারে ঘে'ষাঘে'ষি করে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে দ্বই ম্বর্তি। পানিকর এবং নিত্য ঢালী।

পানিকর বলল, 'সিপি তো বিলক্বল সাফ হয়ে গেল।'

'হ, তা হইল।' নিত্য ঢালী কলকের খোলে মাথা তামাক ঠাসতে ঠাসতে বলল, 'এই কামে আর কয়দিন লাগে!'

পানিকর জবাব দিল না। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

নিত্য ঢালীর তামাক সাজা হয়ে গিয়েছিল। হ্বঁকোটা পানিকরের হাতে দিতে দিতে বলল, 'ধরেন পানিকর বাবা, জ্বইত কইরা টানেন।'

হাত বাড়িয়ে হ্বঁকোটা ধরল পনিকর। ভুক ভুক করে টানতে টানতে সেই কথাটাই ভাবতে লাগল, এখানে এসে লাভ হল না। এখন পর্যন্ত ডিগলিপ্বরের বাসিন্দারা তাকে পছন্দ করে না। তা না কর্বক। কিন্তু এই যে ক'মাস সে নিত্য ঢালীর বাড়িতে রইল তাতে কম টাকা খরচ হয়েছে! মায়াবন্দর থেকে সিপি এনেছে, তার খরচ। সিপি নিয়ে যাবে, তার খরচ। নিত্য ঢালীর বাড়িতে একটা নত্বন ঝুপড়ি ত্বলেছে, তার খরচ। এই ক'মাসে নিত্য ঢালীরা দ্ব'জন আর তারা দ্ব'জন—মোট চারজনের খাই খরচ; সবই তো

তার গাঁট থেকে গেছে।

পানিকর ধূর্ত ব্যবসাদার মানুষ। দরাজ হাতে পয়সা ছড়াতে তার আপত্তি নেই, যদি সেই পয়সা দুগুণ তিনগুণ হয়ে ফেরে। কিন্তু ডিগলিপুরে যে টাকা সে ছড়িয়েছে তা পুরো ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ। কথাটা যতই ভাবল মাথা ততই গরম হয়ে উঠল পানিকরের।

অবশ্য তার মুঠোর ভিতর কাপাসী আছে।

কাপাসী! একটা আধা পাগল মেয়ের দাম কতটুকু? যতই হোক, আধারকরের হাতে তাকে তুলে দেবে পানিকর। লাভ না থাক, কাপাসীদের পেছনে যে টাকা সে ঢেলেছে, অন্তত তাও যদি উঠে আসে। ভাবতে ভাবতে যেন মরিয়া হয়ে উঠল পানিকর। ফিস ফিস করে ডাকল, 'নিত্য চাচা—'

পানিকরের হাত থেকে হুঁকোটো নিয়ে টানছিল নিত্য ঢালী। আয়েস করে একমুখ গাঢ় ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কি ক'ন পানিকর বাবা?'

'সিপি সাফ হয়ে গেল। এবার তো আমাদের যেতে হবে।'

'তা হইব।' নিত্য ঢালী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

পানিকর বলে, 'লেকিন একটা বাত—'

'কী?'

'কাপাসীকে পাগলদের সিকমেনডেরায় (হাসপাতালে) নিয়ে যাব।'

'কবে নিয়া যাইবেন?'

'দো-চার রোজের অন্দর।'

'ভালই হইব। তা হইলে গোছগোছ আরম্ভ করি।'

পানিকর বলে, 'তুমিও যেতে চাও নাকি চাচা?'

'বাঃ, মাইয়া যাইব আর আমি যামু না! কেমুন কথা ক'ন পানিকর বাবা! একে পাগল মানুষ, তার উপুর বস্যের (যুবতী) মাইয়া। তারে কি একা একা ছাড়তে পারি?'

কি একটু যেন ভাবে পানিকর। পরক্ষণে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ওই দেখ, শিরটা আমার বিলকুল গড়বড় হয়ে গেছে। কি বলতে কি বলছি! তুমিও যাবে, জরুর যাবে। তুমি না গেলে চলবে না। আমি সোচলাম তুমি গেলে এই কোঠি কে দেখবে! তাই—'

একটু চুপ করে থেকে নিত্য ঢালী বলে, 'আইচ্ছা পানিকর বাবা, কাপাসী ভাল হইব? আগের লাখান হইব? পাগলামি ঘুচব?'

জবাব না দিয়ে বিড় বিড় করে বকতে বকতে উঠে পড়ে পানিকর। সোজা রান্না ঘরের দিকে চলে যায়।

আরো কিছুক্ষণ হুঁকো টানল নিত্য ঢালী। তারপর কলকেটা উপুড় করে পোড়া তামাক আর ছাই ঢেলে দিল।

উঠোনের আর এক কিনারে ঘাড় গুঁজে সিপি গুছোচ্ছে লা তে। হঠাৎ মুখ তুলে যে ডাকল, 'নিত্য চাচা—'

নিত্য ঢালী বলল, 'কি ক'স ?'

'ইধর এসো।'

হুঁকো কলকে রেখে লা তে'র পাশে গিয়ে বসল নিত্য ঢালী। লা তে বলল, 'মালেক তোমাকে কী বলল ?'

'কি আর কইব ? আমারে আর কাপাসীরে নিয়া পানিকর বাবায় পাগলগো হাসপাতালে যাইব।'

লা তে বলল, 'অ্যায়সা কাম করো না চাচা। বহুত মুশকিলে পড়ে যাবে।'

'কি ক'স তুই!'

'ঠিক কথাই বলি। তুমি মালেকের সাথ যেও না চাচা।'

নিত্য ঢালী ভেংচে উঠল, 'আমার ভাল হয়, পিরথিমীর কেউ চায় না। কাপাসী ভাল হউক, কেউ চায় না। বেবাকে আমার শত্তুর। পানিকর বাবার লগে আমি যামু, একশত বার যামু। সিধা কথা।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নিত্য ঢালী।

৫১

হারাণ যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

সেদিন কাপাসীকে বলে এসেছিল, আর কোনোদিন তার কাছে যাবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা বেশিদিন স্থায়ী হল না। হঠাৎ একদিন ডিগলিপুরের বাসিন্দাদের—অর্থাৎ রসিক শীল, বুড়ী বাসিনী, উদ্ধব বৈরাগী—এমনি দশ বারোজনকে জুটিয়ে, তাদের তাতিয়ে, নিত্য ঢালীর বাড়ীতে এসে উঠল হারাণ।

দু-একদিনের মধ্যে নিত্য ঢালীরা পানিকরের সঙ্গে রওনা হবে। তাই বোঁচকা-বুঁচকি বাঁধার কাজ চলছিল।

পানিকর আর লা-তে উঠোনে বসে বিরাট বিরাট টিনের বাক্সে সিপি সাজিয়ে রাখছিল। লোকজন দেখে তারা নতুন ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

বুড়ী বাসিনী ডাকাডাকি শুরু করল, 'নিত্যা, নিত্যা রে—'

'কে ?' বাঁধাছাঁদা স্থগিত রেখে বাইরে বেরিয়ে এল নিত্য ঢালী। এ সঙ্গে এতগুলি মানুষকে দেখে একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল। কাঁপা গলা

বলল, 'তোমরা এতজনে!'

বাসিনী বলল, 'হ, এতজনেই আইলাম!'

'কী মনে কইরা?'

'আইলাম রঙ্গ দেখতে। তুই তো আর ডাইকা আনলি না। আমাগোই আসতে হইল।'

বুড়ী বাসিনী বলতে লাগল, 'শুনলাম বিজাতি-বিদেশীর লগে কুটুম্বিতা পাতাবি।'

'কে কইল?'

'কে না কইল! ডিগলিপুরের হগলেই এই কথা জানে।'

এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে নিত্য ঢালী। করুণ গলায় সে বলল, 'তোমরা কি আমারে ইট্টু শান্তিতেও থাকতে দিবা না! তোমাগো কী করছি আমি!'

'তরেই বা আমরা কী করছি?'

নিত্য ঢালী জবাব দিল না।

বুড়ী বাসিনী আবার বলল, 'তর লগে আমরা কি শত্তুরতা করলাম?'

নিত্য ঢালী এবারও উত্তর দেয় না।

'হ, নিচ্চয় আমরা তর শত্তুর হইছি। না হইলে স্বজাতির লগে কেউ সম্পক্ক ঘুচায়? তুই যে এমুন হবি, আমরা কুনো কালে ভাবি নাই নিত্যা।' বুড়ী বাসিনীর গলায় দুঃখ এবং আক্ষেপ ফোটে, 'আমরা তর পর হইলাম, শত্তুর হইলাম, যত আপন হইল বিদেশী-বিজাতি।'

নিত্য ঢালী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সবাইকে ঠেলে সরিয়ে সামনে এগিয়ে এল হারাণ! বলল, 'কথা থাউক তালুই, তাগো দেখাও।'

'কাগো দেখামু?'

'কুটুম, তোমার সাধের কুটুমগো দেখাও। আমরা লয়ন ভইরা দেইখা যাই।' টেনে টেনে হাসে হারাণ। সে হাসিতে জ্বালা এবং ক্ষোভ মিশে আছে।

বুড়ী বাসিনী বলে, 'হ-হ, তাই দেখা।'

রসিক শীল বলে, 'দেখা রে নিত্যা, দেখা।'

বাকি সকলে তাড়া দেয়, 'তরাতরি কর। কুটুমের মুখ দেইখা ঘরে ফিরি। এইদিকে বেলা হইয়া যায়।'

নিত্য ঢালীর মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে যাবে। গলা ফাটিয়ে সে চিল্লায়, 'কী কও তোমরা! কে কার কুটুম! কিসের কুটুম!'

হারাণ বলে, 'রঙ্গ কইরো না তালুই। ডিগলিপুরের হগলে জানে, কে কার কুটুম।'

'না-না, আমার কুটুম নাই। তোমরা যাও।' নিত্য ঢালী সমানে চেঁচায়।

'যামু যামু, কুটুমের মুখ না দেইখা যাই কেমনে ? বড় সাধ লইয়া তোমার কাছে আইছি।' হারাণ খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসে।

'তোগো পায়ে ধরি, তরা যা। তোগো কাছে কি অপরাধ করছি যে আমারে অমুন দুঃখু দ্যাস।'

হারাণ বলে, 'যামু যামু। তার আগে কুটুম দেখাও। চৌখের দেখা দেইখা চাইলা যামু। আর তোমারে জ্বালামু না।'

'কতবার কমু আমার কুটুম নাই।'

'কুটুম না থাউক, জামাই তো আছে। জামাই দেখাও।'

'জামাই!' নিত্য ঢালীর গলাটা কেঁপে গেল, 'কে জামাই!'

'হাসাইলা তালুই, হাসাইলা।' হারাণ বলতে লাগল, 'পিরথিমী জানে। আর তুমিই নিজের জামাইরে জান না?'

'না-না, জানি না।' পাগলের মত চিৎকার করে নিত্য ঢালী।

'জানো না যহন তহন আমিই কই কে তোমার জামাই।' বলে একটু থামে হারাণ। রসিক শীল, বুড়ী বাসিনী, উদ্ধব বৈরাগী—সকলের মুখের ওপর দিয়ে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। তারপর খুব আস্তে ফিস ফিস করে বলে, 'শোনলাম, পানিকরই নিকি তোমার জামাই হইব।'

হারাণের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল নিত্য ঢালী। দৌড়ে নতুন ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। পানিকরের একটা হাত ধরে টানতে টানতে আবার বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর চেঁচাতে লাগল, 'দ্যাখ হারাইণা, দেখ তোমরা, হগলে দেখ, আমার কুটুম দেখ। লয়ন ভইরা দেখ। পরান ভইরা দেখ। খালি কুটুম না, আমার জামাই। দিমু, আমার কাপাসীরে পানিকর বাবার হাতেই দিমু।' একটু থামে। টেনে টেনে দম নেয়। চিলের মত ধারাল গলায় আবার চিৎকার করে, 'হারাইণা, তর সাধ মিটছে তো?'

অবসন্ন গলায় হারাণ বলে, 'মিটছে।'

'জামাইর মুখ দেখলি, এইবার যা।'

'হ, যামু।' রসিক শীলদের নিয়ে হারাণ চলে গেল।

৫২

রাত থাকতে থাকতেই তারা রওনা হল। তারা চারজন। পানিকর, লা-তে, নিত্য ঢালী এবং কাপাসী।

এখনও বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপটা গাঢ় ঘুম আর ঘন অন্ধকারে তলিয়ে আছে। একটা মানুষ কি একটা পাখিও এখন পর্যন্ত জাগে নি। এই দ্বীপ এই মুহূর্তে আশ্চর্য নিঝুম।

তারা চলেছে। বোঁচকা বুঁচকি মাথায় চাপিয়ে সবার আগে আগে যাচ্ছে লা তে। মাঝখানে কাপাসী। পেছনে নিত্য ঢালী আর পানিকর।

পায়ে ঠোক্কর, মাথায় টক্কর আর চারপাশ থেকে কাঁটা এবং গোঁজের খোঁচা লাগছে। জোঁক, বাড়িয়া পোকা আর গান্ধী পোকার উৎপাত তো আছেই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তারা এগুচ্ছে।

ফিস ফিস করে নিত্য ঢালী ডাকে, 'পানিকর বাবা—'

পাশ থেকে পানিকর বলল, 'হাঁ—'

'আমার বড় ডর লাগতে আছে।'

'কিসের ডর ?'

'এই যে নিজের দ্যাশের মানুষজন ছাইড়া আইলাম। কারো এট্টা যুক্তি নিলাম না। কারো লগে পরামশ্য করলাম না।'

কারো ঘুম ভাঙার আগেই তারা ডিগলিপুরের সেটেলমেণ্ট ছেড়ে এসেছে। কারো সঙ্গে, এমন কি পালসাহাবের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করে আসে নি নিত্য ঢালী। পানিকরই তাকে এ ব্যাপারে দেখা করতে বা কথা বলতে দেয় নি।

কারো সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ না করে, ঝোঁকের মাথায় সেটেলমেণ্ট ছেড়ে চলে আসার জন্য এখন আপসোস হচ্ছে।

যতই উপকারী হোক, পানিকর তার স্বজাতি বা স্বদেশী নয়। মাত্র কয়েক মাস তার সঙ্গে জানাশোনা। তার কথায় ভরসা করে কাপাসীকে নিয়ে এভাবে বেরিয়ে পড়া বুঝি ঠিক হল না।

গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে এগুতে এগুতে নিত্য ঢালীর সংশয় হয়, পানিকরের সংগে না বেরুলেই ভাল হত। মনে হল, চারপাশ থেকে অদ্ভুত এক ভয় একটু একটু করে তাকে ঘিরে ধরছে।

কাঁপা গলায় নিত্য ঢালী বলল, 'কারোরে না কইয়া বাইর হইয়া পড়লাম। এইটা কি ভাল হইল।'

পানিকর কিছু বলল না।

নিত্য ঢালী ডাকল, পানিকর বাবা— '

'হাঁ—'

'আপনে কিছু ক'ন না যে ?'

'কী বলব ?'

'এই যে ঘরদুয়ার, স্বজাতি-স্বদেশীগো ছাইড়া আইলাম, এ কি ভাল হইল ?'

অন্ধকারে পানিকরের মুখ দেখা যায় না। তার চোখের ভাষা পড়া যায় না। নিত্য টের পেল, কাঁধের ওপর একটা হাত এসে পড়েছে। পানিকরের হাত। তার কানের ভেতর মুখটা গুঁজে পানিকর বলল, 'চাচা, ঘাবড়াও মাত—'

নিত্য ঢালী জবাব দিল না।

পানিকর আবার বলল, 'ডিগলিপুরের কলোনিতে পড়ে থাকলে তোমার লেড়কি কি ভাল হত?'

'না।' আবছা একটা শব্দ করে মাথা নাড়ে নিত্য ঢালী।

জঙ্গল আর পাহাড় ফুঁড়ে ঠাণ্ডা জলো বাতাস উঠে আসছে। শরৎকাল শেষ হয়ে এল। বাতাসে হিম মিশতে শুরু করেছে।

একসময় তারা এরিয়াল উপসাগরের কাছাকাছি এসে পড়ল।

হঠাৎ নিত্য ঢালী বলল, 'পানিকর বাবা, একখান কথা কমু, শুনবেন?'

'বল।'

'হেইদিন নিজের চৌখেই তো দেখলেন, আপনেরে ঘরে আইনা তুলছি, হেয়াতে ডিগলিপুরের কেউ খুশি না।'

'হাঁ, ও তো দেখলাম।'

'ঐদিন রাগের মাথায় ওগো কইছিলাম, আপনে আমার জামাই, কইছিলাম, আপনেরে হাতেই কাপাসীরে দিমু। মনে আছে?'

'আছে। সব কুছ ইয়াদ আছে।' আস্তে আস্তে বলে পানিকর।

'আপনে গোসা হন নাই তো পানিকর বাবা?'

'আরে না না চাচা।' পানিকর শব্দ করে হাসে। বলে, 'গোসা হব কেন? না-না—'

পানিকরের কথা শেষ হবার আগেই বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপটাকে ভীষণভাবে শিউরে দিয়ে কলকলিয়ে হেসে উঠল কাপাসী।

হাসিটা একটু একটু করে মাততে লাগল।

৫৩

নিত্য ঢালীরা এরিয়াল উপসাগরের পারে এসে যখন পৌঁছুল তখন সবে সকাল হয়েছে। কিন্তু কুয়াশা ঘোচে নি। ফিকে সাদা কুয়াশার একটা পর্দা উপসাগরটার ওপর ঝুলছে। এখন কিছুই খুব স্পষ্ট নয়।

পিছনের স্যাডল পীক, সামনের ছোট ছোট নির্জন দ্বীপ, উপসাগরের নীল জল, পারের ম্যানগ্রোভ বন, ক্ষয়িত পাথর—সব কিছু কুয়াশায় একাকার হয়ে আছে। অনেক উঁচুতে আকাশটা ঘষা ঘষা বিরাট এক টুকরো নীল কাচের মত দেখাচ্ছে।

দেখতে দেখতে পুব দিকটা ফরসা হয়ে গেল।

এখন কুয়াশা তেমন ঘন নয়। দিনের আলোর সঙ্গে বেশিক্ষণ তা যুঝতে পারল না। ফিকে কুয়াশা ছিঁড়ে উড়ে উড়ে যেতে লাগল।

একসময় উপসাগরের মাথায় সাগরপাখি দেখা দিল। নীল জল ফুঁড়ে ফিন ফিনে রুপোলী ডানায় দিনের প্রথম রোদ মেখে উড়ুক্কু মাছেরা উড়তে লাগল।

এরিয়াল উপসাগর এখন খুব শান্ত, নিস্তরঙ্গ। তার নীল জলে মাতামাতি নেই, ক্ষ্যাপামি নেই।

'নটিলাস' বোটটা এক কিনারে একটা ম্যানগ্রোভ গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। মৃদু ঢেউয়ে অল্প অল্প দুলছে।

মালপত্র নিয়ে আগে উঠল লা তে। তারপর কাপাসী। কাপাসীর পর নিত্য ঢালী। সবার শেষে পানিকর।

বোটের মাঝখানে শেড। সেটার এপারে বসেছে লা তে। ওপারে পানিকর, নিত্য ঢালী আর কাপাসী।

স্টার্ট দিতে গিয়ে মোটর বোটটার ইঞ্জিনে কি যেন গোলমাল দেখা দিল। অগত্যা ছোট একটা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে কলকব্জা সারাতে বসল পানিকর। ঠুক ঠুক আওয়াজ হচ্ছে। ওধারে জলের দিকে ঝুঁকে ঝিম মেরে বসে আছে লা তে।

পাড়ের কাছটা অগভীর। এক বুক জল হবে। স্বচ্ছ জলের তলায় লাল নীল অসংখ্য ছোট ছোট পাথর ঝিকমিক করছে। দিনের প্রথম রোদ লেগে বাদামী রঙের বালুকণাগুলি জ্বলছে।

জলের নিচের বালিতে সিপি চলার সরু মোটা কত যে দাগ আঁকা রয়েছে, লেখাজোখা নেই।

জলের দিকে আরো ঝুঁকে একটা কথাই ভাবছে লা তে। অনেক, অনেকবার সে বারণ করেছিল, তবু পানিকরের সঙ্গে এল নিত্য ঢালী। সে আভাসে জানিয়ে দিয়েছিল, পানিকরের মতলব ভাল না। তার কথা কানেই তোলে নি নিত্য, তাকে গ্রাহ্যেই আনে নি।

জলের দিকে চেয়ে ছিল লা তে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, বিরাট আকারের একটা সান ডায়াল উপসাগরের তলার বালিতে গুটি গুটি এগুচ্ছে। দেখতে দেখতে চোখের ঈষৎ কটা তারা দুটো নেচে উঠল তার।

এই মরসুমে সিপিরা বড় একটা উপসাগরে আসে না। বর্ষার আগে আগেই তারা সমুদ্রে নেমে যায়।

কুতকুতে চাপা চোখে সান ডায়ালটা দেখতে লাগল লা তে। সেটার চারপাশে বিরাট একটা হাঙর ঘুরছে। মাঝে মাঝে হাঙরটা হাঁ করে। সারি সারি হিংস্র দাঁতগুলি ঝকমক করে। বিচিত্র উল্লাসে হাঙরটা ডিগবাজি খায়।

চাপা চোখের কটা তারা দুটো স্থির হয়ে গেল লা তে'র। সান ডায়াল তার খুব প্রিয় সিপি। অভ্যাসবশে কোমরের খাঁজে হাত দিল লা তে। খুঁজে খুঁজে

ছোরার বাঁটে থাবা বসাল।

মোটর বোটের কলকব্জা সারানো হয়ে গিয়েছিল। ম্যানগ্রোভ গাছ থেকে কাছি খুলে ফেলল পানিকর। বোটটা জোরে দুলে উঠল।

পানিকর স্টার্ট দিতে যাবে, চাপা গলায় লা তে ডাকল, 'মালেক—'

'কী বলছিস ?'

'থোড়া সবুর।'

'কাহে ?'

'একটা সান ডায়াল সিপি। সিপিটা আগে তুলে নি। পরে বোট ছাড়বেন।'

বিরক্ত গলায় পানিকর গজ গজ করতে লাগল, 'শালে সিপি দেখলে পাগলা বনে যায়।'

পানিকর আর স্টার্ট দিল না। 'নটিলাস' বোট উপসাগরের নিস্তরঙ্গ জলে ভাসতে লাগল।

খানিকটা চুপচাপ।

ও পাশ থেকে পানিকর ফিসফিসিয়ে উঠল, 'সিপিটা উঠাচ্ছিস না যে লা তে ? দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুপুরের আগে মায়াবন্দর পেঁছুতে হবে।'

লা তে বলল, 'বহুত বড় একটা হাঙর সিপিটার পাশে পাশে চলছে।'

শব্দ করে হাসল পানিকর। বলল, 'তোর আবার হাঙরের ডর! হাঙরই তো তোকে ডরায়।'

'আঁ, হাঁ-হাঁ, হাঙর আমাকে ডরায়।' লা তে'র গলায় অদ্ভুত স্বর ফুটল।

পানিকর আবার বলল, 'জলদি কর। হাঙরটা মেরে সান ডায়ালটা তোল।'

'তুলব তুলব। থোড়া সবুর।' কথা বলছে বটে, কিন্তু দুই খাড়া হাঁটুর ফাঁকে থ্যাবড়া থুতনি ঢুকিয়ে স্থির হয়ে বসেই রইল লা তে। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, বিরাট হাঙরটা চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে সান ডায়ালটাকে ঠুকরে ঠুকরে আদর করছে।

দূরের ধূসর রঙের স্যাডল পীক, এরিয়াল উপসাগরের অন্য সব দৃশ্য, ম্যানগ্রোভ বন, আকাশ, সামনের ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপ—কিছুই দেখছিল না লা তে। তার চোখ, তার মন, তার সমস্ত চেতনা জুড়ে এখন রয়েছে একটা সান ডায়াল আর একটা হাঙর।

হাঙর! হ্যাঁ, বিশাল-দেহ হিংস্র এক হাঙর।

একদৃষ্টে জলের দিকে কাপাসী তাকিয়ে ছিল। এখানে এই এরিয়াল উপসাগরে জল নীল। দূরে সমুদ্রের জল কালো। যতদূর তাকানো যায় নোনা অফুরন্ত সীমাহীন জল। জল, জল আর জল। দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে কাপাসীর।

এতক্ষণ অল্প অল্প বাতাস ছিল। হঠাৎ বাতাসটা পড়ে গেল। উপসাগরের জলে আর কাঁপুনি নেই, মাতন নেই। পারের ম্যানগ্রোভ বনের মাথা নড়ে কি

নড়ে না। 'নটিলাস' বোটটা স্থির হয়ে গেছে।

উড়ুক্কু মাছগুলি ফিনফিনে রুপোলী ডানায় উড়ছিল। এখন তারা জলের তলায় চলে গেছে। আকাশের কোথাও একটা সাগরপাখি নেই।

দিনের প্রথম রোদে এতক্ষণ উপসাগরটা জ্বলছিল। হঠাৎ কোত্থেকে এক টুকরো বিরাট মেঘ এসে রোদটাকে ছেয়ে ফেলল।

যতদূর তাকানো যায়, কোথাও কোনোদিকে গতি নেই, শব্দ নেই, তাপ নেই, আলো নেই। সব কিছু স্তব্ধ, নিরালোক, জড়, মৃত। একটা হঠাৎ-মৃত্যু যেন উপসাগরটাকে ছেয়ে ফেলেছে।

চারিদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচিত্র এক ভয় কাপাসীকে ঘিরে ফেলতে লাগল যেন। তার মনে হল, ভয়টা বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা স্রোতের মত ওঠানামা করছে। কাঁপা ফিস ফিস গলায় কাপাসী ডাকল, 'বাবা—'

পাশ থেকে নিত্য ঢালী বলল, 'কী ?' তার গলাটা সহজ স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন কাঁপা কাঁপা শোনাল। কাপাসীর ভয়টা যেন নিতার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

কাপাসী বলল, 'আমরা কনখানে যাইতে আছি ?'

'আমি জানি না। পানিকর বাবায় জানে।'

একটু চুপ। কাপাসীর ভয়টা বাড়তেই লাগল।

এই ঋতুর মেজাজ বিচিত্র। এই হয়ত রোদ, এই আবার মেঘ।

যে মেঘের টুকরোটা রোদে ঢেকে দিয়েছিল, সেটা আরো ঘন হয়েছে। অন্যদিকের ছোট ছোট মেঘের টুকরোগুলো সেটার সঙ্গে ক্রমশ মিলে গিয়ে ফুলে ফেঁপে পূবের আকাশ ঢেকে ফেলেছে।

এরিয়াল উপসাগর ধূসর এবং আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে যেন।

যে ভয়টা কাপাসীর বুকের ভিতর শির শির করছিল সেটা ক্রমশ আরো চেপে বসছে। শ্বাস টানতে, ঢোক গিলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। দম আটকে আটকে আসছে। তালুতে একরাশ শুকনো ধারাল বালি যেন আটকে আছে। ঢোক গিলতে গেলেই সেগুলো বিঁধছে। গলার কাছটা ব্যথা ব্যথা। অসহ্য এক কষ্ট নিজের মধ্যে কোথায় যেন পাক খাচ্ছে।

সামনের দ্বীপ, উপসাগর, পাহাড়, দূরের সমুদ্র—সব ঝাপসা নিরাকার হয়ে যাচ্ছে যেন। কোথায়ও বুঝি আলো নেই। একটা নিরবচ্ছিন্ন কালো পর্দা সমস্ত কিছু ঢেকে ফেলেছে।

অনেক অনেকদিন, ঠিক কতদিন আগে হুবহু মনে করতে পারল না কাপাসী। দুর্বল আচ্ছন্ন ভয়াতুর মনে এখন কোনো ক্রিয়াই চলছে না। তবে এটুকু কাপাসী ভাবতে পারল, কোথায় যেন একটা ছোট নদী ছিল, অন্ধকার ছিল। টুকরো টুকরো শিথিলবন্ধ কয়েকটা ছবি। কয়েকটা ঘটনা। সবগুলো সাজিয়ে নিলে যা দাঁড়ায় তা হল, সেই অন্ধকারে কারা যেন বাপ-মায়ের বুক

থেকে তাকে ছিনিয়ে মশাল জ্বালিয়ে ছিপ নৌকোয় নদী পাড়ি দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর ?

কোথায় যেন একটা চর ছিল। ছোট একটা দোচালা ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। একদিন, দুদিন, দুমাস, এক বছর—কতদিন যে সে সেখানে বন্দী হয়ে ছিল, মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, কারা যেন তার কাছে আসত। তারা এলেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত।

এখন এই মুহূর্তে পানিকরের মোটর বোটে বসে কেন যেন তার মনে হল, সেই সাংঘাতিক রাত্রিটার মত আজও তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কথাটা যতই ভাবল হাতের পাতা দুটো ঘামে ভিজে উঠল। সেই ঠাণ্ডা কনকনে স্রোতটা মেরুদাঁড়া বেয়ে ওঠানামা করতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। দম আটকে আটকে আসতে লাগল।

হঠাৎ সমস্ত উপসাগরকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কাপাসী, 'যামু না, আমি যামু না।'

চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপল মাত্র।

মোটর বোটের শেডটা ধরে শরীরের সব জোর গলায় এনে অনেকবার চেঁচাল কাপাসী। এক সময় আওয়াজ বেরুল, 'আমি যামু না, যামু না—'

যে স্তব্ধতা এরিয়াল উপসাগরটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেটা খান খান হয়ে গেল।

বোটের ইঞ্জিনটার পাশে বসে ছিল পানিকর। চমকে কাপাসীর মুখের দিকে তাকাল। তারপরেই ঘুরে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল। মোটর বোটটা ভট্ ভট করে উঠল।

শান্ত জলে ঢেউ উঠল, মাতন জাগল। উড়ুক্কু মাছেরা জলের নিচে চলে গিয়েছিল। রুপোর তীরের মত আবার তারা উড়তে লাগল। আকাশে সাগরপাখি দেখা দিল।

এতক্ষণ এরিয়াল উপসাগরটা মৃত নিস্পন্দ স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সেখানে বেগ এল, শব্দ এল, গতি এল, চাঞ্চল্য এল। মৃত উপসাগর প্রচণ্ড বেগে জেগে উঠল যেন।

আর আচমকাই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে 'নটিলাস' বোটটা জল কেটে ছুটতে শুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলুথালু হয়ে চিৎকার করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাপাসী, 'যামু না, যামু না, কিছুতেই যামু না।'

উপসাগরে ঝপাং করে শব্দ হল। জল ছিটকে এসে লাগল 'নটিলাস'-এর গায়ে।

অগত্যা পানিকর বোট থামিয়ে দিল। ইঞ্জিনটার সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচাতে লাগল, 'গেল গেল, সব কুছ বরবাদ হয়ে গেল। কাপাসী—কাপাসী—'

বুক থাপড়ায় আর হাউ হাউ করে কাঁদে নিত্য ঢালী, 'গেল গেল, আমার সব্বনাশ হইয়া গেল। হা ভগবান।'

শেডের ওপাশে চুপচাপ বসে ছিল লা তে। হাঙর আর সিপিটাকে দেখছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে পড়েছিল। নিজের ওপর নিজের কোনো ইচ্ছাই কাজ করছিল না যেন।

লা তে দেখছে, উপসাগরের জলে কাপাসী ডুবে যাচ্ছে। তবুও নড়ল না সে, নড়তে পারল না। আড়ষ্টের মত বসে রইল।

একেকবার ভেসে ওঠে কাপাসী। প্রাণফাটা চিৎকার করে, 'বাচাও, আমারে বাচাও—'

হঠাৎ লা তে দেখল, সান ডায়ালটাকে ছেড়ে দিয়ে বিরাট হাঙরটা কাপাসীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার বিরাট শরীরটা জলের নিচে স্থির হয়ে গেছে। আন্দামান উপসাগরের ক্ষুধার্ত হাঙর শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওত পেতেছে।

কাপাসীর মাথা আবার ভেসে উঠল। আবার সে চেঁচাল, 'বাচাও—বাচাও—মরলাম—মরলাম—'

এবার তীব্র ঝাঁকানি খেয়ে সব আড়ষ্টতা সরে গেল। কোমরের খাঁজ থেকে ছোরার ফলাটা সাঁ করে বার কবল লা তে। তারপর উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হাঙরটা একটু ঘুরে দাঁড়াল। হিংস্র ভীষণ চোখে দেখতে লাগল, আরো একটা শিকার একেবারে মুখের সামনে এসে পড়েছে। হাঙরটার লাল ঘের-দেওয়া চোখ দুটো ঝকমক করছে।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কাপাসীর শরীরটা জলের ওপর ভাসিয়ে রাখল লা তে। ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে ধরা।

একসঙ্গে একজোড়া শিকার বাগে পেয়ে হাঙরটা মেতে উঠেছে। ডিগবাজি খাচ্ছে। উল্টে পাল্টে কত ধরনের কসরতই না দেখাচ্ছে। মুখ ভরে জল নিয়ে হুস করে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

একসময় মাতামাতি থামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল হাঙরটা। তারপর তীব্রবেগো ছুটে এল। কাপাসীকে ভাসিয়ে রেখে একধারে সরে গেল লা তে। হাঙরট ওপাশে বেরিয়ে গেল। দাঁত বার করে সংগে সঙ্গে আবার তেড়ে এল। দরিয়ার সব অন্ধিসন্ধি, হাঙরের স্বভাব—সবই লা তে'র জানা। চোখের পলকে একপাশে সরে হাঙরটার ঘাড়ের কাছে ছোরা বসিয়ে দিল সে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে উপসাগরের জলে মিশতে লাগল।

এদিকে ছোরার খোঁচা খেয়ে হাঙরটা ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

'নটিলাস' বোট থেকে সমানে চিল্লাচ্ছে পানিকর, 'হাঙরটাকে মার লা তে। দশ রুপেয়া দেব। কাপাসীকে তুলে দে লা তে। বখশিস মিলবে।'

একটু দূরে গিয়ে হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে হাঙরটা। শিকারটাকে যত সহজে বাগানো যাবে ভেবেছিল, আদপেই কাজটা তত সহজ নয়।

বাঁ হাতে কাপাসীর সমস্ত দেহের ভার ওপরের দিকে ঠেলে রেখেছে লা তে। যন্ত্রণায় হাতটা ছিঁড়ে পড়ছে যেন।

দম ছাড়ার জন্য একবার ভুস করে মাথা তুলেছিল লা তে। সেই সুযোগে হাঙরটা ধারাল দাঁতের কামড় বসিয়ে লা তে'র উরু থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

হাঙরের ঘাড় থেকে রক্ত ঝরছে। লা তে'র উরু থেকে রক্ত ঝরছে। মানুষ আর হাঙরের রক্তে উপসাগর লাল হয়ে উঠেছে।

নোনা জলে উরুর ক্ষতটা ভীষণ জ্বলছে। সেদিকে লা তে'র খেয়াল নেই। এখন একটু অসাবধান হলে আর উপায় থাকবে না। হাঙরের ধারাল দাঁত তাকে আর কাপাসীকে চিরে ফেলবে।

আবার ডুব দিল লা তে। সে জানে, জখমী হাঙর বড় মারাত্মক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাঙরটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল লা তে।

এর মধ্যে আর এক বিপদ ঘটল। জল খেয়ে খেয়ে আর ভয়ে কাপাসী অজ্ঞান হয়ে গেছে। তার অসাড় দেহটা বাঁ হাতে আর ঠেলে রাখতে পারছে না লা তে। হঠাৎ মাথায় একটা মতলব খেলে গেল তার।

শ দুই হাত দূরে উপকূল। সেখানে ক্ষয়িত শিলা আর ম্যানগ্রোভ বন। উপকূলে উঠতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে। ডুব দিয়ে কাপাসীর অসাড় দেহটা ভাসিয়ে রেখে উপকূলের দিকে সরতে লাগল লা তে।

হাঙরটা লা তে'র উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাঁ করে তার দিকে ছুটে এল। ছোরার ডগা দিয়ে পেটের কাছটা চিরে দিল লা তে, হাঙরটা পিছিয়ে গেল। হয়ত বুঝল, শিকারটা নেহাতই নিরীহ না, সাংঘাতিক। আদতে ওটা শিকারই না, ভয়ানক এক প্রতিপক্ষ।

সমুদ্র আর হাঙরের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে উপকূলের অনেক কাছে এসে পড়ল লা তে। এখানে জল অনেক কম, বুক সমান। কিন্তু নিচের ভাঙা ভাঙা ক্ষয়িত পাথরে হাজার বছরের শ্যাওলা জমে রয়েছে। সেখানে পা রাখা যায় না।

জখমী হাঙরটাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। শ্যাওলা-জমা পাথরে পা রাখতে গিয়ে পিছলে গিয়েছিল লা তে। সেই ফাঁকে পায়ের গোছা থেকে আরেক খণ্ড মাংস কেটে নিয়ে গেল হাঙরটা।

সামনে বিরাট হাঙর, বাঁ হাতে কাপাসীর অসাড় দেহ, পায়ের তলায় পিছল পাহাড়—এমন মারাত্মক অবস্থায় জীবনে পড়ে নি লা তে। পা থেকে, উরু থেকে রক্ত ঝরছে। নোনা জলে ক্ষতগুলো জ্বলছে। ভীষণ এক যন্ত্রণা শিরায় শিরায়

ছড়িয়ে পড়ছে। শরীরটা অবশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, অত সহজে হার মানলে চলবে না। দরিয়ার অতল থেকে, হিংস্র জলচর জানোয়ারের মুখ থেকে সিপি কুড়োয় লা তে। কোনোদিন দরিয়ার লড়াইতে হার মানে নি সে। আজও মানবে না। লা তে মরিয়া হয়ে উঠল।

উপকূলের দিকে আরো অনেকটা সরে এসেছে লা তে। জল এখানে কোমর সমান। এখানে শ্যাওলাহীন একটা বড় পাথর মিলল। বাঁ হাতে কাপাসীকে জড়িয়ে ধরি, ডান হাতে ছোরাটা বাগিয়ে রাখল সে।

'নটিলাস' বোট থেকে পানিকর সমানে উৎসাহ দেয়, 'বিশ রুপেয়া বখশিস দেব লা তে। ওপরে উঠে যা।'

নিত্য ঢালী কিছুই বলে না। গলার শির ছিঁড়ে শুধু কাঁদতে থাকে।

জখমী জানোয়ারটা কিছুক্ষণ প্রতিপক্ষের মতিগতি ঠাওর করে দেখল। তার পর সারি সারি ধাবাল দাঁত বার করে সোজা ছুটে এল।

পায়ের তলায় কঠিন পাথরের আশ্রয়। পিছলে যাবার বিপদ নেই। এক পাশে একটু কাত হয়ে দীর্ঘ ছোরাটা পুরোপুরি হাঙরের পেটে ঢুকিয়ে টেনে দিল লা তে। অন্তিম আক্রোশে লক্ষ্যহীন গতিতে খানিকটা ছুটে গেল হাঙরটা। জলের মধ্যে উল্টে পাল্টে কিছুক্ষণ আছাড়ি পিছাড়ি খেল! তারপর স্থির হয়ে গেল।

হাঙরের সঙ্গে লা তে'র যোঝাযুঝি দেখছিল পানিকর। দেখতে দেখতে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে হঠাৎ ভুলে গেল সে। বিচিত্র এক ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত দুর্ধর্ষ হাঙরটাকে শেষই করে ফেলল লা তে!

মরা হাঙর, রক্তমাখা উপসাগর, লা তে'র ছোরা পানিকরের বুকের ভিতর অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া ঘনিয়ে তুলল যেন।

টলতে টলতে ধুঁকতে ধুঁকতে কাপাসীকে নিয়ে খুব সাবধানে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা ফেলে ম্যানগ্রোভ বনে উঠে গেল লা তে। উত্তেজনায় অবসাদে হাঙরের সঙ্গে লড়াইর ক্লান্তিতে ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল তার।

পানিকর ফিস ফিস গলায় বলল, 'দাঁড়া লা তে, আমি আসছি!'

'নটিলাস' বোটটা উপকূলের কিনারে এনে দাঁড় করাল পানিকর। তারপর হাঁটুখানেক জল ভেঙে সে কাপাসীদের কাছে চলে এল। তার পিছনে নিত্য ঢালীও এসেছে।

লা তে'র বুকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে কাপাসী।

পানিকর দেখল, লা তে'র ছোরার ফলায় এখনও হাঙরের তাজা রক্ত লেগে রয়েছে, টপ টপ করে সেই রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে। একবার লা তে'র চোখের দিকে তাকাল পানিকর! লা তে'র চাপা কুতকুতে কটা চোখদুটোতে কি দেখল, পানিকরই জানে। একটা কথাও আর বলল না। উপসাগরে হাঁটু জল ভেঙে যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি 'নটিলাস' বোটে গিয়ে উঠল।

একটু পর এরিয়াল বে'র শান্ত জলে বড় বড় ঢেউ জাগিয়ে ভট্ ভট্ শব্দ

তুলে 'নটিলাস' বোট খোলা দরিয়ায় পালিয়ে গেল।

এবার বেহুঁশ কাপাসীর দিকে তাকাল লা তে। কেন যেন তার মনে হল, আন্দামানের দরিয়ায় হাঙরের মুখ থেকে এমন সিপি সারা জীবনে আর তুলতে পারে নি।

নিত্য ঢালী সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে লা তে অল্প একটু হাসল। বলল, 'তোমার লেড়কি নাও চাচা—'

নিত্য ঢালী কেঁদে উঠল 'লা তে'রে, তুই না থাকলে মাইয়ারে ফিরা পাইতাম না। আমি তর গুলাম হইয়া রইলাম।'

লা তে জবাব দিল না। নিত্য ঢালী কাঁদতেই লাগল।

খানিকটা পর কাপাসীর জ্ঞান ফিরে এল। আলুথালু হয়ে সে চেঁচায়, 'আমি যামু না, যামু না।'

নিত্য ঢালী মেয়ের একটা হাত ধরল। ভাঙা গলায় বলল, 'না মা, তরে কুনোখানে যাইতে হইব না। অহন আমরা কোলোনিতে ফিরুম।'

কাপাসীকে নিয়ে উঠে পড়ল নিত্য ঢালী। লা তে'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল লা তে, আমাগো লগে চল।'

'না।' মাথা নাড়তে নাড়তে লা তে বলল, 'আমি মায়াবন্দর যাব।'

'যাবি কেমনে? পানিকর বাবায় তো বোট লইয়া গেল।'

'দেখি, যদি ফরেস্টের বোট পাই। ও তোমার ভাবতে হবে না চাচা।' বলেই উপকূলের পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করল লা তে। খানিকটা গিয়ে কি ভেবে ঘুরে দাঁড়াল। ডাকল, 'শোন চাচা।'

নিত্য ঢালী এগিয়ে আসে।

লা তে বলল, 'এই জাজিরাতে তোমরা নয়া এসেছ। এখানকার হালচাল জানো না। তোমার লেড়কিকে একটা হাঙরের মুখ থেকে বাঁচালাম। এখানে আরো বহুত হাঙর আছে। হোঁশিয়ার।' বলে আর দাঁড়াল না লা তে, আবার হাঁটতে শুরু করল।

উপসাগরের পাড় দিয়ে হেঁটে চলেছে লা তে। পাশেই সমুদ্র—কালো, নিঃসীম, দুজ্ঞেয়।

পনের বছর আন্দামানের সমুদ্র থেকে সিপি কুড়োচ্ছে সে। আশ্চর্য! এতদিনেও সমুদ্রকে, তার মেজাজকে, তার চরিত্রকে আদৌ বুঝে উঠতে পারে নি!

আজ, একটু আগে হাঙরের সঙ্গে যুঝে যুঝে কাপাসীকে বাঁচিয়েছে। লা তে ভাবল, সাধ্য কি তার কাপাসীকে বাঁচায়! সমুদ্রই করুণা করে কাপাসীকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আজ প্রথম যেন সমুদ্রের চরিত্র অল্প একটু বুঝতে পারল লা তে। অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গেল তার।

নিত্য ঢালীর ঘরের সামনে একটা উতরাই। উতরাইটার দু পাশে ধানক্ষেত।

জঙ্গলের কাছ থেকে যে মাটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, লাঙলের ফলায় ফলায় যে মাটি চৌরস হয়েছিল, বর্ষায় যে মাটিতে বীজদানা পড়েছিল, সেই মাটিই বছরের চতুর্থ ঋতুতে ফসলবতী হয়ে উঠেছে।

যতদূরে তাকানো যায় শুধু ধান আর ধান। সোনালী লাবণ্যে ক্ষেতের ঝাঁপি ভরে আছে।

দু'জন মাত্র মানুষ। হোক দু জন, তবু তো একটা সংসার।

সারাদিন সংসারের কাজ সারে কাপাসী। রাঁধে বাড়ে, ঘর পরিষ্কার করে। কিলপণ্ড নদী থেকে জল আনে। বাপকে খাওয়ায়, নিজে খায়। তারপর বিকেল যখন হয়, সূর্যটা যখন জঙ্গলের ওপারে চলতে শুরু করে ঠিক সেই সময় বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে। উদাস চোখে সামনের ধানক্ষেতটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কখন যেন একসময় চোখদুটো জলে ভরে যায়। টস টস করে গাল বেয়ে লবণাক্ত উষ্ণ জল ঝরতে থাকে।

আজকাল আর কাপাসী কলকলিয়ে হাসে না। যতক্ষণ কাজে মেতে থাকে মোটামুটি একরকম কাটে। কিন্তু কাজ যখন থাকে না, যখনই একটু ফুরসত পায় কাপাসী কাঁদতে বসে। আশ্চর্য! যে কাপাসী কলকলিয়ে হাসত সে এখন কাঁদে, শুধুই কাঁদে। তার কান্নায় শব্দ নেই।

সেদিন এরিয়াল উপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কাপাসী। হাঙর দেখে ভয়ে উত্তেজনায় তার অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গুলোতে তীব্র ঝাঁকানি লেগেছিল। বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল সে।

অনেক কাল আগে গাঢ় অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়ে কারা যেন জোর করে ছিনিয়ে তাকে ছিপ নৌকোয় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই অবুঝ অস্থির গলায় মেতে মেতে ঢলে ঢলে হেসেছে কাপাসী। জীবনের সব সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছিল সে।

এরিয়াল উপসাগরে ঝাঁপ দেবার পর হাঙর দেখে তার অস্বাভাবিক স্নায়ু আর ইন্দ্রিয়গুলি যে তীব্র ঝাঁকানি খেয়েছিল, সেটাই তাকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলেছে।

সন্ধের ঠিক মুখে মুখে হারাণ আর পালসাহাব আসে।

যেদিন হাঙরের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিত্য ঢালীর সঙ্গে তাকে ডিগালিপুর পাঠিয়ে দিয়েছিল লাতে, সেদিন থেকেই পালসাহাব আর হারাণ আসছে। আজও তারা এল।

পালসাহাব বলল, 'আজও তুই কাঁদছিস ?'

'হ সাহাব বাবা।'

'তোকে না বলেছি, কাঁদবি না !'

'পারি না বাবা, কিছুতেই কান্দনেরে ঠেকাইয়া রাখতে পারি না।' কাপাসী বলতে থাকে, 'যহন হাসতাম তহন কইতেন হাসবি না। অহন কান্দি। কানতেও দিবেন না ?'

'না না—' গভীর স্নেহে পালসাহাব বলল, 'তুই যে হাসি হাসিস যে কান্না কাঁদিস, তা এই ডিগালিপুরে চলবে না। জরুর না।' বলে ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

কাপাসী বলে, 'তা হইলে কোন হাসন কোন কান্দন চলব ?'

'যে হাসিতে যে কান্নায় দিল জুড়োবে তাই হাসবি, তাই কাঁদবি। যে হাসতে যে কান্নায় দিল টুটি-ফাটা হয়ে যায়, তা হেসে তা কেঁদে কোন ফায়দা ?'

কাপাসী জবাব দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে।

এবার হারাণকে নিয়ে পড়ে পালসাহাব। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে,' এ উল্লু ?'

তটস্থ হয়ে হারাণ বলে, 'কী ক'ন পালসাহাব ?'

'আরে নালায়েক, হারামী—আপনা পেয়ারের লেড়কি অ্যায়সা কাঁদছে, আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস !'

'কী করুম ?'

পালসাহাব খেঁকিয়ে উঠল, 'শোন বুদ্ধু, আভী আমি যাচ্ছি। কাল আবার আসব। কাল এসে যদি দেখি কাপাসী কাঁদছে, তোর শির ছেঁচে দেব।'

পালসাহাব চলে গেল। আর কাপাসীর পাশে গিয়ে বসল হারাণ। বলল, 'কোন দুখুতে কান্দো কাপাসী ?'

কাপাসী কিছু বলে না। ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়েই থাকে।

আবেগে গলাটা কাঁপতে থাকে হারাণের, 'কাপাসী, কও—'

দু হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে কাপাসী। বলে, 'এতদিন পাগল আছিলাম, ভালই আছিলাম। ক্যান আমি ভাল হইলাম ? ক্যান ? ভাল হইয়াই তো আমার দুঃখু বাড়ল ! পাগল হইয়া যা ভুলছিলাম, ভাল হইয়া হেই হগল মনে পইড়া যায়।'

'কী মনে পড়ে ?'

'আমার শরীলখান নষ্ট হইয়া গেছে। হা ভগবান !' অসহ্য কান্নায় কাপাসীর গলা রুদ্ধ হয়ে গেল।

কাপাসীর পিঠে আলগোছে একখানা হাত রেখে হারাণ বলে, 'কিছুই নষ্ট

হয় নাই কাপাসী। জীবনে কিছুই লষ্ট হয় না। ধৈর্য ধর, মনের বুঝ মানাও—'

হারাণের হাতটা পিঠে থেকে সামনে নিয়ে এসে দু হাতে আঁকড়ে ধরে কাপাসী। বলে, 'সত্য কও পুরুষ, আমার কিছুই লষ্ট হয় নাই।'

'সত্য কই।' হারাণের গলা পরম আশ্বাসের মত শোনায়।

৫৫

এটা বছরের শেষ ঋতু।

একবছর আগে শীতের এক মধ্য দুপুরে একদল নির্ভূম নিঃস্ব মানুষ মাটির আশায়, বাঁচার আশায়, জীবনের আশায় বঙ্গোপসাগরের এই নিদারুণ দ্বীপে এসেছিল। ঝুপড়ির সামনে বসে বসে পালসাহাব তাদের কথাই ভাবছে।

এখন ঝিম দুপুর।

এই শেষ বা ষষ্ঠ ঋতুর দুপুরে কড়া রোদে পিঠটা পুড়ে যাচ্ছে। তবু হুঁশ নেই। বিভোর হয়ে ভাবছে পালসাহাব। এই দ্বীপে মানুষ এল। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সু এল, কু এল। ভাল এল, মন্দ এল। দুঃখ এল, যন্ত্রণা এল। আশা এল, আনন্দ এল। প্রথম যেদিন মানুষগুলো এই দ্বীপে এসেছিল, সেদিন তাদের সকলের চেহারা ছিল এক, অভিন্ন। সবাই মিলে একটা মানুষের পিণ্ড। অদ্ভুত এক মৃত্যু তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এ সেই মৃত্যু, যা মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে। যত দিন যেতে লাগল, আস্তে আস্তে তাদের আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুতে লাগল।

সাত পুরুষের বাস্তু ছেড়ে আসার পর তারা তিলে তিলে মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছে। এই দ্বীপে এসে পায়ের নিচে মাটি পেয়ে তারা মৃত্যুকে পেরিয়ে এল। মৃত্যু থেকে তারা জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কত কী-ই না ঘটল এই দ্বীপে। জীবনের খোয়ানো মূল্যবোধগুলিকে ফিরে পেল ক্ষিরি। কাপাসী ভাল হয়ে গেল। অশুভ ছায়ার মত পানিকর এসেছিল। সে পালিয়ে গেল। হরিপদ বারুই পৃথিবীর সবার চোখ থেকে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিল, তিলি গর্ভিণী হল।

'পালসাহাব, পালসাহাব—' ডাকতে ডাকতে কে যেন উতরাই বেয়ে উঠে আসছে।

বিভোর ভাবটা কেটে গেল। চমকে ঘুরে বসল পালসাহাব। দেখা গেল, ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে উদ্ধব বৈরাগী উঠে এসেছে। উত্তেজনায়, তেজী রোদে অনেকটা পথ ছুটে আসার ধকলে সারা দেহে ঘাম ছুটেছে।

পালসাহাব বলল, 'কী উস্তাদ, অ্যায়সা দৌড়তে দৌড়তে আসছ যে?'

'তরাতরি চলেন পালসাহাব, তিলির ব্যথা উঠছে।'

বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল পালসাহাব, 'কিসের ব্যথা?'

'বিয়ানের ব্যথা। তিলির পোলা হইব।'

লাফিয়ে উঠে পড়ল পালসাহাব। ঝুপড়ির ভিতর ঢুকে মা-তিনকে টানতে টানতে বার করে আনল। বলল, 'শিগগির চল মাগী।'

'কাঁহা?'

'যুগেনের ঝুপড়িতে। তিলির লেড়কা হবে। এই জাজিরাতে পয়লা মানুষ জন্মাচ্ছে। চল্ চল্—জলদি—'

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হরিপদকে পাওয়া যায় নি। অগত্যা গর্ভিণী তিলি যোগেনের ঘরে গিয়েই উঠেছিল। তিলি নিজে যায় নি। পালসাহাবই তাকে যোগেনের ঘরে পেঁছে দিয়ে এসেছে।

হরিপদ তিলির ওপর সমস্ত দাবি ছেড়ে এই দ্বীপ থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। একটা পঙ্গু রুগ্ন বিকলাঙ্গ মানুষের জন্য তো একটা সুস্থ স্বাভাবিক সজীব মানুষ মূল্যহীন হয়ে যায় না।

একজনের জন্য আর একজনের জীবন নষ্ট হয় না। পালসাহাবের জীবনবোধ এই কথাই বলে।

পালসাহাবরা এসে দেখল, মেলা বসে গেছে।

রসিক শীল, চন্দ্র জয়ধর, হারাণ, নিত্য ঢালী, কাপাসী, উজানী বুড়ী—কেউ বাকি নেই। ডিগলিপুর সেটেলমেণ্টের সবাই এসে যোগেনের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছে।

পালসাহাবকে দেখে সাড়া পড়ে গেল।

'পালসাহাব আইছে।'

'সাহাব বাবা আইছে।'

যোগেনের ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধ ঝাঁপের ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রসিক শীল আর যোগেন। যোগেনের মুখটা অদ্ভুত এক আনন্দে চকচক করছে।

পালসাহাব বলল, 'কি রে হারামী, কী হল—লেড়কা না লেড়কি?'

যোগেন মুখ নামাল। কিছু বলল না। বিচিত্র এক লজ্জা তাকে ছেয়ে ফেলেছে।

পাশ থেকে রসিক শীল বলল, 'অহনও কিছু হয় নাই সাহাব বাবা, এট্টু খাড়ন! নাতি হউক, নাতনী হাউক—যা-ই হউক, মুখ দেইখা আশীর্বাদ কইরা যাইবেন।'

'হাঁ-হাঁ—জরুর।'

মানুষগুলো আগ্রহে, উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে আছে। কখন তিলির বাচ্চা ভুমিষ্ঠ হবে, সেই আশায় উন্মুখ হয়ে আছে। নবজাতক আসছে। এ উৎসব তো মানুষের চিরকালের।

পালসাহাবের কানে এল, কে যেন বলছে, 'পোলা হইব।'

আর একটা গলা শোনা গেল, 'না-না মাইয়া হইব।'

অন্য একজন দু'জনকেই সামাল দিতে দিতে বলে, 'কাইজা (ঝগড়া) করস ক্যান ? মাইয়া হউক আর পোলা হউক, অহনই তো দেখতে পাবি।'

বিকেলের দিকে সূর্যটা যখন পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময় সবার উৎকণ্ঠা ছাপিয়ে বন্ধ ঘরের ভিতর কচি গলার আওয়াজ উঠল, 'ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ—'

বাইরে শোর পড়ে গেল, 'বাচ্চা হইছে, বাচ্চা হইছে।'

শিশুটা জোরে জোরে কাঁদছে। গলায় অপরিসীম জোর নিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে প্রথম মানুষের সন্তান জন্ম নিল।

খানিকটা পর ঘরের ঝাঁপ খুলে গেল। বুড়ী বাসিনী রক্তমাখা শিশুটাকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে বাইরে এল। বলল, 'দ্যাখ—দ্যাখ তরা। কি সোন্দর হইছে।'

সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে সামনে এগিয়ে এল পালসাহাব। বলল, 'দেখি দেখি, কি হয়েছে মাঈ ? লেড়কা না লেড়কি ?'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'পোলা হইছে বাবা।'

'দে দে মাঈ, আমার হাতে দে।' হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে ধরল পালসাহাব।

এই দ্বীপে মানুষ এসেছে। সুখে-দুঃখে-প্রেমে আর প্রাণের তাপে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।

অনেক, অনেকদিন আগে পালসাহাবের জীবন থেকে একটা কৃষাণ গ্রামের ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন ধরে সেই ঠিকানাটা, সেই কৃষাণ গ্রামটা, সেই খোয়ানো পৃথিবীটা খুঁজে বেড়িয়েছে সে। এতদিনে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপে সেই হারানো পৃথিবীটা খুঁজে পেয়েছে পালসাহাব।

পালসাহাব কে ?

পালসাহাব শুধু একটা মানুষ না। সে হল জীবন—জীবনের প্রতীক। এই দ্বীপের আশা-হতাশা, পাপ-পুণ্য আনন্দ-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যু—সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে সে।

তিলির বাচ্চাটা এখন আর কাঁদছে না। চোখ বুজে হাত মুঠো করে একান্ত নির্ভয়ে পালসাহাবের হাতে শুয়ে রয়েছে।

ফুলের মত নরম উষ্ণ ছোট্ট একটি মানুষ। পরম মমতায় তাকে বুকের ওপর তুলে নিল পালসাহাব। একদৃষ্টে এই দ্বীপের প্রথম শিশুটির মুখ দেখতে লাগল। দেখে দেখে আশ তার মেটে না।

অতি সুখে হাসে পালসাহাব।

পাগলা অতি সুখে কাঁদে।

মানুষগুলো আগ্রহে, উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে আছে। কখন তিলির বাচ্চা ভুমিষ্ঠ হবে, সেই আশায় উন্মুখ হয়ে আছে। নবজাতক আসছে। এ উৎসব তো মানুষের চিরকালের।

পালসাহাবের কানে এল, কে যেন বলছে, 'পোলা হইব।'

আর একটা গলা শোনা গেল, 'না-না মাইয়া হইব।'

অন্য একজন দু'জনকেই সামাল দিতে দিতে বলে, 'কাইজা (ঝগড়া) করস ক্যান? মাইয়া হউক আর পোলা হউক, অহনই তো দেখতে পাবি।'

বিকেলের দিকে সূর্যটা যখন পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময় সবার উৎকণ্ঠা ছাপিয়ে বন্ধ ঘরের ভিতর কচি গলার আওয়াজ উঠল, 'ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ—'

বাইরে শোর পড়ে গেল, 'বাচ্চা হইছে, বাচ্চা হইছে।'

শিশুটা জোরে জোরে কাঁদছে। গলায় অপরিসীম জোর নিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই দ্বীপে প্রথম মানুষের সন্তান জন্ম নিল।

খানিকটা পর ঘরের ঝাঁপ খুলে গেল। বুড়ী বাসিনী রক্তমাখা শিশুটাকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে বাইরে এল। বলল, 'দ্যাখ—দ্যাখ তরা। কি সোন্দর হইছে।'

সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে সামনে এগিয়ে এল পালসাহাব। বলল, 'দেখি দেখি, কি হয়েছে মাঈ? লেড়কা না লেড়কি?'

বুড়ী বাসিনী বলল, 'পোলা হইছে বাবা।'

'দে দে মাঈ, আমার হাতে দে।' হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে ধরল পালসাহাব।

এই দ্বীপে মানুষ এসেছে। সুখে-দুঃখে-প্রেমে আর প্রাণের তাপে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।

অনেক, অনেকদিন আগে পালসাহাবের জীবন থেকে একটা কৃষাণ গ্রামের ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল। সারা জীবন ধরে সেই ঠিকানাটা, সেই কৃষাণ গ্রামটা, সেই খোয়ানো পৃথিবীটা খুঁজে বেড়িয়েছে সে। এতদিনে বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপে সেই হারানো পৃথিবীটা খুঁজে পেয়েছে পালসাহাব।

পালসাহাব কে?

পালসাহাব শুধু একটা মানুষ না। সে হল জীবন—জীবনের প্রতীক। এই দ্বীপের আশা-হতাশা, পাপ-পুণ্য আনন্দ-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যু—সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে সে।

তিলির বাচ্চাটা এখন আর কাঁদছে না। চোখ বুজে হাত মুঠো করে একান্ত নির্ভয়ে পালসাহাবের হাতে শুয়ে রয়েছে।

ফুলের মত নরম উষ্ণ ছোট্ট একটি মানুষ। পরম মমতায় তাকে বুকের ওপর তুলে নিল পালসাহাব। একদৃষ্টে এই দ্বীপের প্রথম শিশুটির মুখ দেখতে লাগল। দেখে দেখে আশ তার মেটে না।

অতি সুখে হাসে পালসাহাব।

পাগলা অতি সুখে কাঁদে।